এর নাম সমাজদেহ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

● পরিবেশক ●

বরেণ্যে সাহিত্যব্রতী

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়

ও

শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে

সশ্রদ্ধ নিবেদন

কিছু কথা

উপন্যাসের আকারে কাহিনীর অখণ্ড বিন্যাসে পরিবেশিত নয় 'এর নাম সমাজ দেহ'। নাম-গল্প সমেত 'মাছি', 'মেঘদল, ময়ূর-সিংহাসন ও আমার আখের', 'কেউ জেগে নেই', 'পাগলের ছোরা', 'রিহার্সাল রুম', 'রহস্যের স্বাদ', 'গলির সেই মানুষটা', 'বিব্রত বিস্ময়ে কবলিত যুবক', 'দাগ', 'বাতাসিয়া লুপ', 'সময় সমুদ্রে', 'পাশাপাশি', 'সব পুতুল' এবং 'সাধের স্বাধীনতার স্বাদ' মোট পনেরটি ছোট গল্পের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন দিকের বিচিত্র-বিবিধ চরিত্র ও ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বাস্তব-জীবনের রূপরেখাকে প্রতিফলিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পরবর্তীকালই এর চালচিত্র। প্রসঙ্গত বাংলা কথাশিল্পে উপন্যাসের সার্থক সৃষ্টির সংখ্যা যেমন কম তেমনি তার পাশে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার যোগ্য অজস্র ছোট গল্প বিস্ময় জাগায়। আরও মজার কথা, অধিকাংশ সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেন ছোট গল্প লিখে কিন্তু বাণিজ্য-লক্ষ্মীর প্রসন্নতা উপন্যাসের সাজ-গোজ ঠাট-ঠমক ছাড়া মেলে না। সেখানে সার্থক-অসার্থকে ভেদ সামান্য। অথচ ছোট গল্প দুয়োরানির মত দপ্তরীর ঘর থেকে অবশেষে পুরনো-কাগজ বিক্রেতার দৌলতে ঠোঙার আকারে লয় পায়। এই ট্রাজিক পরিণতির প্রতিবাদ করার জন্য প্রকাশকের বদান্যতা দুর্লভ। অরণ্যে-রোদনের চেয়ে রাষ্ট্রের কাছে আবেদনে সাড়া পেয়ে এই গল্প সংগ্রহের লেখক ধন্য।

১০ই আগস্ট ১৯৫৯

কলকাতা-৭০০ ০০৪

রমাকে আজ আর সঙ্গে আনে নি রানী। কি হবে এনে। ও কেবল কাঁদে। বেচারী ছেলেমানুষ। এটা বোঝে না যে, চোখের জল ছোঁয়াচে। কান্না কি রানীরই পায় না? কিন্তু নিজেকে শক্ত না-রাখতে পারলে খোকনের কি দশা হবে—সেও ত সামলাতে পারবে না। আর এইসব থানার লোক বিরক্ত হয়ে ধমক দেবে, নয় ত রুক্ষ মেজাজে তাগাদা দেবে,—'হয়েছে আপনাদের?' তারপরই হাত বাড়িয়ে দেবে খোকনের দিকে। তখুনি আবার লক-আপে ঢুকিয়ে দেবে। এক বছর ধরে জেল গেট দেখে রানী বুঝেছে, কান্নাকাটির কোনো দাম নেই।

আজ অবিশ্যি একা আসে নি রানী। একজন সঙ্গী জুটেছে। হৃদয়ের মা। হৃদয় আর খোকন যেমন একই সঙ্গে ধরা পড়েছিল তেমনি বরাবর এক জেলেই ছিল। আর আশ্চর্য দুই গার্জেনের দেখা করার দিন-সময়ও এক। এবারও জেল থেকে ওদের দুজনকেই বড় লোহার দরজার বাইরে পার করেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গাড়িতে তুলেছে। না, একটু হাঁটতেও দেয়নি জেলের বাইরে।

খোকনের সেই একটু হাসি আর ভারি গলায় কী শ্লেষ। কাল ও বলল—'না মা, আমাদের এরা খুব যত্ন করে। নইলে দ্যাখো, বাসে-ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে আপিস যেতে বাড়ি ফিরতে কতো ধকল পোয়াতে হত। এরা একেবারে হাজির গাড়ি নিয়ে, সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের জন্যে। বেরুতে যা দেরি।'

ছেলেটা এখনো ঠিক তেমনি তামাশা করে কথা বলে। তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ ভেঙে পড়ে। পুজোর পর যখন রানী জেলে দেখা করতে গিয়েছিল তখন খোকন বলেছিল—'আর পারছি না মা। বাপীকে বল, এক বছর ত হয়ে এল। এবার যেন আমায় ছাড়াবার জন্যে একটু চেষ্টা করেন। হয়ত ছেড়ে দেবে তাহলে।' খুব সহজ সুরে বলতে গিয়েও ছেলেটার গলার স্বর কেমন বুজে এসেছিল!

বেচারী খোকনের বাপী। একা মানুষ, সংসারের কোন্ দিকে নজর দেবে ভাবতেই দিশেহারা। রানীর কষ্ট হয় ওঁকে কিছু বলতে। অথচ বিধাতা এমনই করেছেন যে, দুনিয়ায় দ্বিতীয় কাউকে বলার সুযোগ নেই। ছিল যে সে ত এখন হিসেবের বাইরে। মাথায় কী যে পোকা ঢুকলো, নেশায় মেতে উঠল। কিছু বলতে গেলে, বাধা দিতে চেষ্টা করলে ভুরু কুঁচকে বিচিত্র হাসির আমেজ ছড়িয়ে জবাব দিত—'তুমি বোঝ না মা, অন্যায়-অবিচার আর অত্যাচারের মোকাবিলা করার দিন এসেছে। সবাই যদি মুখ বুজে এইভাবে মার খেয়ে যায় তাহলে মানুষের কষ্ট কোনো দিন ঘুচবে না। জবাব দিতে হবে।' কিংবা কখনো বলত—'এমন কোনো কাজ করব না যাতে তোমাদের ক্ষতি হয়।' খোকনেব বাপী এক-একদিন ক্ষেপে গিয়ে ছেলেকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার হুমকিতে ফেটে পড়তেন। আশ্চর্য, মাথা হেঁট করে সেই বকুনি মুখ বুজে হজম করত।

পুরনো দিনের ছবিতে রানী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। পাশ থেকে হৃদয়ের মা হঠাৎ বললেন—'দিদি, দেখুন ত ওই লোকটা কিনা।'

দুই ছেলের দুটি জননী প্রতীক্ষা করছেন একটি মানুষের জন্য। যিনি কাল আশ্বাস দিয়েছিলেন—'রোজ আসবেন। ছেলেকে দেখে যাবেন—কোনো অসুবিধে হবে না।'

চমকে রানী তাকাল—'কে? কই!' ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। বারান্দাটায় পড়ন্ত বিকেলের ছায়া। বাইরে বেরিয়ে, চলে যাওয়া লোকটির ওপর নজর বুলিয়ে মুখ আঁধার করে দাঁড়িয়ে রইল রানী। বারান্দার নিচে উঠোন। উঠোনে ব্যাডমিণ্টনের কোর্টে চারটি ছেলে খেলছে। ওরা খোকনের চেয়ে বয়েসে একটু কম। রানীর শূন্যদৃষ্টি ওদের ওপর দিয়ে তিন-চার বছর পেরিয়ে গেছে। ছেলের খেলার শখ হয়েছে। বাপের পুরনো বেঁকে-যাওয়া র‍্যাকেটখানা নিয়ে মেরামতের কসরত করছে। নতুন ত কেনার পয়সা নেই। পারতো ছেলেটা। মাথা খাটিয়ে ঘরের আলনা তৈরি, বাথরুমে একটা কাঠের ডাণ্ডাকে পাড় দিয়ে ঝুলিয়ে কেমন সুন্দর কাপড়-গামছা রাখার ব্যবস্থা করেছিল—সেটা আজও আছে···'আপনি এখানে দাঁড়াবেন না। ঘরে গিয়ে বসতে বললাম যে!' গোঁফওয়ালা বদ মেজাজী সেপাইটার ধমকে রানী আবার নিজের চেয়ারে এসে বসল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মুখ দিয়ে শুধু বেরলো—'না দিদি। তিনি নন্!'

থানার আপিস ঘর। তিনখানা টেবিলে কাজ আর গল্প চলছে। দুটি মহিলা চতুর্থ টেবিলে মুখোমুখি দুই চেয়ারে বসে। হৃদয়ের মা অধীরভাবে বললেন—'অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল দিদি, কই তিনি ত এলেন না।'

একটি মেয়ে ঢুকলো। তার পিছনে বছর ত্রিশ বয়সের একজন দোহারা ভদ্রলোক। মহিলা দুজনকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—'আপনারা?'

ও-পাশের টেবিল থেকে একজন বললেন—'ও'রা কেষ্টো বাবুর জন্যে বসে আছেন।'

রানীর মনে হল নবাগত ভদ্রলোক হয়ত সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন তাই সহানুভূতি উদ্রেকের সুরে বলল—'দেখুন, কেষ্টো বাবু আমায় বলেছিলেন ছেলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন। কালও তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তা ঘণ্টা দুই হল বসে আছি। তিনি ত এলেন না। আপনি যদি—'

ভদ্রলোক ফিরেও দেখলেন না। ওধারের যে টেবিলে একজন বসে কাজ করছিল সে উঠে তাঁকে চেয়ার ছেড়ে দিতে বসে পড়লেন এবং উদাসীনভাবে জবাব দিলেন—''যিনি বলেছেন আপনাকে তিনিই ব্যবস্থা করবেন। জানেন ত লক-আপে থাকলে দেখা করার নিয়ম নেই।'

হৃদয়ের মা বললেন—'তিনি কখন আসবেন?'

—তা বলা যায় না। আসতেও পারেন, নাও পারেন।

—কি হবে দিদি কেষ্ট বাবু যদি না আসেন?

হৃদয়ের মায়ের এ কথার জবাবে রানী কিছুই বলে না। কী বলবে? রানীর ত তবু ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। হৃদয়কে যে কোথায় রাখা হয়েছে তা-ই জানতে পারে নি ওর বাড়ির লোক। তিন-চার দিন ধরে একবার লালবাজার, একবার এ-থানা, একবার ও-থানা দৌড়ে বেড়িয়েছে তনয় আর মলয়—হৃদয়ের দুই দাদা। যেখানেই গিয়েছে সেখানেই শুনেছে 'না আমরা বলতে পারবো না। দেখুন খোঁজ ক'রে লালবাজারে। হয়ত এস-বি, কি, ডি-ডি থেকে ধরে থাকবে।' রমাকেও ত এই থানার লোক ওই কথা বলেছিল। অথচ রমা দেখেই লোকটিকে চিনতে পেরেছিল। সেই সবুজ সোয়েটার আর চোখের কোণে কাটা দাগ—ওই লোকটিই রমার ভাইকে হাত ধরে গাড়িতে তুলেছে। সকাল থেকে আড়াই ঘণ্টা ওরা সবাই প্রতীক্ষা করছিল জেল গেটে। রমার আশা তার ভাই ছাড়া পেলে ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি নিয়ে যাবে। আর নানান

থানার লোক গাড়ি নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল যাদের ছাড়া হবে তাদের তুলে নেবার জন্যে। রমা ত আর তা জানতো না। গাড়িতে যখন ওদের ওঠানো হয়—তখন খোকনই জোর গলায় বলেছিল—এই থানার নাম। ওরা গাড়িতে, রমা বাসে—গন্তব্য এক হলেও গতির তারতম্যে রমার পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল। সবুজ সোয়েটার পরা লোকটা অম্লান বদনে রমার কথা এমনভাবে উড়িয়ে দিল যে বেচারী থ হয়ে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারেনি। রমা ঢোক গিলে আর একবার বোঝাতে গিয়ে আরও ধাক্কা খেয়েছিল। লোকটা বলেছিল—'আপনার ভুল হচ্ছে। এখান থেকে কেউ ওই জেলে যায় নি। আপনি—' রমা ছেলেমানুষ। একজন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানকে এ-রকম ডাহা মিছে কথা বলতে দেখে মনে মনে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়েছিল সে। থানায় আর এক-মুহূর্তও দাঁড়ায় নি। রানী আশায়-আশায় বসেছিল দুই ভাই-বোনে ফিরবে—কতোদিন পরে বাড়ির ছেলে ঘরে ফিরবে। বেলা দুটোর সময় ঝোড়ো কাকের মতো রমা ফিরেই কান্নায় ভেঙে পড়ল।...

যে মেয়েটিকে নিয়ে এল সে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। বয়স সতেরো আঠারো হবে। রমার বয়সী। হয়ত দেখতে রমার চেয়ে ভালো, কিন্তু চেহারাটা দেখলেই টের পাওয়া যায় তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।

ভদ্রলোক ভূমিকা করলেন—'এখন কেমন লাগছে বীণা? বিপ্লব এসে গেছে তাই না?' মেয়েটি জবাব দিল না।

—'আচ্ছা বীণা, তুমি কি মনে করো কটা পুলিশকে খুন করতে পারলেই বিপ্লব হল। আর রাতারাতি দেশের চেহারা পালটে যাবে?'

হৃদয়ের মা, রানী উভয়েই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

ভদ্রলোক বোধহয় সেটা টের পেয়েছিলেন, বললেন—জানেন, যেদিন একটা পুলিশ মারা হত সেদিন বীণাদের বাড়িতে উৎসব হত। পোলাও মাংস খেয়ে ওরা আনন্দ করতো। কী বীণা তাই করতে না?'

মেয়েটিকে বার কয়েক ওই একই প্রশ্ন করার পর ও শুধু ছোট্ট করে ঘাড় কাত করে জানালো কথাটা সত্যি।

জেরা চলল। ভদ্রলোক চিবিয়ে চিবিয়ে একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঁচ সাত বার করে মেয়েটির ধৈর্য আর সহনশীলতার দুর্গভেদের চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছেন। বীণার বাবা বৃদ্ধ, এখন শেষ দিনের দিকে তাকিয়ে ক্যান্সারে শয্যাশায়ী। বীণাকে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা হয়েছিল, ওর বালিশের তলায় রিভলবার পাওয়া

গেছে। ওর কাজই ছিল মাল পাচার করা। কতোদিন ধরে' কতোগুলো মারণাস্ত্র ওর হাত দিয়ে চালান হয়েছে তার হিসেব নেই। বেশ কিছুক্ষণ এই বিচিত্র কাহিনীর জালে রানী জড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েটা কেমন নির্বিকার। মাথাটা ওর একভাবে রয়েছে। পিঠের ওপর রুখু চুলগুলো পর্যন্ত নড়ছে না। রানী ভাবছিল ভদ্রলোকেরও অসীম ধৈর্য।

হৃদয়ের মা ওর গায়ে ঠেলা দিলে রানী চোখ তুলল।

রানী কাগজে মোড়া জামা আর পাজামার প্যাকেটটা দেখল, প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে আর একটা মোড়কে আছে নাড়ু, কলা, পাঁউরুটি আর দুটো কমলালেবু। কাল খোকন বলে দিয়েছিল, সাতদিন স্নান হয়নি, এক জামা-কাপড়ে কাটছে, উপায় কি? আচ্ছা এই মেয়েটাকে কোথায় রেখেছে? ওরও কি স্নান বন্ধ? রানীর মনের মধ্যে মুহূর্তে যেন সব কিছু ওলট-পালট করে দিচ্ছে। ইস্, কতো দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপিস থেকে রুমার বাবা হয়ত এতক্ষণে ফিরেছেন। নিশ্চয় ব্যস্তভাবে পায়চারি করছেন আর সিগারেট টানছেন। বেশি সিগারেট খাওয়া বারণ, তবু—।

ঘরের মধ্যে দীর্ঘকায় একজন ঢুকলেন। দেখেই মনে হয় পদস্থ অফিসার। সবাই উঠে দাঁড়াল, কপালে হাত তুলে স্যালুট করল। রানী, হৃদয়ের মা দুজনেই উঠলেন। গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে ভদ্রলোক চারদিকে নজর বুলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন দেখে রানী আর্তস্বরে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে– 'শুনছেন।'

হৃদয়ের মা কয়েক পা এগিয়ে ভাঙাভাঙা গলায় বললেন–দেখুন আমরা তিন ঘণ্টার ওপর বসে আছি। ছেলেকে একটু দেখবো, দেখেই চলে যাব।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন–লক-আপে ত দেখা করার নিয়ম নেই।

ভদ্রমহিলা কাতর কণ্ঠে বললেন—কত দূর থেকে এসেছি। এতদিন ত জানতেই পারিনি আপনার এইখানে ওরে রেখেছেন। আমার ছেলেরা তিন-চার দিন এসে ঘুরে গেছে, কেউ সত্য কথা বলে নাই। এইভাবে ভুগিয়ে কি লাভ হয় বলেন ত। মায়ের দুঃখ।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। তারপর ঘরের কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন— 'এঁদের কেন বসিয়ে রাখা হয়েছে।' পূর্ব-মুহূর্তের হাসির সঙ্গে এই কথার সঙ্গতি খুঁজে পেল না রানী।

যিনি মেয়েটিকে জেরা করেছিলেন তিনি ছাড়া আর সকলেই সমস্বরে জবাব

দিল—দেখা হবে না একথা অনেকবার বলা হয়েছে, তবু যদি ও'রা বসে থাকেন ত আমরা কি করতে পারি স্যার? মেয়েছেলের উপর ত আর জোর খাটানো যায় না।

ভদ্রলোক রানীর দিকে একবার চোখ রেখেই দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। এবং গম্ভীরভাবে বললেন—আপনারা কেন যে আসেন বুঝি না। যদি ফিরিয়ে দিই তখন দোষ দেবেন আমাদের। বে আইনি কাজই বা কি করে হতে দিই বলুন!

রানী বুঝতে পারে দেখা আজ হবে না। তবুও প্রশ্ন করে—দেখা না হলে এগুলো নিয়ে কি করি বলুন ত?

এবার তিনি সরাসরি তাকালেন—কী? এগুলো মানে—

খানিকটা ভরসা পেল রানী—খোকনের জামা-কাপড় এনেছিলাম। কাল ও বলে দিয়েছিল আনতে। আজ দশদিন ধরে একবস্ত্রে রয়েছে। স্নান পর্যন্ত হয়না। গায়ে একটা চাদর ছিল তাও ত আপনাদের আপিসে জমা করে নিয়েছে। না গামছা, না চাদর, এমন কি দাঁতমাজা মুখধোয়া, মাথা আঁচড়ানোর চিরুনিটি পর্যন্ত কাছে রাখা আপনাদের বারণ! ও বলেছিল জামা-টামা পালটে নেবে তাই এনেছি। আর এই নাড়ু তৈরি করেছি। কলা, কমলা, এই—

ভদ্রলোক নিজের হাত দুখানা মুঠো করে সামনের দিকে আস্তে আস্তে নাচাচ্ছিলেন—রানীর কথা শেষ হতে থামিয়ে বললেন—দেখুন, লক-আপ থেকে ওদের বার করা হবে না। আপনার যা দেবার সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে বাড়ির কোনো খাবার দেবার নিয়ম নেই—

হৃদয়ের মা বললেন—কেন? মা হয়ে ছেলেকে ত আর বিষ মিশিয়ে দেবে না খাবারে।

ভদ্রলোক আবার হাসলেন।

রানীর বুক কেঁপে উঠল। লোকটার হাসিকে ওর ভয়।

সেই মুহূর্তে জেরা করা ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণস্বর ঘরখানায় ছড়িয়ে পড়ল—তুমি নেহাত মেয়েছেলে তাই গায়ে হাত দিতে পারছি না। নইলে চাবকে বুকের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে বসে কথা কি করে বের করতে হয় দেখিয়ে দিতাম।

ওদিকে কান দেবার মত অবকাশ নেই রানীর। উদগ্র আগ্রহে অফিসারের বেদবাণী শোনার জন্য ও মুহূর্তকে আটকে রেখেছে চোখের তারায়। হৃদয়ের মায়ের যুক্তি দিয়ে আর যা-ই হোক কাজের কাজ হবে না রানীর তা জানা হয়ে

গেছে। ও বলল—আজ যখন এগুলো এনেছি মা হ'য়ে কি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাই বলুন।

—ঠিক আছে। আর কখনো আনবেন না।

ভদ্রলোক হাঁক দিলেন—লক আপ!

একজন সেপাই এল।

অফিসার-পদোচিত গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন—ওর হাতে দিয়ে দিন।

প্লাস্টিকের বালতি-ব্যাগটা হাতে তুলে রানী বলল—আমরা ওর সঙ্গে যাই, নইলে ছাড়া কাপড়চোপড়—

—না-না কোনো চিন্তা করবেন না। একটু অপেক্ষা করুন লক-আপের ওই লোকই সব এনে দেবে।

লক-আপের লোহার মোটা গরাদ দেওয়া দরজাটা বারান্দা থেকে দেখা যায়। বার কয়েক দুই মা-ই সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এর আগে—যদি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দিচ্ছিল না থানার লোকেরা। অদ্ভুত এদের মেজাজ। নজরে পড়লেই তেড়ে আসছিল, হাঁকিয়ে দিচ্ছিল। এমন ভাব যেন লোহার গরাদ দিয়ে দেখা হলেই ওদের কেড়ে নিয়ে পালাবে এই মায়েরা!

হৃদয়ের মা বললেন—চলেন দিদি আমরা বাইরে যাই, এখানে এঁদের কাজের অসুবিধা হচ্ছে।

অফিসারটি এবার কিছু বললেন না।

বারান্দাটা ইংরেজি 'এল'-এর মতো। দুই লাইনের সংযোগস্থলে দাঁড়ালে একেবারে লক-আপ দরজার মুখোমুখি হয়ে ভেতরের দেয়াল অবধি নজর চলে যায়। একফালি বারান্দাটার বাঁ পাশেও থানার অফিস। সেখানে কর্ম-ব্যস্ততা। রানী অতি সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে! বারান্দার নিচে মাঠে 'গেম-বল' হাঁক উঠল। এদিকে গরাদের লোহার লম্বা লোহাটার সঙ্গে মুখ-মাথা যতোটা ঠেলে দেওয়া যায় দিয়ে খোকন আর হৃদয় চেঁচিয়ে বলছে—'মা তোমরা চেষ্টা করছ ত! বাপীকে বল আসতে, দাদাকে বল যেন তাড়াতাড়ি করতে। এখানে রাখবে না কিন্তু। খুব শিগগির। সোনা কাকা যেন আসে।'

লক-আপের লোকটি ওদের আড়াল করে দাঁড়াল। ওরা দুজনেই হাঁটু মুড়ে কাত হয়ে দেখছে। রানীর বুকের মধ্যে কি অসহ্য ঝড়। মনে হচ্ছে দেহের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে বেরিয়ে আসবে। হাত নেড়ে জানাতে

চাইল অনেক অনেক কথা, কিন্তু—! দেখেছে জেল গেটেও ঠিক এমনি হয়—গুছিয়ে রাখা সব কথাই হারিয়ে যায়। হাতড়ে খুঁজে পাওয়ার আগেই তাগিদ দেয় পিছনের বিধাতা। এমনিই হয়। কাল তবু পাশাপাশি চেয়ারে বসে কথা হয়েছিল। সে তো বার বারই বলেছে—'আমি আর পলিটিকস করব না। ও'রা যেমন ভাবে চান লিখে দেবো। বাপীকে বল দেরি হলে মিসাতে ঠেলে দেবে কিন্তু।' রানীও বলেছে কাকে কাকে ধরা হয়েছে। খোকনের বাপী যে তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন সেটা ছেলেকে বুঝিয়েছে রানী। খোকন বলেছে মিথ্যা একটা চার্জ সাজিয়ে ছুটির দিন তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে দাঁড় করানো হয়েছে। আবার তারিখ পড়েছে রবিবারে।

খোকনের মুখ এখন দেখা যাচ্ছে না। এই ফাঁকটুকুও রানীর মনকে খোকনের গত সন্ধ্যার সাক্ষাতের স্মৃতি জুড়ে দখল করেছে। থেকে থেকে ছেলেটা কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠছিল, 'দ্যাখো ওদের কি মগজ মা। এদিকে লক-আপে আটক রেখে দিয়ে দিব্যি বলে দিল আমি নাকি ছাড়া পাওয়ার পরদিন রাত্রে বোমা পিস্তল নিয়ে সিনেমার সামনে দাঙ্গা করেছিলাম বুঝলে।' মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি জানি খোকনের হয় ত মনে হয়েছে যে, যথেষ্ট ধাক্কা লাগে নি, তাই পুনরাবৃত্তি করল—'বুঝলে মা! ভাবলেও হাসি পায়, ওরা কেমন মিছে কথা বানাতে পারে!' রানীর পাশে হৃদয়ের মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। টের পেল কিন্তু কিছু বলল না। বাধা দিয়ে কি হবে! আর কি বলেই সান্ত্বনা দেবে? সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে রেখে রানী পাশের অফিসের দ্বিতীয় দরজাটা পেরিয়ে গেল। বালতি ব্যাগ নিয়ে লোকটা আসছে। গরাদেতে আবার সেই মুখ, খোকন, হৃদয় 'আসবে! কাল এসো। বাপীকে বল। সোনা কাকা। দাদা…। চেষ্টা…'

বালতি-ব্যাগ ফেরত দিয়ে লোকটি বলল—'আর দাঁড়াবেন না। আমাদের শেষে ফ্যাসাদে পড়তে হবে।'

বন্দুকধারী দু'জন লোক আপিসের সামনে খট খট শব্দে এসে দাঁড়াল।

আর কি হবে। রানী শেষবার তৃষিত দৃষ্টি দিয়ে পিছন ফিরল।

হৃদয়ের মা হঠাৎ সামনের দিকে হন হন করে চলে গেলেন। লোকটি হই হই করে পিছু পিছু ছুটল। তিনি বাধ্য হয়ে গর্জে উঠলেন—খেয়ে ফেলবে নাকি! একি অন্যায়। চোখের দেখা, একটু কাছে গিয়ে, তাতেও—

রানী এবার এগিয়ে তাঁর হাত ধরল—চলুন দিদি। কি হবে ওদের সঙ্গে

ঝগড়া করে ?

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তিনি মাঠের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'এগুলো কি মানুষ ?'

ত্বরিতপদে রানী তাঁকে কতকটা জোর করে ডজনখানেক পুলিশ আর সি-আর-পি-ই হবে (নইলে পোশাক আলাদা কেন হবে। এটা রানী কাউকে জিগ্যেস না করে নিজেই ধারণা করে নিয়েছে)—তাদের পেরিয়ে খোলা আকাশের নিচে নামল।

তারপর স্বগতভাবেই বলল—ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই দিদি।

—আপনিই বলুন ভাই, আমরা দাঙ্গাও করিনি, ছেলেকে ছিনিয়ে নিতেও আসিনি। কিন্তু এমন ভাব করে—

থানার এলাকা পেরিয়ে বিরাট চওড়া রাস্তা। হরদম বড় বড় ট্রাক, বাস, নানা ধরনের গাড়ি চলছে। এখানে দাঁড়ালে মনে হয় যেন অন্য জগত !

রানী বলল -দেখুন সব বুঝেশুনেও মুখ বুজে সইতে হয়। ছেলে-গুলোর মুখ চেয়ে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

– তা সত্যি। সত্যি কোনো উপায় নাই। বড় ছেলেটা আজ কদিন কি দৌড়নই না দৌড়াচ্ছে, আর তেমনি দু-হাতে খরচও করছে। কাজ কারবার দেখারও ফুরসত পায় না দিদি। এত করেও যদি হৃদয়কে ছাড়াতে না পারা যায় তাহলে কি হবে ভগবানই জানেন।

রানী বলল—আমাদের উনিই কি কম করছেন। নবকংগ্রেসের লিডারকে ধরা থেকে শুরু করে সরকারি বড় কর্তা কিছুই বাদ নেই।

—আপনার কর্তার ত অনেক জানাশোনা। নইলে আজও হয়ত হৃদয়ের খোঁজ বার করা যেত না।

– না দিদি জানাশুনো দিয়েও কিছু কাজ হচ্ছে না। দেখলেন ত ব্যাভার।

– টাকা ছড়াতে পারলে কোনো ভাবনাই ছিল না।

কথাটা রানীর পছন্দ হল না। কি জানি ওর ধারণা শুধু টাকা পয়সায় এ সমস্যার মীমাংসা হবার নয়। এই এক বছরে ওর যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বুঝেছে ব্যাপারটা খুব জটিল। অনেক ধনীর দুলালকেও রানী জালের ওপারে মলিন মুখে লোহার রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। তাদের বাড়ির লোকেরা নিশ্চয় টাকা ঢালতে কার্পণ্য করে নি। আসলে সরকারপক্ষ কতকগুলি ধারণার

বশেই এমন একটা পথ বেছে নিয়েছে যাতে রানী বা হৃদয়ের মায়ের কোনো দিক দিয়ে আশা-ভরসা আশ্বাস মিলছে না।

হৃদয়ের মা বললেন—এখন কি করবেন ?

—বাড়ি যাবো। রান্নাও ত করতে হবে। উনি হয়ত ভাবছেন— !

একখানা বড় ট্রাক ঝকড়-ঝকড় করে চলে গেল। হৃদয়ের মা চোখ মুছে বললেন—না তা বলছি না। কাল আসবেন ত ?

—আসতে হবে। আপনার ত শরীর ভালো না—

—হ্যাঁ। আজ ত ছেলেদের লুকিয়েই এসেছি। কাল ওদের পাঠিয়ে দেবো ভাবছি। যদি ওরা টাকাপয়সা দিয়ে বাইরে এনে কথা বলতে পারে দেখুক চেষ্টা করে।

যুক্তিটা মন্দ নয়। কেন না এর আগে যে থানার লক্-আপে ছিল সেখানে ওইভাবেই নিচের তলার লোকদের সাহায্য মিলেছিল। তবে এটা শোনা কথা—সত্যিমিথ্যে কিছু জানা নেই রানীর। খোকনের বাপী এ থানা ও-থানা ঘুরে শেষে ওখানে গিয়ে দ্যাখেন বড় কর্তা পুরনো বন্ধু। তিনি অনেক সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং পরামর্শও দিয়েছেন কাকে ধরলে কাজ হবে। তদবির করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সরকারী মহল প্রায় অনড়। তাঁদের কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না যে, এই ছেলেদের আবার সমাজের সাধারণ জীবনে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া দরকার। তাঁরা ভাবছেন এদের আটকে রাখলেই আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হবে। রানীর স্বামীকে একজন বড় অফিসার বলেই দিয়েছেন—'ফিরে এলে এরা যে আবার আর দশটা ছেলের মগজে ভ্রান্ত পথের বিষ ঢুকিয়ে দেবে না এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। মশাই, এক্সপেরিমেন্ট করার মতো অবস্থা আর নেই।'

আরও সাত-সতেরো রকমের চিন্তার এলোমেলো ধাক্কায় রানী কেমন দিশেহারা বোধ করে। এর মধ্যে কখন হৃদয়ের মা বিদায় নিয়ে বাসে উঠে চলে গেছেন, কখন রানীর চোখের সামনে দিয়ে ওর বাড়ি যাবার বাসগুলো থেমেছে ছেড়েছে রানী দেখেও দ্যাখে নি। ওঠবার কথা মনেও পড়ে নি। ওর কেবলই মনে হচ্ছে, এইভাবে আর কতো কাল ছেলেটাকে কাটাতে হবে, তার বাবার উদয়াস্ত খাটুনিতে শরীরটা আরও ভেঙে পড়বে—দেখতে হবে, কিন্তু করার মতো কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা ওই মেয়েটা যাকে জেরা করা হচ্ছে, ওরই বা ভবিষ্যত কী। আচ্ছা, এই

যে মিথ্যে একটা দাঙ্গার দায়ে খোকনকে জড়ানো হয়েছে সত্যিই কি এর জন্য ওকে সাজা খাটতে হবে। রমার কথা ভাবলে আরও কষ্ট হয়—ওর নরম মনটা কিভাবে এরা বিষিয়ে দিচ্ছে। রমা ত এখন পুলিশের নাম শুনলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে। কিন্তু ছেলের কাকা পুলিশে চাকরি করেন এতেই রমার দারুণ আপত্তি। কাল বলে দিয়েছে ওখানে যদি বিয়ে দাও তার আগে আমি বিষ খাবো।

পর পর দুখানা কালো ভ্যান চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে রানীর বুকের মধ্যে ধাক্কা লাগল। চমকে উঠে ও চলতে শুরু করল। না, বাসে উঠবে না। বরং সেই পয়সা দিয়ে কাল খোকনের জন্যে দুটো কলা কেনা যাবে। এই ত এইটুকু পথ, গলিগলি হাঁটলে কতোই আর সময় লাগবে! তবু ত কিছু সাশ্রয় হবে সংসারের।

লোহার গরাদ ধরে দুটো শুকনো মুখ। মাটিতে বসে পড়ে ওরা বলছে— 'তাড়াতাড়ি করো নইলে দেরি হয়ে যাবে। আবার এস।' আর তাদের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইছে বন্দুকধারী অনেক-অনেক পল্টন, তাদের মুখ নেই সমস্তটাই পাথরের চেয়েও নির্মম পিঠ।

সামনাসামনি একটা লোক পথ আগলে দাঁড়িয়ে। পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে রানী আবার দেখল, লোকটা সরে এসেছে। পথ বন্ধ। রানী চায় নি ওই অসহায় ছেলেগুলোর কাছ থেকে মনকে সরাতে। কিন্তু এই জনবিরল পথে এইভাবে বাধা পেয়ে বিরক্ত হল, তারচেয়ে বেশি ভয়। বিভ্রান্ত হয়ে অন্যধারে যাবার চেষ্টা করবে কিনা ভাবতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রানী। মুখগুলি হারিয়ে গেল সেই মুহূর্তেই। সঙ্গীহারা রানীর চোখের সামনে ঘন অন্ধকার নেমে আসে।

অতিপরিচিত কণ্ঠস্বর—রাণু!

এবার মুখ তুলে তাকাল রানী—তুমি?

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রানী বুঝতে চেষ্টা করে তার মনের ভাব। আর বলে—বাড়ি ফিরছি না বলে খুঁজতে বেরিয়েছ? খুব রাগ করেছ, হাঁ গো!

বিরাম চৌধুরী ক্লান্তি মুছে ফেলে বললেন—চলো একসঙ্গেই ফিরি।

—তার মানে, তুমি আপিস থেকে বাড়ি যাও নি?

—না। এই খোকনের ব্যাপারে একজনের কাছে একটু কনসাল্ট করতে

এলাম। কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল। আমার ভয়ই হচ্ছিল, বাড়ি ফিরে বকুনি খেতে হবে।

—এখানে কে? তোমার সেই উকিল বন্ধু রমণীবাবু?

—হ্যাঁ।

—তা উনি কি বললেন?

—বললেন মিথ্যে মামলার বিরুদ্ধে লড়ে কোনো লাভ হবে না। বরং বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে ছেলেটাকে তার জের সামলাতে হবে। ওরা যা চায় তা-ই মেনে নিতে হবে। এছাড়া কোনো পথ নেই।

রানী একটু হাসল।

—হাসলে যে!

—এমনি।

—চলো।

—হ্যাঁ, পথের মধ্যে এইভাবে বেশিক্ষণ থাকলে লোকেই বা ভাববে কি।

—দ্যাখো—

—বলো।

—আমাদের জীবনটা মেনে নিতে নিতেই শেষ হবে একদিন।

—কি রকম?

—এই একবার ওরা যা করল তা মানতে হল—

—আবার এখন এরা যা করবে তাও না-মেনে উপায় নেই।

ওরা চলতে চলতে কথা বলছিল। এক সময়ে কথা ফুরিয়ে শুধু চলার গতি নীরবতার পাশাপাশি সময়কে টানতে থাকল। একজন দেখল দেয়ালে মুছে আসা লিপির সারি আর কতকগুলি দেয়ালে নতুন হরফের তাজা কালিতে দেয়াল ভর্তি। আর একজনের চোখের সামনে সেই মুখগুলি, সেই পিঠ ফিরে এল॥

॥ দুই ॥

সারাদিন গুমোট গরম গিয়েছে। সন্ধ্যের পর একটু ঠান্ডা ভাব পেয়ে আরাম-আয়েসে আমরা দু'জন চৌপাইতে বসে গল্প করছি, অন্তু ভাই আর আমি। অন্তু ভাই এখানে আমার একাধারে সহকর্মী আর অভিভাবকও বটে। গল্প বলতে কলকাতার কথা। আমার বলতে ভালো লাগে, তাই হয়ত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শুনতে চান অন্তু ভাই।

—আজ তোমার চিঠি এসেছে না?

—হ্যাঁ, ছোটদির চিঠি।

—কী সব খবর ভালো ত! মাতাজী ভালো আছেন?

একে একে সব কুশল প্রশ্নের পরে আসবে—দিদি আমাদের কথা কিছু লিখলেন নাকি?

ছোটদি সেই শীতের সময়ে এসেছিল। ক'দিন উনাতে ছিলও—ক'দিনই বা। তাও ত ঘোরাঘুরির ওপরই কেটেছে। গির-এর জঙ্গলে সিংহ দেখার জন্য রেস্ট হাউসে আর তুলসীশ্যাম, শাসনগির এমনি ভাবেই বেশীর ভাগ কেটেছে। তবুও ওই সাত দিনের অল্প চেনা-জানার মধ্যেই জুনাগড়ের বন্ধু পরিচিত মহলে ছোট্‌দি কেমন ক'রে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি ক'রে গিয়েছে। অন্তু ভাই বিশেষভাবে ছোট্‌দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে দ্যাখেন। অতএব ছোটদি কিছু না লিখলেও চিঠি এলেই বলি—হ্যাঁ, আপনার শরীর কেমন আছে জানতে চেয়েছে। জীতুর বেড়ালটা কত বড় হ'ল সেটাও—

অন্তু ভাই উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠেন—বেটী পাগলী আছে। বড় ভালো মেয়ে।

আবছা আলোতে খাদি ভাণ্ডারের সামনের পথ থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল—কে ভালো মেয়ে অন্তু ভাইজী? নিশ্চয় খুকু বেন নয়।

অন্তু ভাই গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করলেন—আরে আসুন, আসুন। খুকু বেন, জরুর খুকু বেন। অমন ভালো মেয়ে তোমার তামাম সৌরাষ্ট্রে দুটো পাবে না খুঁজে।

*মাছি

সাইকেল নিয়ে বি, ডি, ও, মিঠু ভাই পেঁছে গেলেন। মিঠু ভাই যে কোন প্রসঙ্গে অন্তু ভাইকে উস্কে দিয়ে চুপচাপ তামাশা দ্যাখেন। ওঁদের দোস্তীর ধরনই এই। মিঠু ভাই-এর মুচকি হাসি গোঁফের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে—হাঁ-হাঁ, সাতটা সিংহ একটা মহিষ মেরে খাচ্ছে, এই দেখে যে মেয়ে অজ্ঞান হয় না, বলে রাইফেলের গুলিতে এগুলোকে মেরে ফ্যালা হচ্ছে না কেন? দাও, দাও আমায় একটা রাইফেল দাও—। সেই মেয়ে ডাকু—জরুর ডাকু—

এরপর হামেশা যা হয়ে থাকে—অন্তু ভাই-এর ক্ষেপে যাওয়ারই কথা; কিন্তু বাধা পড়ল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। অচেনা এক ভদ্রলোক এসে অন্তু ভাই-এর পাশে দাঁড়ালেন। অমনি মিঠু ভাই ব্যস্ত হয়ে বললেন—এবার ঘরে গিয়ে বসাই ভালো। বাইরের লোক ত আসার সময় পার হয়ে গেছে। আপনার চৌপাই ত দুবলা আছে। হরি ভাইয়ের ভার সইবে না।

নবাগত হরি ভাই উচ্চ কন্ঠে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন—আরে ভাই বিলকুল ধরমের বাজরা খাই তাই এমন গতর তৈরী হয়েছে।

দোতলায় পাশাপাশি চারখানা ঘর। দপ্তরখানা মাঝখানে। দক্ষিণ কোণে আমার শোয়া-বসা সবই একখানিতে চলে যায়। অন্তু ভাই বললেন—'চলো, তাই ভালো।' অন্যান্য সন্ধ্যার মতো অন্তু ভাই-এর বৈঠকখানা দখল করলাম আমরা। জীবা ভাই আমাদের দেখে বারান্দায় চলে গিয়েছিল। বি, ডি, ও, তাকে ডাকল—'আরে জীবা ভাই, গত শনিবার তোমার জাম্বালায় জাহের সভা ছিল না?'

—হ্যাঁ, ছিল ত। জান্বালায় নয়, শাসনগির আশ্রমে।

বারান্দা থেকেই উত্তর এল জীবাভাই এর তরফ থেকে।

—তা কি হ'ল সেখানে? শোনাও ত। তোমাদের সমিতি যেভাবে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে তাতে আমাদের চাকরিই চলে যাবে কোনদিন। সরকার বলবে, কোন কাজ নেই, সব ত সমবায়বালারাই করছে—তোমরা বাড়ি যাও।

জীবা ভাই কোনো উত্তরই দিল না। সাড়া না পেয়ে মিঠু ভাই একটু ঘাবড়ে গেলেন—কি হ'ল ভাই, জীবা মোটে তাতছে না যে। এত বড় ভোজ দিয়েও জবাবখানা গরম আসছে না—।

বি, ডি, ও,-র মন্তব্যটা অন্য সময় হ'লে জীবা ভাইকে দস্তুর মত ক্ষেপিয়ে তুলতো। হয়ত সে বলতো—আপনারা ত ঠিকাদারের হাতের পুতুল। ওই

শয়তানগুলো মজা লুঠবে আর তালুকার মতো গরীব খেটে খেটে হাড্ডিসার হবে, খেতেও পাবে না। এই যে এতবড় দুষ্কাল গেল তখন সরকার থেকে যা 'রিলিফ' দেওয়া হয়েছে তাতে সিডি বাদশা বা মালধারীদের কতটা উপকার হয়েছে বলুন। আপনার সরকার কোনো কালেই জঙ্গলে কাঠ কাটার ইজারা ঠিকাদারদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মালধারীদের হেফাজতে দেবেন না। আমাদের সমিতি যদি কষ্ট ক'রে নেকড়ে, সাপখোপের পাল্লার ঝুঁকি নিয়ে ওদের ন্যাসে ন্যাসে গিয়ে বুঝিয়ে সমবায় বানাতে পারে, ওদের খাটুনীর ন্যায্য দাম আদায়ের জন্যে সমবায় সাহায্য করে তবে তাতে সরকারের গায়ে জ্বালা ধরবে কেন? তার মানে আপনারা ঘুষ খেয়ে থাকেন। না ত কী! এই ধরণের তর্ক বিতর্ক দিয়ে সময়ের একঘেয়েমী কাটানো মিঠু ভাই এর নেশা।

অস্তু ভাই হাসতে হাসতে মিঠু ভাই এর কথার জবাব দিলেন—ওর ভবিষ্যৎ ঠিক নেই। বোঁখার এসে গেছে, শনিবার রাতে যা কান্ড হয়েছে জাহের সভায় যাবার পথে—আমরা যে জ্যান্ত ফিরেছি সেটা নেহাৎ অহিংসার মাহাত্ম্যেই বলতে হবে।

আমার দিকে তাকিয়েই তিনি যেন ইঙ্গিতটা মাঝ পথে ছেড়ে দিলেন। হিংসা আর অহিংসার প্রচ্ছন্ন বিরোধকে এই ভাবেই কটাক্ষ করেন তিনি। আগে হলে প্রতিবাদ ক'রে বসতাম। আজকাল গায়ে মাখি না। তাই আসরের চাঙ্গা ভাবটা বজায় রাখা যেন এখন আমার পালা। কথা রথকে সোজা চালিয়ে দিয়ে বললাম—দোষ আমারই। উনার কাজ সেরে বেরুতে সেদিন একটু দেরী হয়ে গেল। তা শাসনগির এমন কিছু দূরও নয়। জীবা ভাইকে বললাম চলো ঘুরেই আসা যাক। প্রথমে গাঁই গুঁই করে শেষে রাজী হল। ফরেণ্ট রোড দিয়েই আমরা গল্প করতে করতে চলেছি। হঠাৎ জীপখানা থেমে যেতেই অস্তু ভাই এর ঘুম গেল চমকে। উনি বললেন, কি, আমরা পৌঁছে গেলাম? সামনে তাকিয়ে আমার আক্কেল ঠান্ডা হয়ে গেল। হেডলাইটের আলোয় দেখি এক পেয়ার সিংহ-সিংহী পথের পাশে চাঁদের আলোয় বসে আছে। তবু জিগ্যেস করলাম—কি হল জীবা ভাই? জীবা ভাই-এর মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না। হেডলাইটের আলোটা দেখলাম কাঁপছে। খুব ঘাবড়ে গেছে ড্রাইভার সাহেব।

অস্তুভাই বললেন—আরে ভাই একেবারে পথের পাশেই ফাঁকা জায়গা জুড়ে বসে আছে। আলোর দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। জীবাভাইকে

বললাম ষ্টিয়ারিং আমাকে দাও। তুমি ভেতরে এসে আরাম করো। তাও—দেবে না। বলে; গাড়ি ঘুরিয়ে নিই। ফিরে যাওয়া যাক। আমি বলি ফিরতে গেলে যদি টের পেয়ে যায় আমরা ভয় পেয়ে পালাচ্ছি আর পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে? মুখার্জি ত পেয়ে বসল, বলল, দশবারোটা ন্যাসের সর্দার আগেবান শাসনগিরে আসবে। তাদের চেলাচামুণ্ডারাও বসে থাকবে, অম্বর চরকার তুলোর বস্তাও আছে—এগুলো না পৌঁছলে ন্যাসের লোক হাত গুটিয়ে কাজের অভাবে বেকার বসে থাকবে। রামণিকভাইও চটে যাবে!……আমিও ভেবে দেখলাম মুখার্জি আজীব কথাই বলেছে। তার চেয়ে বড় কথা, যদি তখন উনাতে ফিরে যাই তাহলে—আমরা পেঁছলাম না কেন সেই খোঁজে রামণিক হয়ত রাতদুপুরে সাইকেল নিয়ে এই জঙ্গলের রাস্তা ধরেই উনায় ধাওয়া করবে। সে ত আর জানছে না সিংহ আছে পথে। অবিশ্যি রামণিকের কাছে সিংহ কিছু নয়, এই ত সেবার পাঁচ ছটা সিংহকে গরুর মতো আমল না দিয়ে গিরগরঢ়া থেকে জাম্বালায় চলে গেল। ওদের যদি মর্জি হয় ত বিপদ আসতে পারে। এইসব সাতপাঁচ ভাবছি। মুখার্জি দেখি ওর মধ্যেই জীবা ভাইকে সরিয়ে ষ্টিয়ারিং দখল ক'রে সার্চলাইটের মতো হেডলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী দেখছে।…

মিঠুভাই সিগারেটে টোকা দিয়ে তাগাদা দিলেন—সরপঞ্চজী আপনাকে নিয়ে মুস্কিল, আসল কথাটা চট্‌পট চুকিয়ে নিতে নারাজ। গোটা জীবনটাই যেন কিস্তি দিয়ে—কি হ'ল? সিংহ ত গিলে খায়নি—তবে?

—থামুন। ওরকম শার্দুলের মুখোমুখি পড়লে বুঝতেন কী হাল হয়।

অন্তুভাইকে রেহাই দিয়ে আমি শুরু করলাম—ঝাড়া দেড়ঘণ্টা আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ওরা নড়ছে না একচুলও। ভয় আর কিছু নয়, দুটো ত চোখের ওপর দেখা যাচ্ছে। ওরা হাবভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের সঙ্গে ওদের কোনো শত্রুতা নেই। কিন্তু জঙ্গলের ভেতরে আমাদের চোখের আড়ালে দু-চারটে শয়তান থাকাও বিচিত্র নয়। অজানা শত্রুকে এড়িয়ে চলাই দরকার। ভেবে দেখলাম সারারাত এইভাবে ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে ধুক্‌পুক্ করার চেয়ে ড্যাশিং সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়া ঢের ভালো! দিলাম ফুলস্পীডে জীপ চালিয়ে। আর কি জানি হয়ত আচমকা জোড়া সিংহীর গায়ের সেই হাওয়া লেগেই জীবা ভাই আমাদের জ্বরে পড়েছে। তবে ও কিছু নয়—

মিঠুভাই মানুষটা ভালো। সরকারের চাকরি করলেও মনটা গোলামীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নোংরামীর নরকে তলিয়ে যায় নি। মালধারী আর সিদিবাদশা গিরজঙ্গলের ওই দুটি অবুঝ বনবাসী সম্প্রদায়।

এদের চরিত্রে আদিম প্রকৃতির সরলতা বিচিত্র মনে হয়। খেয়ালখুশির মধ্যে এরা এক জায়গায় বেশি দিন বাস করে না। বুনো ডালপালা লতাপাতা দিয়ে ঝোপড়া বানিয়ে গো-মহিষের সম্পদ নিয়ে কয়েক ঘর মানুষ বাস করে,—ঋতুবদলের সঙ্গে সেই আস্তানা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এদের বসতিকেই ন্যাস বলে। এদের সম্পর্কে দরদ মিঠু ভাইয়ের মেকী নয়। তাই সৌরাষ্ট্র রচনাত্মক সমিতির এই সমবায় প্রচেষ্টাকে অন্যান্য সরকারী আমলার মতো রোধ করতে জোট বাঁধেন নি। এই পরীক্ষামূলক কাজে তাঁর কৌতূহল খুব বেশি।

মিঠুভাই কেন, এখানকার বেশিরভাগ মানুষেরই চরিত্রের ধরনে মৌলিক পার্থক্য আমার জীবনের স্বাদবোধই যেন পাল্টে দিয়েছে। জাহের সভা বলতে গুজরাটে বড় রকমের অধিবেশন বোঝায়। আমেদাবাদ, রাজকোট এবং বর্তমানে জুনাগড়ের উনাতে আমার এই প্রবাস বছর ঘোরেনি, কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে সম্পর্ক নেই ব'লে এখানকার ভাষা ধরনধারণে বেশ দুরন্ত হয়ে উঠেছি। এই নতুন পরিবেশ আর কাজের মধ্যে কিছু বা ভালোলাগারও স্বাদ পাই। এখানকার কর্তাব্যক্তিরা আমার মধ্যে কী দেখেছেন তা জানি না, তবে এঁদের আত্মীয়তার আন্তরিক ছোঁয়া এক এক সময়ে অবাক ক'রে দেয়। চোখে পড়ে আমার বাঙালী আত্মীয়স্বজনদের ভয়ত্রস্ত ভাবে সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে কী প্রচণ্ড পার্থক্য। জেলখানা থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবো এ নিয়ে বাবা-মায়ের কী দুশ্চিন্তাই হয়েছিল। যেখানেই আত্মীয় কুটুম্বের বাস সেখানেই যোগাযোগ ক'রে ধাক্কা খেয়েছেন আমার বাবা। আর সম্পূর্ণ নূতন এক বন্ধু পেলেন তিনি। ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবার প্রথম পরিচয় আমাদের পারিবারিক সংকটের কালেই। তিনি কলকাতা থেকে গুজরাটে ফেরার সময়ে নিজেই বলেছিলেন, আমি ছাড়া পেলে যেন আমেদাবাদে তাঁর কাছে আমায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশেরও শর্ত, দুবছর পশ্চিমবাংলার বাইরে থাকতে রাজী হ'লে তবেই আমার মতো 'ডেঞ্জারাস রিভলিউশনারী'কে খাঁচার বাইরে ছাড়া হবে। অথচ আমাদের বাংলা-বিহার-বর্ডার গ্রুপের ছেলেরা যে খুনোখুনির জন্য জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং সেটা কী সাংঘাতিক ক্ষতিকর হয়েছে তা বুঝতে পেরেই ওই পথ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, পুলিশের কাছে সে খবর

পেঁছেছে। আর সেই জন্যই হয়ত আমরা পেয়েছি একটু করুণা। হ্যাঁ, করুণা বই কি। তবে তার মধ্যেও অবিশ্বাসের ভেজাল মেশানো ছিল তাই আত্মীয় সমাজের আশ্রয়চ্যুত আমি বা আমার মতো আরও কত ছেলেই নির্বাসিত।

একটা জিনিস এই প্রবাসে না এলে অজানা থাকত, সেটা হল সাধারণ মানুষ আস্থা আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে কৃপণ নয়। সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষের প্রকৃতি এক ধরনের ধাতু দিয়ে তৈরী। বাঙালী পুলিশপক্ষের অবিশ্বাসের দৌলতে কষ্টার্জিত এই অভিজ্ঞতা লাভ কম নয়। সৌরাষ্ট্র আমাকে সাদর আশ্রয় দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে মৌল অধিকার পেয়েছি 'গড়ে তোলার' বৃহৎ কর্মযজ্ঞে নিজের শক্তি বুদ্ধিকে কাজে লাগাবার। এ রাজ্যে এসে দেখলাম গড়ে তোলার কাজ নিয়ে কর্তৃপক্ষ সরাসরি মাথা না ঘামালেও, এই ধরণের কাজে বাধা দেয় না, চাইলে সাহায্যও করে। পশ্চিমবাংলার গদীসমাসীন আমলারা সেটুকুও করতে নারাজ। ঘুষ বা চুরি জোচ্চুরি আছে বই কি এখানেও, তবে সেটাই সব নয়। সাধারণের স্বার্থকে উড়িয়ে দিয়ে নিছক ব্যক্তিগত লোভ ষোলআনা হাসিল করার মতো অমানুষিক ও উলঙ্গ নির্লজ্জতা বিশেষ নজরে আসে নি।

আড্ডার আসর থেকে মনটা সরে গিয়েছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। পাশের ঘরে বাংলায় খবর বলা হচ্ছে, সেইদিকে কান চলে গিয়েছিল। অস্তু ভাইয়ের ছেলে জীতু আমার পরম ভক্ত, এটা নিশ্চয় তার কাজ। ওরা কেউ বাংলা বোঝে না। নেহাৎ আমাকে শোনাবার জন্যে সে মাঝে মাঝে কলকাতা ষ্টেশনের প্রোগ্রাম ধরে। আজকের বিশেষ বিশেষ খবরের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আজগুবী বাক্-সর্বস্বতার আস্ফালন আর তার সঙ্গে দুটো মাছির আক্রমণে মেজাজটা বেবাক খিঁচড়ে গেল—'আজব জায়গা, রাতের বেলাতেও মাছির কামড়। জ্বালিয়ে মারলে—।' আমার নির্বাসনের বেদনা নির্যাসিত হয়ে কথাক'টির মধ্যে বোধহয় বিরক্তি ছিটকে পড়েছিল বেশি মাত্রায়।

মাছির ওপরেই বোধকরি মুখ্যমন্ত্রীর অসারতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষ ষোলআনা ঢেলে দিয়েছিলাম নিজের অলক্ষ্যে এবং এতক্ষণ নীরব আগন্তুক মোটাগ্যাটা হরিভাই সেটা গুজরাটের প্রতি কটাক্ষ ভেবে বসলেন। তাই তিনি অকস্মাৎ জোর প্রতিবাদ করলেন—আপনাদের ওয়েষ্টবেঙ্গলেও মশামাছি কিছু কম নেই মশাই!

ভদ্রলোকের বলার ধরনে চ্যালেঞ্জের সুর, তাই প্রশ্ন করতে হ'ল—ওয়েস্ট-বেঙ্গল? আপনি সেখানে গিয়েছেন কখনো, না, শোনা কথা বলছেন?

তিনি একটু হেসে বললেন—খাশ কলকাতায় আমার বিজনেস। কী বললেন মশাই—যাই নি মানে! বলতে পারেন সেখানকারই মানুষ।

কলকাতার মানুষ! এত কাছাকাছি এতক্ষণ একঘরে আছি অথচ সেখানকার কোনও বিষয় নিয়ে দুটো কথাও কই নি।

—কলকাতার মানুষ আপনি?

হাতে চাঁদ পাওয়ার কাছাকাছি এক খুশি উপছে ওঠে। নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেরই অবাক লাগে।

—না ত কী! কম সে কম বিশ বছর কাটল—

অম্তুভাই উভয়ের নাম পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—ঠিক, খেয়ালই ছিল না আপনাদের আলাপ নেই। পরিচয়ে যখন নিজেরাই এগিয়ে গেছেন ভালোই হয়েছে।

হরিভাই হাসলেন—হ্যাঁ, যেটা সহজ যেটা স্বাভাবিক সেটাই ভাল।

ভদ্রলোকের এ কথার ধরনে যেন কলকাতার সুবাস আবিষ্কার করি। সেই কল্পনা করেই বলি—বলুন, বলুন, সেখানকার হালের খবর-টবর শোনান।

হরিভাই-এর ভাবভঙ্গি কেমন ঢিলেঢালা, বললেন—হালের খবর ত বলতে পারব না। অনেকদিন হয়ে গেল এখানে।

—অনেকদিন উনাতে আছেন? বলেন কি?

—না ঠিক উনাতে নয়, রাজকোট, সুরাট এই দিকেই বেশি থাকি।

ভদ্রলোকের কথাগুলো হেঁয়ালির মত শোনায়। বলি—তাহলে কলকাতায় বিশ বছরের কথাটা—?

—হ্যাঁ, বিশ বছর যে কলকাতায় ছিলাম তা যেমন মিথ্যে নয় তেমনি সেখানে আর কখনো ফিরব না এমন কল্পনাও সত্যি।

চমকে উঠলাম। মনে হল ওই গোলগাল নরম-সরম মানুষটার ভেতরের সুদৃঢ় কোনো সংকল্প লাফ দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন এল ঠোঁটে—কেন? কেন।

—আর কেন, প্রাণের চেয়ে ত কারবার বড় নয় ভাই। বলতে গেলে স্রেফ প্রাণটুকু নিয়েই পালাতে বাধ্য হয়েছি। গুজরাটে ফিরে গোড়া থেকে সবকিছু শুরু করেছি। হিমসিম খাচ্ছি।

অন্তুভাই, মিঠু ভাই, আমি—কেউ কোনো কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি না। হরিভাই-এর কণ্ঠে নির্যাতিত একটি মানুষের অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার ইতিহাস মাত্র কয়েকটি কথায় আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছে।

শুনেছি।…আমার ভাইকে মেরে ফেলল।

প্রায় নিশ্চিত একটা আশংকা আমার টুঁটি টিপে ধরল। তবু ক্ষীণ প্রচেষ্টা, আত্মরক্ষার শেষ আশাই বলা চলে তাকে। প্রশ্ন করি—কারা মারল আপনার ভাইকে?

—ওই শালা নকশালরা।

মনে হ'ল থানা হাজতে আমায় জেরা করা হচ্ছে। অস্বীকারের ভঙ্গীতে বলেছিলাম—নকশাল? আপনি ঠিক জানেন?

ভদ্রলোক ততোধিক গম্ভীরভাবেই বললেন—আপনি হাসালেন! আমি কি না জেনেই বলছি!

উল্টো জেরার চাল দিতে হল—কোথায়?

—সালকেতে' যাক, সে আর শুনে কি হবে। ভাইকে ওরা মারল, তারপর কোনদিন আমার পালা এসে যাবে। সবাই পরামর্শ দিল, তুমি পালাও। ওরা ভালোই বলেছিল।

হরিভাই থামলেন। মাছি দুটো আমার কানের পাতার ওপর আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এবং মাঝে মাঝে খাদ্য সংগ্রহের জন্য মিহি শুঁড় দিয়ে খোঁচাচ্ছে, তবু ওদের বাধা দিতে পারছি না। বিরক্তি, অস্বস্তি, সুড়সুড়ির বোধ সব ভোঁতা করবার জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে আছি। এই মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল কয়েকটি ঘনিষ্ঠ মুখ—যে সব তরুণ মুখের ওপর আঁকা আগ্রহী একাগ্র চোখ একদা আমার দিনরাতের সঙ্গী ছিল। যারা আমারই মতো জনগণের যুগ-যুগান্তরের নির্যাতন মোচনের জন্য সংকল্পে উন্মাদের ক্ষুধা নিয়ে জীবন-যাপন করেছে—জীবন-যাপন বা জীবন-পণ, এ দুইএ তারা পার্থক্য দেখতে ভুলে গিয়েছিল। তাদের কাছে নিজের প্রাণ খুব গুরুত্ব পেত না।

সেই দলে ত আমিও ছিলাম। আমিও—আমিও? এই আমি।

পুরনো জীবনটা আশ্চর্য বিদেশী হয়ে ধরা পড়ে আমার কাছে। কি জানি কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন আমার অজ্ঞাতেই ফুটে উঠেছিল কি না। যার ফলে আড্ডার আসর থেকে তৎক্ষণাৎ হরিভাই বিদায় নিলেন।

বললাম—আসবেন মাঝে মাঝে।

নমস্কারের প্রত্যুত্তরে একটু হাসলেনও না। বোধহয় ভুলে গেলেন। কিম্বা ভাই-এর মুখখানা দেখছিলেন মনের ভেতরে তাই লক্ষ্য করেন নি আমার লৌকিক আদবটা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

শেষে অন্তুভাই যেন আমায় আশ্বাস দিতে চাইলেন—ভাগ্যে তোমার আসল পরিচয়টা অগে দিই নি।

না দিলে কি হয়, ভদ্রলোক টের পেয়েছিলেন ঠিকই। নইলে এরপর পথেঘাটে আমায় দেখলেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন কেন।

সে ত পরের কথা। তার আগে, আড্ডা-ভাঙ্গার পর সেই রাতখানা একা-একা অদ্ভুত একটা অনুভূতি আমায় এমন অসাড় করে রেখেছিল যা আমার পাগ্‌লী-ঘণ্টীর পরদিন সকালের সেই প্রচণ্ড মারের চোটে অজ্ঞান করে অন্ধকার সেলের মধ্যে ফেলে রাখার পর, যখন প্রথম সংজ্ঞা ফিরেছিল তখনকার চেয়েও অসহায় কাতর ক'রে রেখেছিল। অথচ আসলে হরিভাই-এর ভাইএর খুনের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ত কিছুমাত্র ছিল না। মাঝরাতে মনে হল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাছি চতুর্দিক থেকে আমায় ছেঁকে ধরেছে। ওরা মিহি ছুঁচের মতো অজস্র শুঁড়ের খোঁচায় আমার এই বাঁচার সাধকে ঝাঁঝরা করে প্রতিশোধ নিতে ধাওয়া করেছে।

জানি না কি হয়েছিল আসলে। একটা প্রচণ্ড চিৎকার কানে আসতে চম্‌কে বিছানায় উঠে বসলাম। আস্তে আস্তে গভীর রাতের ঝিম্‌ঝিম নিশুতি বোধশক্তি ফিরিয়ে দিল। বুঝলাম নিজের চিৎকারেই জেগে উঠেছি। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুধু জাহের সভার বনপথে হেডলাইটের তীব্র আলোয় দেখা সিংহ দুটির চেহারা দেখতে থাকি। ভাবি ওরা যেন আমার খুব কাছের কেউ। আমরাও সিংহ হতে গিয়ে কি করে যেন পিস্তলের মাথার মাছি হয়ে গিয়েছি। মনে হচ্ছে আমাদের নড়বার ক্ষমতা নেই, শুধু চালকের হাতের একটি অভ্রান্ত ব্যবহার্য বিন্দু মাত্র হয়েছি। কানা মাছি নই—অন্ধ।

॥ তিন ॥

তুমি তো বুঝবে না কেন আমার ঘুম আসছে না। সত্যি আসে না ঘুম। আমার মতো এরকম অবস্থায় যদি পড়তে হত তাহলে বিশ্বাস করতে যে আর কারুর কথা ভেবে মন উড়ু-উড়ু না হলেও ইনসমনিয়ার অসহ্য আক্রমণে মানুষ ছটফট করতে পারে। কোনো উপায় নেই। জানি তোমায় খুশী করা যেত, যদি বলতে পারতাম 'সুজয়া. তোমার সঙ্গ পাবার পিপাসায় বড় কাতর আমি, তাই চোখে ঘুম নেই।' যদি বলতে পারতাম 'বিরহজ্বালা অস্তিত্বের কোষে-কোষে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে…' হায়, সুজয়া বড় কষ্ট পাই যখন টের পাই প্রেমের মতো সুখময় ভুল করবার মতো, স্বপ্ন দেখার নেশা আর নেই। তাই তোমার মন রাখার-সান্ত্বনাকে এড়িয়েই এই অতন্দ্র শয়ন মনকে দুনিয়ার এলোমেলো ভাবনার ডাস্টবিন ঘাঁটিয়ে তামাশা পাচ্ছি। আমি সেই কুকুরটাকে দেখতে পাচ্ছি—যার লেজে ফুলঝুরির কাঠিটা জ্বালিয়ে দিয়ে একপাল 'নণ্টে ফ্যালা-কেষ্টা' উল্লাসে হাততালি দিচ্ছে আর দল বেঁধে ভীত সন্ত্রস্ত কেলো-কুত্তার পিছনে দৌড়চ্ছে। কুত্তাটাকে ওরা খুব ভালোবাসে, অনেক সময় আদর ক'রে উচ্ছিষ্ট খেতে দেবার জন্যে প্রাণপণে চিৎকার করে, 'আয়, আয়, কেলো--আঃ—আঃ—কালুয়া—আ—'। এ পাড়ার ছেলের দলও আমায় কম ভালোবাসে না। দাদা ডেকে খাতির করতেও কসুর নেই। কিন্তু রাত দুপুর হয়েছে বলে 'মাইক' বন্ধ করবে? অসম্ভব। এরকম আবদারের স্পর্ধা কেন আমার হল। রাত বারোটা, তাই কি—মাইক বন্ধ করলে ছেলেরা রাত জাগতে পারবে নাকি? রাতারাতি রাস্তার দুধারে পীচের বুক ছ্যাঁদা করে আটষট্টিটা গর্ত না খুঁড়তে পারলে বাঁশের 'পোল' (ওরা খুঁটি বলে না, তাতে নিঅনবাতির ইজ্জত ঢিলে হয়) বসবে কি করে দাদা। সার-সার বাতি কি অমনি জ্বলবে? আপনাদের আর কি, মজা করে পুজো দেখবেন…। অতএব যে তিমিরে ছিলাম দুর্গা পুজোয়, কালী পুজোতেও সেই শব্দব্রহ্মের তাণ্ডবে রাত্রির সঙ্গে আমিও দলিত-মথিত হচ্ছি। জানি সরস্বতী পুজোও এমনি বিভীষিকার মধ্যে কাটবে। শুরু হলে এক হপ্তার দায়ে নিশ্চিন্দি।

***মেষদল, ময়ূর-সিংহাসন ও আমার আখের**

আচ্ছা তুমিই বলো অনিমেষ, যে যন্ত্রটা শিশুদেরও রাতের ঘুম তাড়িয়ে দেয় সেটা কি করে আমায় ঘুম পাড়াবে ? আমি যে পথের ধারে একতলার ঘরে থাকি। সকাল বেলায় জানলা দিয়ে হাত বাড়ালে খবরের কাগজ যখন হকারের কাছ থেকে নিই তখন বেশ মজা লাগে—বাড়ির সকলের আগে ওটা হাতাই। কিংবা একটু জোরে হাঁক দিলেই পথের ওপার থেকে পেঁচো পানটা-সিগারেটটা এসে পেঁছে দেয়—দোকানে যাবার মেহনত বাঁচাই। আসলে আমি পথেরই বাসিন্দা —মাঝে যা একটা দেওয়ালের ব্যবধান। কাজেই, পথের ধারে যা ঘটছে তার অংশীদার না হয়ে করি কি ? বুঝলে অনিমেষ, তুমি যেদিন গা-ঢাকা দিয়ে গভীর রাতে অনায়াসে আমার পাশে আশ্রয় নিতে পেরেছিলে (কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের থাবা এড়াতে পারো নি তাই এখন জেলখানার ভেতরে আছো) তাও সম্ভব হয়েছিল আমি রাস্তার ধারে থাকি ব'লেই, চাপা গলায় ডেকে সাড়া পেয়েছিলে। আমার বিছানায় আজ যদি তুমি থাকতে, বেশ হত অনিমেষ, তোমার কাছে বিপ্লবের কাহিনী শোনা যেত।

কিন্তু এসব ভাবছি কেন ? ঘুম না এলে কি করব ! বলো সুজয়া, তুমি যেদিন সোজাসুজি জবাব দিলে—'মন দেওয়া-নেওয়ার ওসব ছেলেমানুষী অচল। পেটের ভাত জোটাতে পারলে তখন প্রেমের কথা ভাবা যাবে।' সে দিনই বা কি করতে পেরেছিল এই সত্যেন রায়' কেমন অসাড় হয়ে আমার (আবেগ-অনুরাগে উদ্বেল প্রাণের সেই) শক্ত মুঠিটার কারেণ্ট অফ হল আর তোমার নরম ঘামে-ভেজা হাতখানা খসে পড়ল। ওই দেখ, আবার দিয়েছে সেই সাত শ' বার বাজানো (রে মামমা··) রেকর্ডখানা। জানলার বাইরে অসহায় গরুর মত চোখে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকি। ওরা তিনজন কেমন উৎসাহ নিয়ে শাবল চালাচ্ছে। ···এইটা হলেই খতম।··· আচ্ছা, যোগেশের একটা শহীদবেদী করলে কেমন হয়···মা কালীর সামনে।···যোগেশকে এখন সবাই চেনে। এক মাস আগে কে-ই বা চিনতো ? দু-দলের লড়াইতে বেচারা মরেছে। শুনেছি কোন বাজারে সে গেঞ্জী বিক্রি করত। এখন তুমি পথে ঘাটে হাতে-লেখা পোস্টার দেখবে। কমরেড যোগেশ, তোমায় ভুলি নি, ভুলবো না।···কমরেড যোগেশকে হত্যার বদলা চাই···একটা মার্বেল পাথরের বেদীও যোগেশের স্মরণে তৈরী হয়েছে বড় রাস্তার মোড়ে।

শহীদবেদী তো এখন পাড়ায় পাড়ায় দেখা যাচ্ছে। প্রতিহিংসার এমন সদম্ভ প্রতিশ্রুতি বুঝি আর হয় না। রাম মরেছে অতএব রহিমকে খুন করতে

হবে—যেন রহিমই রামের মৃত্যুর কারণ অথবা রাম রহিমের। যে-কোনো রাম বা যে-কোনো রহিমই এই প্রতিহিংসার খোরাক যোগানোর শিকার হতে পারে। অনিমেষ, তুমি চটে যাচ্ছ। কেন, এতে রাগ করার কি থাকতে পারে (···ও ঘাটে জল আনিতে যাবো না)। আগে ছিল, এখন আর রাম-রহিমের মামলা ভারতে নেই। ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিরোধটা এখন রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতায় দাঁড়িয়েছে। যদি তা না হ'ত যোগেশ কি মরতো? (যদিও শুনেছি যোগেশ যাচ্ছিল তার গেঞ্জীর মোট নিয়ে—দু-পক্ষের লড়াই-এর মাঝে পড়ে গুলি খেয়েই শহীদ হল।)···এই-এই পুলিশের গাড়ি। খবরদার কেউ পালাবে না।···হ্যাঁ আমরা নিজেদের কাজ করছি।···এই মাইক বন্ধ কর।···না, না, চলুক, ওরা যেন ডাউট না করে।···কি হয়েছে? আমরা ঘাবড়াবো কেন!

সত্যিই কি পুলিশ আসছে? পুলিশ কি মাইক বন্ধ করার জন্যে···!

দুড়দাড় পালানোর পদাঘাত। ছোকরাদের কথাবার্তা থেমে গেছে। কেবল শাবলের আওয়াজ আসছে। মাইকের কণ্ঠরোধ হয়েছে। আমার মাথাটা কেমন শূন্য। শুয়ে না থাকলে আচমকা ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ে যেতাম মাটিতে। কয়েক ঘণ্টায় যেন মাইকের আওয়াজটা অস্তিত্বের আকাশে দখল কায়েম করে ছিল। জীপখানা ঠিক আমার গায়ের ওপর প্রচণ্ড গর্জন করে দাঁড়ালো।···এ্যায়, তোমরা এখানে কি করছ?···পিছনে বড় ভ্যানখানার চাকার আওয়াজও গড়াতে গড়াতে চুপ করল। তারপর অনেক-গুলি ভারী বুটের গর্বদৃপ্ত পদাঘাত ঘোষণা।

ভাবতে অবাক লাগে। রাতের বেলা পুলিশ! এ পাড়ায় এ বছরের ইতিহাস খুঁজলে মিলবে কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ, দিনে-দুপুরে দ্রুত গতিতে বড় রাস্তা দিয়ে পুলিশ ভ্যান যেতে দেখা গেছে। গলির মধ্যে ঢোকার মতো দুর্মতি ত ছিল না। তাতে কি বিপদ হত? কে জানে। পুলিশও যেন আত্মরক্ষার জন্যেই বিপদ থেকে তফাতে চলছে!

আজ আইনশৃংখলার গার্জেয়ানদের আওয়াজে পুরনো দাপটের আমেজ আছে···বড় রাস্তার কাছাকাছি একটা ছিনতাই হয়েছে। দু'জনকে এদিকেই ছুটে আসতে দেখা গেছে। এই দলের মধ্যেই তারা নিশ্চয় গা-ঢাকা দিয়ে মিশে রয়েছে। ভ্যানখানা সামনে এগোলো। যেখানে প্রতিমার মণ্ডপ বানিয়ে পথটা রোধ করা হয়েছে, সেখানে ডাইনে বাঁয়ে পায়ে-চলা দুটো বস্তির

গলি ঢুকে গেছে। ওসব গলির কোনো নাম নেই। আছে নম্বর—সতের নম্বর আর একত্রিশ নম্বর। এখন তো তবু নম্বর হয়েছে, আগে ছিল জলাজমি আর জংগল আর বাগান। বিরাট আমবাগান ছিল। যেখানে মহেশ সর্দারের আড্ডা ছিল।—ডাকাতের সর্দার মহেশ তার হেড কোয়ার্টার বানিয়েছিল, কেননা রেল-লাইনের কোলে জনবসতি থেকে দূরে নিরিবিলিও বটে—তা ছাড়া মোতিবিবির বাগিচাও এখান থেকে বেশী দূরে নয়।···এরা ওসব জানে না। আমিও কি জানতাম নাকি। বাড়ির বুড়ী ঝি গল্প করে, তাই—।

থানার বড়বাবুর তর্জন-গর্জন। সব ক'টাকে ভ্যানে তোলা হবে। হাজতে পুরে দেবো সেটা ভালো হবে?···এমনিতে তোমাদের কাছ থেকে কথা না কেরুলে!···আমরা স্যার কাজ করছি, কোথায় কি হয়েছে জানবো কি করে?··· দুজন তো তোমাদের সামনে দিয়েই পালিয়েছে। দেখ নি বলতে চাও?··· দেখতেই পাচ্ছেন। রাতারাতি ফিনিশ করতে হবে কাজ। কোথায় কি হয়েছে জানবো কি করে স্যার।···এখানে আর কে-কে ছিল?···

আধ ঘণ্টা চলল চাপের উপর চাপ। একজনকে ভ্যানে ওঠানোর হুকুম হল। তাকে গাড়িতে তুলতে না-তুলতে কে যেন বলল···আমরা কিছু করি নি স্যার, ঝুটমুট হামলা করছেন স্যার··· ।···তবে বল কে-কে পালিয়েছে।

একটা নাম মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল। সে-ই পালিয়েছে। ওই গলির ভেতর ঢুকেছে। ও গলির শিরা-উপশিরা পুকুরডোবার এপাশ-ওপাশ দিয়ে এক দিকে রেললাইনে ঠেকেছে আর এক শাখা-প্রশাখা পৌঁছেছে উত্তরে দক্ষিণে বড় রাস্তাগুলোতে।···এখানে যেটুকু রোড লাইট আছে ওসব রন্ধ্রে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। সারি সারি বস্তির খাপরার ঘর—প্রতিটি ঘরের পেটের মধ্যে কচিকাঁচা নিয়ে দশ-বারোজনের পরিবার বেঁচে থাকে।

যার উপর বড়বাবুর রোখ পড়েছে, সে বয়সে একটু বড়—সে-ই এ দলের সকলকে সাহস যোগাচ্ছিল এবং কথাবার্তা চালাচ্ছিল। এ-ই তার অপরাধ। জানি সে বেচারী একটু মোড়লি ভালবাসে। চুরি-জোচ্চুরি কখনো করেছে বলে শুনিনি। তবু তাকেই ভ্যানে তোলা হল। আর যে পালিয়েছে তাকে খোঁজার জন্যে জনকয়েক রিভলবারধারী বুটের শব্দ করে গলিতে ঢুকল। কিন্তু ওরা বেশিদূরে এগোয় নি—কেন না মিনিট কয়েক বাদেই ফিরে এল এবং পলাতকের বাড়ি কোনটা তাই কবুল করাবার জন্যে ছেলে-ছোকরাদের জেরায়

জেরবারে হুমকি-ধমকি জুড়ে দিল।

তর্জন-গর্জন করে পুলিশের বাহিনী ফিরে গেল।

রাতটা হঠাৎ যেন মৃতদেহ। কোনো সাড়াশব্দ নেই। নিষ্প্রাণ পৃথিবী।

জানো সুজয়া, তোমাকেই বলি : এই যে মাইকের প্রচণ্ড আওয়াজ আর এত যে আলোর রোশনাই—এ সবই যেন ওদের (ওই অলিগলির ছেলে-ছোকরাদের) জীবনের আসল দীনতাজর্জর অস্তিত্বকে ভুলিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস। ওরা বাঁচতে চায়। আনন্দ আর আলোর মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চায় বছরের একঘেয়ে অভাব-অনটনের দুঃসহ অবসন্নতাকে। এখন যখন মাইক বাজছে না, হল্লা হচ্ছে না, তখনই এই উপদ্রবকারী একপাল ছোকরার জন্যে মনের মধ্যে মোচড় দিযে উঠল। কি বিচিত্র বেয়াড়া মন বল তো! তোমার দাদা অনিমেষ যে কোন্ আদর্শের নেশায় পাগল হয়ে হিংসার পথে নিজেকে নিয়ে গেছে তা বুঝি। এই এদেরই জন্যে তার মহানুভব প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। সে কান্না আজ আমার শুকনো বিছানাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। আগেও বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় টনটন করেছে কত বার। কিন্তু প্রাণের মায়া, নিজের ওপর মমতা কি করে ঘোচাবো? পারি নি। জানি কোনো দিনই তা পারব না। আর নিজের মৃত্যু যে না চায় সে কি করে অন্যের প্রাণ নেবার কথা ভাববে? কোন্ অধিকারে? অনিমেষ হেসে উঠেছিল আমার এ কথায়। তোমার দাদা, আমার ছোটবেলার খেলার সাথী, কলেজের সহপাঠী অনিমেষ। হাজার তদবির করেও প্রতাপশালী অম্বুজ চাটুয্যে তাঁর মেয়েকে অনার্সের পরীক্ষায় ফার্স্ট করাতে পারেন নি যে অনিমেষের জন্যে সেই অনিমেষ! সে আজ আই-এ-এস হয়ে তোমাদের অনটনক্লিষ্ট পরিবারকে রক্ষা করতে পারতো। তোমায় তো তা হলে স্কুলের মাস্টারিও করতে হত না। কিন্তু সে অনায়াসে আমার মুখের ওপর জবাব দিয়ে বসল—'দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি মুহূর্তের তিল-তিল যে মৃত্যু ঘটছে তার যোগফল কষে দেখেছিস সতু? একটা প্রাণই তোর কাছে বড় হল? বিপ্লব ছাড়া এই জং-ধরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব। বিপ্লব আপনি আসে না রে। আমাদের শক্তি দিয়ে সেই বিপ্লবকে আনতে হবে। ভগীরথ গঙ্গাকে এনেছিলেন যে অটল সংকল্প দিয়ে সেই শক্তি আমাদের। এত বড় দেশের জনগণকে এইভাবে তিলে তিলে মরতে দেখার চেয়ে বড় পাপ কল্পনা করা যায় না রে।'

তুমি কেন, আমিও নিজেকে বীরপুরুষ ভাবতে পারি না। নইলে সব

ব্যাপারেই দর্শক হয়ে তফাতে থাকবো কেন। অথচ কে-ই বা তা চেয়েছিল? ইনকিলাব জিন্দাবাদ জিগির দিয়ে নগরের পথে পথে কালোবাজারী মুনাফাখোর আর অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জেহাদের মিছিলে আমিও ছিলাম তো! কিন্তু যেদিন আমার হাতে পেটো ধরিয়ে দেওয়া হল—নেবার সময়ই হাত কেঁপে গেল। ধমক খেলাম। অনিমেষ পাশে ছিল, বলল—'সতু, হাত ফস্কে পড়ে গেলে নিজে মরবি।' খুব সহজ, শান্ত তার কন্ঠস্বর। এত স্বাভাবিক যেন খবরের কাগজের হেডলাইন—স্পষ্ট অথচ নির্বিকার। ওর দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছিলাম, মনের কথাটা কি করে জানাই। অনিমেষ সেই সংকট থেকে উদ্ধার করল—'বুঝেছি, তুই ভয় পাচ্ছিস। ঠিক আছে—।' বোবা মৃত্যুর দূত, গোলাকার সেই বস্তুটা অনিমেষ আমার হাত থেকে নিয়ে একটু অপ্রসন্ন সুরে মন্তব্য করল—'এ্যাকশন ছাড়া বিপ্লব হয় না সতু। পোস্টার, স্লোগান, মবিলাইজেশন দিয়ে গ্রাউন্ড তৈরি করা যায় না। কিন্তু অ্যাকশন আর চষা জমিতে ফসল বোনা এক ব্যাপার।' কি যেন বলতে চেয়েছিলাম। ওদের ব্যস্ততার মধ্যে সেটুকু শোনার ফুরসত ছিল না। অব্যাহতি পেলাম। ওরা আমায় ফেলে রেখে বেরিয়ে গেল অ্যাকশনে। কি করব? অক্ষমতায় মরমে মরে গেছি, পায়ের তলার মাটি সরে গিয়ে, অতল কোন গহ্বরের দিকে আমায় ছুঁড়লো। সেটা ছিল খালধারের বিরাট পুরনো ইমারতের পিছনের একটা প'ড়ো ঘর। সেখান থেকে যখন বেরুলাম তখন চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সামনে যে বাসখানা পেলাম তাতেই চড়ে বসলাম।…নাঃ, একটু যে নিশ্চিন্ত হয়ে তলিয়ে ভাববো তারও উপায় নেই। বাবার হাঁপানির টান উঠেছে। সাঁই-সাঁই ঘড়-ঘড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর মনে হচ্ছে, সকালেই কোথাও পাঠাবেন। হাতে একখানা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে অনুযোগ করবেন—নিজের মুরোদে তো কিছু হল না। বিপদভঞ্জন বলেছিল, ওর কাছেই নিয়ে নিত। টাইপরাইটিংটা শিখলে আজ এইভাবে বাপের পুষ্যি হয়ে থাকতে হত না, যাও…' প্রমোদরঞ্জন কিংবা ওইরকম কারুর কাছে।

যেতেই হবে। এর আগেও কম করে উনপঞ্চাশ জনের কাছে চাকরির উমেদারিতে যেতে হয়েছে। কেউ বলেন, ইস্ বড্ড দেরি হয়ে গেছে যে বাবা। ভূপেনের ছেলে তুমি, নিশ্চয় করতাম তোমার জন্যে। তিন জনকে নেওয়া হল—তুমি তার একজন হতে পারতে আর সাত দিন' আগে এলে।…কিংবা শুনেছি, পরে এসো…অথবা, আরে, এই বাজারে চাকরি চাইলেই কি জোটে,

আমাদের হাতে কিছু নেই, সব ওই ইউনিয়নের খপ্পরে। ...আরও আছে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দোহাই, ঘুষের বিরুদ্ধে গালিগালাজ উদ্গার।...বাবার হাঁপানির টান যেন আমাকে খুঁচিয়ে দগ্ধে মারারই একটা কৌশল। মায়ের মুখের দিকে কতদিন যে সোজাসুজি তাকাতে পারি নি তা তোমায় বলতে পারব না, সুজয়া। মনে হচ্ছে, ওদের মাইকটা যদি এখন জোরে চালিয়ে দিত তা হলে অন্তত বাবার ওই কাতরানিটা টের পেতাম না।

বাইরে ছেলেদের মধ্যে আবার জটলা, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মত। সেই ছোকরা, যাকে পুলিশে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে, ফিরে এসে তড়পাচ্ছে।... ব্যাটা হাবলুটা পয়লা নম্বরের হাঁদা। আস্মা, তোর কি দরকার ছিল নামটা বলবার। খামোকা-খামোকা...। আর মরদ হবি তো জান গেলেও একটা কথা পেট থেকে বার করবি না। দেখলি তো আমায় ভ্যানে তুললো। তাতে আমি কি ভয়ে মরে গেলাম! লে বাবা, লিযে চল। হাজতে পুরে পেটাবি? তাই বি আচ্ছা! জানি তো খোচরের দৌড়। শালা তুমি ডরেছো কি মরেছ! আর তুমি ডাঁটসে থাকতে পারলে ওরাই বাপ বাপ করে ছেড়ে দেবে।...তোকে কি করলে?...কি আবার করবে। মোড় অবদি নিয়ে যেতে, আমিও মেজাজসে বললুম, 'দেখুন স্যার! আমায় ঝুটমুট নিয়ে যাচ্ছেন কেন। জরুরী কাজ, কারখানায কামাই হলে গরমেণ্টের লোকসান হবে। বস্তিতে থাকি বটে, কিন্তু কাজ করি খান জায়গায়। আমায় আটকালে ডিল্লি অবদি খপর হবে। শেষে আপনাদের কাছেই মেলেটারি থেকে কৈফেত চাইবে।...বললি? হুঁ। ভয়টা কিসের বে?...কি বললি? কোথায় কাজ করিস বললি?... আরে, গান-অ্যান্ড-শেলের নাম করে দিলুম। তারপর বড়বাবু শালা বিয়ে করা বউ-এর মতো গলা নরম করে বললে, তা সেটা আগে বলতে হয়?' আমিও ছোড়নেবালা লই, বললুম—'সে টাইম দিলেন কই? যাকে তাকে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করেন সেইজন্যে তো পাবলিকও বেজ্জার!' ব্যাস, শালা ঠান্ডা। ভ্যান থেকে নামিযে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।...তুই যে গান-শেলের নাম করলি, যদি ওরা খোঁজ করে?.. আবে লেঃ, ওদের কত হিম্মত। শালা, দেখিস না লোহার জাল, রিভলবার, ঢাল এসব নিয়ে গাড়িতে বোরখা বিবির মতো ঘোরে।...না ঘুরে করে কি বল শালা, নকশালরা বোমা-পাইপগানের গুঁতোয উত্তম-খুস্তম করছে না? জানের ভয় কার নেই বল। চোখের ওপরই দেখলি তো?...সেটা কিন্তু নকশালদের কাজ নয়।...আরে ওই

হল, নকশাল, নয় সি পি এম, নয় ফরওয়ার্ড ব্লক, নয় ওইরকম পার্টি।…হ্যাঁ, যেখানে যে পার্টির এলেকা সেখানে হামলা-ঝামেলা বাধলে পুলিশভ্যান যদি থামাতে গেল তো সব ঝাল তখন ওই খোচরের ওপরই গিয়ে পড়ে। এ ভারী মজার ব্যাপার !…যা বলিচিস। লাগা, লাগা, মাইক লাগা। বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগছে।…ক'টা বাজলো ?…তিনটে।…ইস, এবার কিন্তু ওদের ওই উনতিশ লম্বরের দুগ্যা পুজোকে আমাদের আলোর জেল্লা টেক্কা মেরে দেবে।

আলোর আলোচনার মধ্যেই মাইকে সানাই বাজতে শুরু করল। কোনো এক স্বপ্নরাজ্যের আভাস—। চিৎকার উঠল…থামা, থামা।…বন্ধ কর শালা ওই কান্নার প্যানপ্যানানি। লাগা তো অষ্টারাম্বা-হাম্বা।

আবার গাঁকগাঁক করে ঝাঁঝিয়ে উঠল—'আরে হো-ও-ও-ও গুড়িয়া কাঁহা তেরা দেশ।' আশ্চর্য, সঙ্গীতের কোনো সুকুমার কোমল আবেদন ওরা একদম বরদাস্ত করতে পারে না। সানাই বন্ধ হল বাইরে, কিন্তু আমার মনে পড়ল সেদিনের সেই সানাই-এর সুর যা তোমাদের বাড়ির বারান্দায় বসে শুনেছিলাম। সেই যেদিন অনিমেষকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে প্রথমেই তোমার পাশে ছুটে না গিয়ে পারিনি, সুজয়া।…জানলার গায়ে ঠেস দিয়ে ওরা কথা বলছে। সেদিকেই কান পেতে দিলাম। কেননা, তোমার কাছ থেকে সেদিন যে রূঢ় আঘাত এসেছিল সেটা আর ভাবতে ইচ্ছে করে না। অবিশ্যি এখন… এখন সেই যন্ত্রণা ভোঁতা হয়ে গেছে। তবু—। ওরা বলছে, আশী হাজার টাকা চাঁদা তুলেছে। শালা একবার আন্দাজ করতে পারিস!…আ বে, এক হপ্তা আগেই দেখিচি বাসে যেতে যেতে। শালা আধ মাইল ধরে—বড় রাস্তার দু ধারে যত বাড়ি আছে না, শালা সবগুলো আলোর মালায় সাজিয়ে দিয়েছে মাইরি।…মাইরি কতো টাকা খরচা হয়েছে একবার ভাবলে ট্যারা হয়ে যাবি।… আর, আর আলো দিয়ে ফুটবল খেলা হচ্ছে, শুনিচিস।…শালা সেরেফ টা কা র খেলা ! কিন্তু এভাবে পাড়ার ভিতরে ছেনতাই করলে সেধো, কাজটা খারাপ হয়েচে।…আরে না-না, সেধোর কম্ম নয়, এ পাড়ার মাল নয় ভাই।… যে-ই করুক ঝামেলা শালা এখন তো সেধোকে পোয়াতেই হবে। ইদিকে মা পাঁচ বাড়ি বাসন মেজে বেড়াচ্চে, বাবা করচে মজুরের কাজ, বোনগুলো আজ এর

ঘরে কাল ওর কোলে করছে—ও শালা দিব্যি টেরিলিন হাঁকড়ে কাপ্তেনি করছে। ছেনতাই না করলে এসব কোত্থেকে আসে ?…যে শালা কাঠ খাবে তাকে আংরা হাগতে হবে। ওসব ভেবে কি হবে বল।…যা বলচিস, তার চেয়ে ঘরে গিয়ে একটু ঘুমুলে কাজ দেখবে। আবার তো কাল সক্কাল বেলায় মানিকতলায় ছুটতে হবে।…তোদের কারখানা খুলল ?…নাঃ, ও শালা ইউনিয়নে আর মালিকের লটর-পটরও মিটবে না, আমাদেরও জান পরেশান।…ছাড় তো। সেরেফ ভাতার-মাগের কেজিয়া…না খুললে, খামোখা এদ্দুর থেকে মরতে দৌড়াস কি জন্যে।…একটা বিড়ি ছাড়। বলছি তারপর…।

মাইকে এখন 'পা-আঃ-পা-আঃ পা-আঃ' নাচের তালে গান চলছে। ওরা হাততালি দিচ্ছে। হঠাৎ একজন বলল—এ বে সবটা ফুঁকে দিস না।…লেঃ, ধর! তা বুঝলি, নাগাড়ে এই সাড়ে ছ মাইল অমনি কি আর চুয়াত্তর দিন হাঁটাহাঁটি করছি। কোন দিন যদি টুকুস ক'রে ফ্যাক্টারির গেটটা খুলে যায়, বলা তো যায় না—আমি হয়তো সেদিনেই নাগা করে বসলুম, আর পরদিন গিয়ে শুনবো আমার জায়গায় অন্য লোক নেওয়া হয়ে গেছে। এরিয়ার মাইনেপত্তর সব গজব হয়ে যাবে। তখন হারামীদের পায়ে তেল মালিশ করো। তোকে বলবো কি চাকরির বাজার বড় খারাপ হয়ে পড়েছে। · কোন্ বাজারটা ভালো আছে। চালের লাইনেও আজকাল লাভ থাকে না। আমার আবার উপরি জ্বালা এই দাড়ি।

· কেন, দাড়িতে কি হ'ল আবার ?…ওই বলে কে, সন্নেস নিলুম এক বছরের। চুল-দাড়ি রেখে মানত করলুম। মানত করে তো আর ওজনে চুরি-জোচ্চুরি করা, কি, মিছে কথা বলা যায় না। আর খদ্দেরের কাছে মিছে কথারই দাম। যদি বলি, দু পয়সা লাভ করছি—শালারা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। এই অমাবস্যে পেরুলেই শালা এই সাধুগিরি নিকেশ করবো। তখন দেখিস—এই এক বছরের লোকসান কি ক'রে উশুল করি।

বড় তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু এমন জমাট আসর ছেড়ে নড়তে মন সরছে না। ওরা জানলা থেকে সরলেই উঠবো। আমিও একটা বিড়ি ধরাঁবো।

…তা কি হয় রে। যা যায় তা আর ফেরে না। তা ছাড়া তুই ত আর পয়সার ধান্দায় করিস নি মানসিক। যে জন্যে করলি।…গুলি মার, মেয়ে-মানুষের জাত আর বেড়াল দুইই এক। মাঝখান থেকে ক্ষ্যাপাবাবার ফোসলানিতে পড়ে আশায় আশায় গোটা বচ্ছর নাকানি-চুবুনিই সার।…তোকে তো আগেই

হুঁশিয়ার করেছিলুম। মনে আছে ?…কি বলিছিলি ?…আবে, সোনাদার চায়ের দোকানে বসে বললুম, তুই ফুলটুসীর মায়া ছাড়, ও শালী শম্ভুর সঙ্গে ফিট আছে। যদি মরদ হোস তবে অন্য মালের সঙ্গে ঝুলে পড়। নিজে না পারিস বল, আমি জোনাকি কি ময়নার সঙ্গে তোকে ফিট করে দিচ্ছি—! তা গরীবের কথা তো, মন উঠবে কেন। কোথাকার ক্ষ্যাপা বাবা। আরে আজকাল শালা কোন্ জিনিসটা খাঁটি আছে ? সাধু সন্নিসিতেও ভেজাল হয়েছে। ক্ষ্যাপা বাবা তোকে ক্ষেপিয়ে টু পাইস করে নিল।

এরপর আর জমলো না। কেননা একজন অন্যের কাছে দুটো টাকা ধার চাইল আর জবাবে অন্যজন বলল—আগের সেই ষোলো টাকার তো একটি পয়সা উপুড়হস্ত করার নাম নেই, উল্টে আরো ?…শালা রোজ এতখানি পথ খালি পেটে হাঁটাহাঁটি করে আর পারি না। দে মাইরি সুদ দেবো। কারখানায় জয়েন করি তখন দেখিস যদি না-দিয়েছি তো কুত্তার নামে নাম রাখিস।… নেই ভাই, বিশ্বাস কর।…দেখি শালা পকেট সার্চ করব।…ওদের একজন ছুটল, অন্যজন তার পিছু ধাওয়া করল।

ওরা হারিয়ে গেল রাতের সমুদ্রে। অতল অন্ধকার ওই গলির ভেতরে। আর আমি বাবার হাঁপানির টান—সাঁই-সাঁই শব্দের কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। চোখ দুটো জ্বালা করছে। আচ্ছা এমন কেন হচ্ছে ? মনকে তো আমি এখন ময়না বানিয়ে ফেলেছি। যা বলি তাই শোনে। নইলে এই ধরো না, প্রায় রোজই তো আমি যাই ও-পাড়ায়। ভুলেও তোমার সামনে পড়ি না—কখ্খনো না। দেখি।

কী দেখি জানো সুজয়া ?

তুমি যা দেখ, আমিও তাই দেখি।

শোনো তবে।…না, না, আগে একটা বিড়ি ধরানো যাক। জমিয়ে নিই মনের আগাছালো সুতোগুলো।

কালোয়ারপট্টির সামনে ফুটপাথখানা ওদেরই জং-ধরা লোহা-লক্কড়ে বোঝায়ই হয়ে উপচে পড়ে পীচের গাড়িচলা পথেরও অনেকখানি গিলে খেয়েছে। কাদা. জল আর সেই জলে চীনেবাদামের ছোট-ছোট নৌকোর মত খোলাগুলো সেখানে দিব্যি ভেসে বেড়াচ্ছে। দেখেছো তো নিশ্চয়। দু'বেলা ওই পথ দিয়েই তো তোমায় অন্নের ধান্দায় যাতায়াত করতে হয়। না, লুকোবার চেষ্টা করো না—তুমি কি শুধুই লাল (না, ঠিক ডগ্‌ডগে লাল নয়। ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপের

পাপড়ির মতো) রং-এর দেয়াল, রেলিং আর গেট্‌ওলা বিরাট ইমারতের ভেতরে মার্বেল পাথরের পুরুষমূর্তিটিই কি কেবল দেখ? নাকি, তাও না? তার এপারে, দেখ ওগুলো কাদের প্রাসাদ জানো? একদা যেসব জায়গায় সাহেব-সুবোর ল্যাণ্ডো, ভিক্টোরিয়া, ব্রুহাম গাড়ির ঘোড়া-দাবড়ানি শোনা যেত, যে-সব কক্ষের বেলোয়ারি ঝাড়ে নর্তকীর হীরে-জহরতের জেল্লা বিচ্ছুরিত হ'ত—আমি কল্পনা করি এগুলো দেইসব ইতিহাসের হাড়-পাঁজরা। কি করি বলো। কখন তুমি যাবে এই বাড়ির পাশ দিয়ে, আর আমি এক নজর দেখতে পাবো—সেইজন্যে ভিড়ের মানুষ সেজে এধার-ওধার পায়চারি করি—সময় বয়ে যায় না আমায় না ভাবিয়ে। তাই এগুলো গড়ে তুলি ওই দিকে তাকিয়ে। তুমি যাও। তোমায় যখন আসতে দেখি দূরে এপারে দাঁড়িয়ে তখন টের পাই সংগ্রামের সৈনিক এক বাস্তবের সঙ্গে মোকাবিলা করে বড়ই যেন শ্রান্ত, অবসন্ন। হতে পারে এ শুধু আমারই কল্পনা। হয়তো সত্যি তুমি ক্লান্ত নও, হয়তো ভাবচো এমনি করে হাঁটকে হাঁটকে বিশল্যকরণীর দেখা পেয়ে জখম-হয়ে-যাওয়া সংসারে প্রাণসঞ্চার করে ফেলবে। আশা।

আশা আমারও আছে সুজয়া।

যখন সন্ধে নামে। এই যেমন কাল-পরশু নেমেছিল। মণিবাবুর অফিস থেকে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ঠিক সময়টির ঝুঁটি ধরলাম। তুমি ফিরবে। মণিবাবু ভরসা দিয়েছেন। 'লেগে থাকো, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে আপাতত হাতে কিছু নেই, দেখতেই পাচ্ছ। তা বলে আসা বন্ধ করো না। কখন কোন্‌ পার্টি আসবে তা কেউ বলতে পারে না। তবে আসবেই—আর এলে তোমায় ট্যাগ ক'রে দেবো।'…মণিবাবুর সঙ্গে দিশি-বিদেশী অনেক কোম্পানীর কারবার। আর সেইজন্যে তাঁর বেগার খাটছি।

যাক গে, ওসব এখন থাক। এক দিকে মণিবাবু শুধু আশাই দিচ্ছেন। কিন্তু তুমি ট্যুইশান সেরে ফেরাটা তো আর নিছক আশা নয়। তোমাকে একদিন বলতে পারবো পাশে দাঁড়িয়ে, কিংবা চলতে চলতে—আমারও অন্নসংস্থান হ'ল, সুজয়া।

পর পর দু'দিন। বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে নামলো। অথচ তুমি এলে না। ভাবলাম হয়তো সময় পাল্টে গেছে। এদিকে একটা ঠেলা গাড়ি 'পার্ক'

করা আছে লাহাবাড়ির সামনের পথে। ফুটপাথে মাটির কলসীর গায়ে ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো। একটা নয়, কয়েকটি বড় বড় কলসী—খানিকটা তফাতে সাজানো হয়েছে। আর যৌবন-পার-হয়ে-যাওয়া একটি করে স্ত্রীলোক তার পাশে বসে আছে। কোনো রিকশাওয়ালা কোথাও বা ঝাঁকামুটে—তার বোঝা নামিয়ে উবু হয়ে বসছে। কাচের গ্লাসে করে ওই রমণী সেই কলসী থেকে কিছু নিয়ে গ্লাস ধরিয়ে দিচ্ছে- তাড়ি। কাল-পরশু দেখেছি এই তাড়ির বেসাতি। ওইখানেই একটা মিশমিশে কালো লোক, পরনে তার লাল গামছা বা লুঙ্গি বোঝবার উপায় নেই—লোহার গোল ঘেরাটোপের গায়ে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে বসে বোধ হয় ঈশ্বরের অপার মহিমার ধ্যানে রত। লোকটার পা কিন্তু সাদা। শুভ্রতায় তার চরণযুগল জ্যোতিঃ-বিভাসিত বুদ্ধকেও হার মানাতে পারে-কেন-না, প্লাস্টার করা। ভাঙ্গা পা নিয়ে লোকটা কি জন্যে ওখানে বসে আছে কে জানে।

তুমি হয়তো বিরক্ত হচ্ছ। এসব কথা তোমায় কেন বলা? তোমার মনে সহানুভূতি জাগানোর প্রচ্ছন্ন প্রয়াস? মোটেই তা নয়। তুমি যদি ঠিক সময়ে অঙ্কের উত্তরের মত নির্ভুল মূর্তিতে পথ দিয়ে চলে যেতে, তা হলে আমারও ছুটি মিলতো। তা হ'ল কই! তবে একটা কথা শুনলে তোমার মন খারাপ হবে নির্ঘাত। এইভাবে ঐ সময়ের পথ আমার মনকে বন্দী ক'রে ফেলেছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার জন্যে প্রতীক্ষার কথা। আমিও একবার ওই পিপাসা মেটানোর আয়োজনে আকৃষ্ট হয়ে বসে পড়তে চেয়েছিলাম, সুজয়া। ওরা, ওই যারা অনায়াসে ঢেলে দিচ্ছে আর যারা তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে বসে পড়ছে—দু' তরফের মধ্যে মনের কারবার নেই, আছে প্রয়োজনের।

তারপর দমকল ছুটলো ঘণ্টা বাজিয়ে। না, আগুন নেবাবার দমকল নয়। ভক্তির বন্যায় যারা ভগবানের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, তাদের জন্যে মন্দিরের ঘণ্টা বেজে ওঠার শব্দটা আমি দমকল ব'লে ভুল ক'রে চমকে উঠেছি।

তোমার খবর নিতে মেছোবাজারের আলোয় ছেয়ে যাওয়া পথ ধরলাম। পথটা ভুল হ'ল। অত আলো। সব যেন এলোমেলো ক'রে দিল। তোমার অসুখ? নাকি তোমার ওই ট্যুইশানটা খতম? নাকি অনিমেষের কোনো বিপদ হয়েছে!

আগে হ'লে সোজাই হাজির হওয়া ছিল সহজ। কৈফিয়তের কোনো গরজ বা দরকার বোধ করিনি। কিন্তু কাল বা পরশু ওই আলোর তলা দিয়ে হাঁটতে

হাটিতে কেবলই মুচড়ে উঠেছে কলিজা। যদি এই অজস্র আলোর স্রোতের তলা থেকে কোনো গোপন অভিসন্ধি আবিষ্কৃত হয়—যদি প্রশ্ন এমন হয় যাতে তোমার এতদিনের রচিত দুর্গ ধসে চুরমার হয়ে যায়—। তাই যাইনি।

আমি জানি।

আজও বাবা পাঠাবেন। আমি যাবো। কিছু পাবো না।

যাবো মণিবাবুর কাছে।......

তারপর সেই কালোয়ারপট্টির পথে বিকেল আমার সন্ধে পেরিয়ে দেবে।

জানি, তুমিও ফিরবে না। অথবা ফিরবে। দূরের হাওয়ায় পরিচিত গতির ধাক্কাও শেষ হবে। তবু আমি দেখবো ওদের।

সবচেয়ে ভয়ের কথা কি জানো? ওই আলোর নীচে—যে আলোর জন্যে হাজার হাজার টাকা পুড়ছে—সে আলোর নীচে কত অন্ধকার তাই ভাবছি। আর ভাবছি। যেসব বাড়িকে এইসব মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে, তারই একটিতে তো তুমি আছো, আর যে থাকতে পারতো সেই অনিমেষ নেই। যে অনিমেষ বিপ্লব আনতে জেলখানার ওপারে চলে গিয়েছে। আমার অন্নের সংস্থান হবে একদিন। তখন কিন্তু—! এই কাল-পরশুর মতো তোমার কাছে যাবার পথটা খুঁজে পাবো না—গরজও থাকবে না। আমারও না, তোমারো না।

ওরা এখন শহীদবেদী বানাচ্ছে আর জোর গলায় নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছে। ওরা খবরের কাগজে ছবি পাঠাবে—একই কালীমূর্তির ছবি। কিন্তু ছ পবে না। ছাপবে তাদেরই পাঠানো ছবি যাদের রক্ত-চক্ষুকে তারা ভয় কর। আচ্ছা সুজয়া, প্রেমও কি তাই? মাইকে এখন চিৎকার উঠেছে, ময়ূরকে পেখম মেলতে হুকুম করছে কোনো বিখ্যাত গায়ক। হায় ময়ূর, তোমার পেখমের রঙ কি এখানে এই আমাদের মনে এক কণাও ছড়াবে না! আহা। কী অপূর্ব উচ্চারণভঙ্গী। না, না, বরং নির্ভুলই বল উচিত—কেননা, কালের কবলে পড়ে দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সিংহাসনটি—যার নাম ময়ূরের সঙ্গে ঐতি-হাসিকভাবে জড়ানো, সেটির যে গতি হয়েছে, সুরকারের সৌকর্যে পেখমের 'প্যাখম্' হওয়াও তেমনি অনিবার্য। কালের গতি! তবে কি জানো অনিমেষ, বিপ্লব শুরু হয়েছে—পথে পথে এইসব শহীদবেদীর ব্যারিকেড আর সমাজের মাথা থেকে পা, পা-ই বলি কেন, কেন পায়ের তলা অবধি সর্বত্র সত্য-শিব-সুন্দরের সেই হিমালয়সদৃশ রাজত্ব খান্ডবদাহনের তান্ডব-লীলায়

মেতে উঠেছে। অনিমেষ, তুমি কারা-প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় না পেলে আজ তোমার স্মৃতিতেও শহীদবেদী রচনা হ'ত পথের ওপর। সত্যি এক ময়ূরসিংহাসন ঘুচে গিয়ে কত শত এইসব ময়ূরসিংহাসন গড়ে উঠছে বলতো! বলতো সুজয়া, তোমার কানেও এই সুর পেঁছচ্ছে কিনা! এই যে এখন আবার 'প্যাখম্ ম্যালো' ব'লে চিৎকার করছে মাইকখানা। একটা খবর তোমায় দেবো। তবে আজ নয়। যেদিন আমি অন্নের সংস্থান করতে পারবো, সেই দিন—। সেদিন বলতে পারবো যে, আমাদের পিসীর বাড়ি—যেখানে প্রথম তোমায় চুমু খেয়েছিলাম, আর তুমি মাথা মুখ নামিয়ে কাঁপা সুরে বারণ করেছিলে (কণ্ঠে তোমার জোর ছিল না, ছিল আবেগ—প্রশ্রয়ের মিনতি) —সেই পিসী-দের পাশের বাড়ির বেদনাবাবু (যার নাম শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলে আর একটু হলে—ভাগ্যে হাত ধরেছিলাম)—বেদানাবাবুর মোটর গ্যারেজে এখন এক জোড়া ময়ূর পোষা হয়েছে। মোটরখানা বেচে দিয়ে সেইখানে এই যে 'বার্ড অব ইন্ডিয়ার' প্রতিষ্ঠা, এ কি কম কথা! যদিও বাইরের লোকের দেখার উপায় নেই (গ্যারেজটা এমনভাবে বন্ধ যে, হাওয়াকেও ঢোকবার জন্যে ছেঁদা খুঁজতে হয়)। ওই গ্যারেজে বসে যে বুড়ীটা বাবুদের বাসন মাজে সেই-ই খবরটা চাউর করেছে। চোখে না দেখলেও ময়ূরের খবরটা সবাই শুনেছে —আমিও!

সুজয়া তুমি বিরক্ত হচ্ছ? চাকরী একটা হল বলে। মণিবাবু অ্যাসিওর করেছেন। খানিকটা এগিয়েও গেছে কথাবার্তা। বলছি না। যদি শিকে শেষকালে না ছেঁড়ে! কালই তো দুপুরে খিদিরপুর ডকে আমায় পাঠিয়ে-ছিলেন। কি বলব, এমনই ইল্-লাক যে, তোমায় ভেড়ার মাংস খাওয়াবার একটা চান্স হাতে পেয়েও কাজে লাগাতে পারলাম না।—পকেটে যদি দশটা টাকা থাকতো, কি নিদেন সাত-আট টাকা—তা হলেই হ'ত। অবাক হচ্ছ? আরে, কারা যেন ময়দানে একপাল ভেড়া নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ আটটা ভেড়া ছুটে এসে ট্রামের চাকার তলায় শহীদ হয়ে গেল। না, ওদের কোনো লীডার ছিল না। আমরা অচল ট্রাম থেকে নেমে সেই করুণ দৃশ্য অবলোকন করি। ভাবতে পারো? কিন্তু মেষপালক বলিষ্ঠ মনের বলে বুক বেঁধে নীলাম শুরু করল। চোখের ওপর দেখলাম, মরা সেই ভেড়াগুলো বিকিয়ে গেল আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিটের মধ্যে। টাকা ছিল না, থাকলে কি হত বলা যায় না—! সেই দৃশ্যের মধ্যে একটা প্রশ্ন শুধু জন্ম নিয়েছে। আচ্ছা, যারা এই আদর্শ-

বাদের বলি হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তাদের লাশ কত দিয়ে কে কিনবে। কেউ কি কিনবে? অন্য একটা বাসে চড়ে যখন ডকে পেঁছিলাম তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

যাক গে। চাকরি পাওয়া অবধি তুমি যেন আমার অপেক্ষায় থেকো সুজয়া। তোমার কাছেও যেন 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে' না ঘটে—শুধু এই কথা ব'লে দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে দিচ্ছি সুজয়া।

শহীদবেদী তৈরী নিয়ে ওদের দলের মধ্যেই বিতর্ক উঠেছে। কে একজন হেঁকে উঠল, 'রাখ! ওসব ফ্যাশানের দরকার নেই। শালা, শহীদবেদী করলেই হল। তার ইজ্জত দিতে পারবি? কাগে-শালিকে হেগেমুতে দিয়ে যায় ঝিলের ধারের পার্কের শহীদবেদীতে দেখিচস! কেউ কোনোদিন সাফ করিচিস? এই কমাস আগে আমি চোখের ওপর দেখলুম এক শালার লীডার ইলেকশনে জিতে পার্টির লোকদের মিষ্টি গিলুচ্ছে। ভিড়ে-ভিড়। রাস্তার গাড়ি অবদি বন্ধ হয়ে গেছে। এক শালা কমরেড কিনা শহীদবেদীর ওপর পা রেখে একটু ঢ্যাঙা লেকচার দিচেছ।...কত বড় অন্যায়। ছি ছি।... কিন্তু কমরেড যোগেশ আজ বেঁচে থাকলে এখেনে আসতো, খিস্তিতে গানে মাত করে রাখতো।...আর সেই যোগেশকে আমরা যখন পাচ্ছি না · তার নামে বেদী না বানালেই আমরা তাকে ভুলে যাবো নাকি! কি বে!'... (মিছিলের প্রতিধ্বনি আমার মনে: 'ভুলি নি, ভুলবো না।') হয়তো মরে গেলে আর বিস্মৃতির আশংকা থাকে না। সত্যি সুজয়া এইভাবে যারা মরেছে তারা অন্তিমকালে এই বিশ্বাস নিয়ে নিশ্বাস ত্যাগ করেছে তার আদর্শ নিশ্চয় জয়ী হবে। আর তার পশ্চাতে পড়ে থাকা বন্ধুরা বারবার তাকে মনে রাখবে, সেই মনে রাখা পবিত্র বেদনায় স্নিগ্ধ। তাই না! আমার কানের পর্দায় সেই আটটি মৃত্যুমুখী ভেড়া যন্ত্রণায় চিৎকারে পাগল করে তুলছে। বাঁচাও—বাঁচাও! শহীদ কি তা করে? করে না। সত্যি সুজয়া' আমি যদি কোনো বিরাট আদর্শের স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে মরতে পারতাম তা হলে তোমার মনের ময়ূর সিংহাসন আমার কেনা হয়ে যেত।

কি বলছো? এখনো সময় আছে! এখনো আমি আদর্শের পিছনে ছুটতে পারি। দেরি হয়ে যায় নি? সত্যি বলছো। আহা, তোমার নাগাল যেন পাই—পেতে চাই আমি যে-কোনো মূল্যের বিনিময়ে।

॥ চার ॥

কনে-দেখা-আলোর বেলাটুকু তখনো অতীত নয় এমন সময়—সহসা, বিপ্লবের বজ্র-স্লোগানে আকাশ জুড়ে, দিকবিদিক ছেয়ে, ময়দান-অভিযাত্রী বিপুল-বিরাট মিশমিশে কালো চুলে ঢাকা মিছিলের মতো দলবদ্ধ, অসংখ্য, অবিচ্ছিন্ন-মাথার একপাল মেঘ বিশ্বচরাচরকে কালো আঁধারে গিলে ফেলল। অকালে নামল রাত। আর সেই সঙ্গে দমকা, ক্ষ্যাপা বৃষ্টি। যদিও শ্রাবণ, যদিও বর্ষণই এখন স্বাভাবিক—তবুও অকস্মাৎ এই অযাচিত গায়ে-পড়া বৃষ্টিতে ভিজতে কাজলের বিশ্রী লাগে। এই শ্রাবণ, এই বর্ষণ, সর্বদাই রসসিক্ত, সুন্দরলালের স্যাঁতসেঁতে উপস্থিতির মতোই নিয়ত অস্বস্তিজনক। যেমন ভালো লাগে না এইভাবে বাধ্য হয়ে ভিজতে, তেমনি—।

অথচ এমনিতে কাজল, জল পেলে কতই পুলকাঞ্চিত হয়। সেই চৈত্র থেকে শুরু হয় ওর সীতা-সায়রে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে শুধু নাকটুকু জাগিয়ে অবগাহন। যেমন উত্তাপ বাড়ে তেমনি স্নানের সময় লম্বিত হয়। আর যখন প্রথম বর্ষণ,—লাজুকলতার মতো একফোঁটা, দু-ফোঁটা ক'রে, প্রথম বর্ষণের আবির্ভাব ঘটে, তখন, নুয়ে-পড়া বাঁশঝাড়ের বেণীতে চতুর্দিক আবরু-করা সীতা-সায়রে চোখটি বুজে আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে তুলে, (কখনো-বা হাঁ করেও) কাজল ভেজে। জ্বালা জুড়োয়, বিশ্বকেই যেন শীতল করে। এইভাবে বর্ষণের অসংখ্য ধারা-রেখা স্বর্গকে মর্তের সঙ্গে যখন অঙ্গীভূত করে মিলিয়ে দেয়—তখন কাজল বৃষ্টির অমৃতধারায় নিজের ভেতর পর্যন্ত, যেন মনেরও ভেতর অবধি ধুয়ে নির্মল করতে চায়।

দূরে—জগৎপুরের ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলোটা সহসা কিশোরের হাতের সেই আংটির চুনীর মতো জ্বল-জ্বলে হয়ে ঝিকিয়ে উঠল। একদা সুন্দরলালের আংটির পাথরখানা দেখেই কাজল আকৃষ্ট হয়েছিল। কখন? সেই অবস্থার কথা মনে পড়লে এখনো কাজল শিউরে ওঠে। আসলে সুন্দর এমন একটা কাজের জন্যে হাত বাড়িয়েছিল যেটা কাজলের কাছে অসহ্য। থচ, অত বড় এবং ওইরকম মানী একটা মানুষকে ভজা বা গোপুলার মতো

গায়ের বা গলার জোরে হটিয়ে নিজেকে বাঁচানো চলে না। তাই চট করে সুন্দরের হাতখানা, পাকা সাপুড়ের মতো খপ করে বুকের ওপর থেকে ধরে সরিয়ে এনে আত্মরক্ষা করেছিল কাজল। আর কণ্ঠে সারল্য ঢেলে, কৌতূহলে ভান দেখানো গলায় শুধিয়েছিল—'এটা কী পাথর ? বাব্বাঃ, আলো ঠিকরে পড়ে এমন, যেন রক্তের ফিনকি !'...

আজ, অনিচ্ছায়ই ভিজছে ও। জগৎপুরের ওই দূরের আলোর রক্তিমায় চোখ ফেলে রেখে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে কাজল। বারো, না কতো রতির চুনী, 'অনেক রুপেয়া' তার দাম।...হাবাসপুরের ফুলদোলের মেলায় ঘুরতে ঘুরতে অবিকল অমনি চুনী-বসানো একটা আংটি দেখে, ভয়ে ভয়েই কাজল দাম জিগ্যেস করে জবাব শুনে অবাক হয়েছিল। পাছে দোকানদার নিজের ভুল শুধরে পরমুহূর্তে দাম বাড়িয়ে দেয়, বা অন্য খদ্দেরে কিনে নেয়, তাই সাত তাড়াতাড়ি মুঠোর বটুয়া খুলে একটা আধুলি আর সিকি, ব্যস্তভাবে দোকানীর হাতে তুলে দিয়েছিল কাজল। আংটিটা না নিয়ে দোকানী আধুলি ফেরৎ দিয়েছিল। উপরন্তু আরও পনের নয়া! ভয়ে, আতঙ্কে কাজলের হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছিল। নিশ্চয় দোকানীর মতলব খারাপ। নইলে দশ নয়ায় অমন আংটি কেউ দেয় ? কাজলের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়েছিল। চিৎকার করতে যাবে, এমন সময়ে দোকানী স্নেহমাখা কণ্ঠে বলেছিল—'মা-জনুনি! *ম্যালারয্যালা জায়গা ভালো নয়!* দিন থাকতে বাড়ি এসো। পয়সা-কড়ির হিসেব জানো না। ঠকে মরবে যে।' কী ভুল, কী ভুল! কাজল যে সুদের হিসেব পর্যন্ত নির্ভুল কষতে পারে বোকা লোকটা যদি জানতো !

দশ নয়ার সেই অমূল্য রত্নখচিত আংটি কাজল নিজের আঙুলে পরে নি। কিশোরের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল।...সেই কথাই এমন বিভোর হয়ে ভাবছিল কাজল। ভাবতে ভাবতে সব ভুলে গিয়েছিল। খোলা আকাশের তলায় বৃষ্টির জলে কাপড়, জামা, আঙিয়া সবই ভিজে সারা—সে খবরও রাখছে না ও। আর তাই যখন গায়ের সংগে লেপ্টে-যাওয়া বেশবাসের অস্বস্তিকর স্পর্শ পেয়ে সজাগ হল তখন ভীষণ চটে গেল! বিরক্তি আর ক্রোধ ওকে মরীয়া করে তোলে। কেন যেন মনে হচ্ছে, জল ত নয় জন– আর কেউ ওকে অতর্কিতে জড়িয়ে ধরেছে। ছাড়বে না। স্বতঃই সুন্দরলালের গলে-ঢলে-পড়া স্যাঁত-সেঁতে ব্যক্তিত্বের তাজা স্মৃতি ওর মনে জাগল। যা এড়ানো, বা ছাড়ানোর

উপায় কাজলের নেই। যেমন এখন এই ভিজে বেশবাসের হাত থেকে ইচ্ছে করলেই রেহাই মিলবে না—তেমনি সুন্দরলালও অংগীকৃত। ব্যবহারিক সমাজে চলাফেরার জন্যে এই ভিজে বেশেই ঘোরাফেরা করতে হবে। বইতে হবে, সইতে হবে। তেমনি কিস্তিওয়ালা সুন্দরলাল না থাকলে—। ভাবাই যায় না, কী দশা কাজলদের পরিবারের হত। বিরক্ত কাজল নিজের আহাম্মকীতে চটে যায়। এখানে দাঁড়িয়ে না ভিজে, টিকিটঘরের সামনে পালালেই ত হত। কিন্তু এখন আর গিয়ে কি লাভ। সবই ত ভিজে জবজবে। এখন গেলে ফড়ের দল চোখ দিয়েই কাজলকে চাটবে।

যতো জোরেই জল আসুক কাজল নড়বে না। না। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজবে। জেদ চেপে গেল। ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণার এই এক অভিব্যক্তি ওর স্বভাবে আছে—যখন নিজের ইচ্ছেটা অবহেলিত হয়, আর রাগ হয় তখন ইচ্ছের বিরুদ্ধ-কাজটার টুঁটি টিপে ধরে। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলে—'নাও তোমার ইচ্ছের কতো দৌড় আছে দেখি।' ট্রেনখানা যতোক্ষণ না আসছে, যতোক্ষণ আংটির চুনীর মতো ওই আলোর রক্তচক্ষু সবুজ না হচ্ছে ততক্ষণ এইখানে থাকবে—কাজল এক চুলও নড়বে না। চুনীর মতো লাল আলোর দিকে তাকালে কেবলই কিশোরের কথা ভাবতে ইচ্ছে করে।

সে হয়ত এখন টিনের কৌটোর মধ্যে মশলা-মিশিয়ে চামচে দিয়ে চানাচুর খুঁটছে। গায়ের হাফশার্টটা ছিঁড়ে গেছে। কাজল কতোবার বলেছে, নতুন জামা কিনতে—বনগাঁয়ের বাজারে সুন্দর সুন্দর জামা, দামও এমন কিছু নয়—তা কিনবে না। ওই ছেঁড়া-জামা, আর খাকী হাফপ্যাণ্টের ফাটা-অংশ দিয়ে দাবনার ফর্সা রঙ দেখা যায়—তাকাতে লজ্জা করে কাজলের। গোঁয়ার—ওকে বলে কোনো ফল হয় না। শুধু গোঁয়ার? বোকা। ওর একার রোজগারেই ত সংসার চলে, ওরই চানাচুর বেচা পয়সায় কুমারের কাপ্তেনী চলছে। কুমারকে দেখলে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না যে, ওর দাদা সেই ভোরবেলা চানাচুরের টিন আর ঝুলি কাঁধে করে এ ট্রেন ও ট্রেনে মাল বেচে রাত এগারোটায় বাড়ি ফেরে। অবিশ্যি নিশ্চিন্দিপুর, ময়নাপাড়া, বেলেডাংগা সব গাঁয়ের মানুষকেই খেটে খেতে হয়। তবু কিশোরের খাটুনীর কোনো 'সীমে-মুড়ো' নেই। সেই যেদিন আংটিটা কিনে মনের আবেগ চাপতে পারে নি কাজল—কখন রাত নিশুতি হবে, কখন দশটা সাতান্নর গাড়ি আসবে—সবুর সয় নি। কাজল হাবাসপুর থেকে রুদ্ধশ্বাসে স্টেশনে এসেছে। বিকেলের লোক্যালের অপেক্ষায়

কুমারও থাকে। কিশোর ডেকে তুলে নেয় ভাইকে গাড়িতে। কল্যাণগড়ের বাজারে পেঁয়াজ, আদা, নারকেল, আর মশলা কেনে—কাজলের নখদর্পণে ওদের গতিবিধি। পেয়ে গেল। সেটাও আজকের মতো এই গাড়িই ছিল। কুমারের পিছু পিছু কাজল যে উঠল তা কিশোর খেয়ালই করে নি।

...গাড়ির মধ্যে অনেক লোক। ও বাবা, এ যে সংসার পেতে বসেছে কিশোর। অন্যমনস্কভাবে চুলের আস্তরণ ভেদ করে গড়িয়ে-পড়া বৃষ্টিধারা হাত দিয়ে মুছতে মুছতে কাজল শুকনো খটখটে সেই সন্ধ্যার ছবি দেখছিল। কমলালেবু ফিরি-করা মহেন্দর তার চুবড়িটা সীট থেকে নামিয়ে কাজলকে সমাদর দেখিয়েছিল—'বসো বুইন। চল্‌লা বুঝি কলকাতা?' না! তবে? একটু হেসে জবাব দিয়েছিল—তোমাদের সংসার দেখতে আসলাম।' '...হাঁটু মুড়ে কিশোর পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছিল, চোখ না তুলেই প্রশ্ন করেছিল —'আজ বুঝি ছুটি?' কিশোরের গালের ওপর কাটা দাগটার দিকে চোখ রেখেছিল কাজল। এখনও যেন সেই কাটা-দাগের ওপরেই ওর দৃষ্টি।

দূরের আলোটা এখনো লাল! আচ্ছা, আর যদি রঙ না পাল্টায়। শুধু লাল হয়েই জ্বলতে থাকে। আর জ্বলে-জ্বলে তেল ফুরিয়ে, এক সময়ে সবুজ না হয়ে, নিভে যায়! তাহলে বেশ হয়। ট্রেন তাহলে আসবে না—সুন্দরলালও না। কিন্তু সেই বাঞ্ছিত ঘটনার সম্ভাবনায়ও ষোল আনা উল্লাস জাগে না। কেন না কিশোরও ত ওই ট্রেনেই থাকবে। 'মুখোরুচি চানাচুর' হাঁক...মশলার লম্বা শিশিটা...কিশোরের ঝকঝকে হাসিমাখা দাঁতগুলো চোয়ালের উঁচু হাড়ের ঘাটতি ঢেকে দিয়েছে...নিপুণ শিল্পীর মতো টিনের খোপগুলো থেকে নারকেল কুচো, পেঁয়াজ, আদা আরও কত কী মিশিয়ে, সবশেষে মশলা ছিটোনো...সেদিন কুমার চানাচুর আর নারকেল মিশিয়ে যখন মশলার শিশিটা নিয়ে ঝাঁকাতে গেল, কিশোর তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে বিশেষ কায়দায় মশলা ছিটোচ্ছিল...কাজলের মনে হচ্ছে, ওই কাজটা দুনিয়ার আর কারুর হাতে ছেড়ে দিয়ে কিশোর স্বস্তি পায় না। মহাভারত বুঝি অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

ওটা কাজল ভালো করে বোঝে। জ্বরে গা পুড়ে গেলেও, যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে গেলেও, দেয়াল ধরে-ধরে মা ওদের ভাত বেড়ে দিতেন। অথচ ফ্রক-পরা কাজলই ত তখন গেরস্থালির সব কাজ করত।... বৃষ্টির জলের সংগে ওর নিজের চোখের জল মিশে গিয়ে কান্নার অস্বস্তি

ঘুচিয়ে দিল। এখনো, মায়ের কথা মনে পড়লেই চোখ ছাপিয়ে জল আসে। আর মায়ের মৃত্যুর কদিন আগেই ত বাবার চোখের দৃষ্টি হারালো। উঃ, সেকথা—সেই নিদারুণ খবরের আঘাতটা মায়ের মৃত্যুকে তত তীব্র হতে দেয় নি। কেননা, তার আগেই কাজল, অনিল, মিলন সবাই—ওদের গোটা পরিবারটাই যেন একসঙ্গে মরে গিয়েছিল। বাবা বললেন—অকালে এবার এমন আঁধার-করা মেঘ নামল।···অথচ তখন কটকটে রোদে সীতাসায়রের তলার মাটি অবধি ফেটে যাচ্ছে—শুধু মাঝখানটায় কাদা থকথকে কয়েক কলসী জল যেন আছে। বাবার কথা শুনে অবাক হয়েছিল কাজল। হাঁ করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আপন মনেই তিনি গজগজ করছিলেন—আজ বিক্কিরির দফা রফা। ট্রেনের প্যাসেঞ্জার অন্দেক—চাটনী লজেন্সই বলো আর পেয়ারাই বলো, বেশি ত খায় ছেলে-ছ্যামরায়, তা এদিনে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কেউ বেরুবে না।···বাবার গায়ে হাত দিয়ে পরখ করেছিল কাজল—না, জ্বর হয় নি। তবে? আর গায়ে ওর হাত ঠেকতেই বাবা চমকে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—সাপ! আরে, সাপ বুঝি কাজলী। দ্যাখ, দ্যাখ!···

···তখনো কেউ জানতো না বাবা অন্ধ হয়ে আসছেন। কিছুদিন ধরেই এটা অবশ্য টের পাওয়া গিয়েছিল যে মতিলাল চোখে কম দেখছেন। কিন্তু অতটা গা করে নি কেউ। কে-ই বা করবে—সংসারে বড় বলতে আর কেউ আছে কী!

তিন বছর আগের কথা—কাজল বড় সড় হলেও ফ্রকই পরতো। তা ছাড়া মতিলাল বাইরে-বাইরেই ব্যাপার-বেসাত নিয়ে কাটাতো। আগে-আগে বর্ডারের মাল পাচার করে মোটা আয় ছিল কিন্তু দুর্বল শরীরে অতো হাঁটাহাঁটি আর হয়রাণী সয় না—ছেড়ে দিয়ে ট্রেনে মাল ফিরি করে জোড়াতালি দিয়ে সংসার চলছিল।

···কাজল নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল তাই টের পায় নি বৃষ্টিটা থেমে গেছে। বৃষ্টি থামলেও ভাবনার ঝাপ্টা থামল না। চকচকে এমু-কোচের পালিশের সঙ্গে যাত্রীদের পোশাক বা কথার কোনো মিল ছিল না। একজন কানে কানে আর একজনকে বলছিল—'কিশোইর‍্যা মরছে! শ্যাষে ওই ভালোবাসার ফেরিয়ালীর খপ্পরে পড়লো!' গায়ে মাখে নি কাজল। ওরকম কান-পাতলা হলে বেঁচে থাকা যায় না। বরং একটু বাড়াবাড়ি করল, কিশোরের হাত থেকে ছুরি আর পেঁয়াজ কেড়ে নিল। বিনা প্রতিবাদে ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে কিশোর প্যান্টের ট্যাঁক থেকে একটা কাগজের মোড়ক

বার করে ছোট ভাইকে ধমকে দাঁড় করালো—ধর। এই সত্তর নয়া এক কে-জি পিঁয়াজ। ঠাকুরের দুকান থেইক্যা নিবি। আর বর দেইখ্যা নাইরক্যাল তর গিয়া—আঃ, মিশাইস না!

...পেঁয়াজের খোসা বেশি ফেলা হয়ে যাচ্ছে, আড় চোখে লক্ষ্য করে মিষ্টি গলায় বলল—'আরে আমার কপাল, বাকলা সব ফ্যাললে কারবারের বুকে নি মাটি লাগব। রাখ্, অই কাজলী!' ...তাচ্ছিল্যভরে কুমার এমনই মাতব্বরী হাসি হাসল, দেখে কাজলের গা-জ্বলে গেল। চলন্তি ট্রেনে দাঁড়িয়ে পেঁয়াজ ছাড়ানো রীতিমত কঠিন কাজ, কাজল হাড়ে-হাড়ে মালুম পাচ্ছিল। তার উপর ময়না-পাড়ার পান-বিড়িওয়ালা ছিকান্ত, সহযাত্রীকে চাপা গলায় যা বলছিল সেদিকেও কান রাখতে হচ্ছে—অই মতি-ফেরিওলার বেটী! কিস্তিঅলার বাঁধা। বাপ ত চোখের মাথা খেয়েছে। মা মরে হাড় জুড়িয়েছে। বাপে ত চোখে দ্যাখে না,—উঠতি বয়েস, খুব খেলে নিচ্ছে। ...কিশোর ওর হাত থেকে ছুরিটা টান দিল—দে।.. কাজল ছাড়ল না। এদিকে ওর চোখে জল ছল-ছল করছে। পেঁয়াজশুদ্ধ হাতখানা দিয়ে কিশোরের কব্জি চেপে ধরল। কিশোর হাসল—গায়ের জোর বড় বেশি হইছে! আরে চখে জল, মুইছ্যাল! উঁহু রও মণি ওই হাত ঠ্যাকায়ো না, রস আছে।... কিশোরের ধারণা পেঁয়াজের ঝাঁঝ লেগে কাজলের চোখ জ্বালা করে জল গড়াচ্ছে। সন্তর্পণে পকেট থেকে পাট-করা একখানা রুমাল বার করে কাজলের গালটা আলতোভাবে তুলে ধরে রুমাল দিয়ে মুছোলো। কাজল বাধা দেয় নি, অস্বস্তি লেগেছিল, সুখকর সেই অস্বস্তির রেশ এখনো মুছে যায় নি। মনে পড়লেই গালের যেখানে টোল খায় সেই জায়গা দুটো কেমন শুড়শুড় করে।

গালে হাত বুলোতে বুলোতে কাজলের হঠাৎ মনে হল ট্রেনখানা আজ বড় বেশি লেট করছে। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের আলোটা বুঝি কোনো গূঢ় ধ্যানে তন্ময়, বাইরের জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সবুজ হবার কথা ভুলে গেছে। আজ আবার অনিল গিয়েছে বনগাঁয়ে গম ভাঙাতে। ওখানে সস্তা পড়ে। বেচারী ফিরতে পারবে না। হাজার হোক, ছেলেমানুষ ত। মিলন আর বাবা এখন কোন্ ট্রেনে—কোন্‌দিকে কে জানে। কাজলের কেমন সন্দেহ হল, সর্-র্-র্ শব্দ একটা কানে আসছে! না, রেল-লাইনে ত নয়, প্ল্যাটফর্মেই! আর খুব কাছে। শব্দটা হাওয়ার চেয়েও লঘু।

সাপ। বুকের মধ্যে একটু ধড়ফড়ানি তোলপাড় ক'রে উঠতে গিয়েছিল, প্রচণ্ড আত্মশক্তিতে সেটা দাবিয়ে ফেলল। কাজল জানে এখন নড়াচড়া করলেই মনসার বাহন ভয় পেয়ে দংশন করবে। অথচ তুমি যদি পাথরের মতো শক্ত, কিংবা জলের মতো তরল হয়ে পড়তে পারো, তাহলে বিপদ নেই। ঠিক সুন্দরলালের প্রথম দিনের আক্রমণে এই রকম একটা মনোভাব দিয়ে কাজল নিজেকে সামলে রেখেছিল। কাজলের সাপকে ভয় নেই, ভয় ওর নিজেকে। কোন্‌দিন বেসামাল হয়ে সুন্দরলালকে বিগড়ে দেবে আর তখন কিস্তিওয়ালা গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে পথে বার করে দেবে—অন্ধ মতিলাল আর নাবালক দুটো ভাইকে নিয়ে তখন দাঁড়াবার ঠাঁই জোটাতে পারবে না কাজল। সাপটা ওর পা বেয়ে উঠল না, ছোবল দিল না, এমনকি থমকে দাঁড়ালও না,—পায়ের পাতার ওপর দিয়ে কালো বিদ্যুতের মতো পলকের চেয়েও কম সময়ে হিমস্পর্শের রেশ রেখে অন্ধকারে ডুবে গেল। খুব ঠাণ্ডা আর ভীষণ ভারি—কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী একটা দড়ির ঝাপটের মতো ওই মারাত্মক জীবটির গতি। কাজল স্থাণুর মতো স্তব্ধ, নিশ্চল। শাণিত তরোয়ালের খোঁচা কেমন জানে না কাজল, নইলে এরপর কোনো নিভৃত, নিবিড় লগ্নে কিশোরের কাছে বলত—'এমনই যমের অরুচি যে, সাপেও কাটে না।' নিজের এই নিষ্কৃতি ওকে তেমন অবাক করল না, উল্লসিতও করল না। শুধু নিশ্চিন্ত করল—বাস্তু আর বুনো সাপের প্রকৃতি আলাদা নয়।

বলবে, এরকম অভিজ্ঞতার কথা এমনকি সুন্দরলালকেও শোনাবে। সব শুনে হয়ত সুন্দরলাল আফশোস করবে, বলবে—'অলীনটা যে হারামী আছে। নইলে কাজ্‌লী তোর ঘরই তো দিব্যি জ্যায়গা ছিল। ও শালা পুঁচকে বোমা মেরে দিতে পারে। ...তা পারে, অনিলের যা রাগ। অথচ পাড়ারই বলো, আর ট্রেনের প্যাসেঞ্জারই বলো—কেউ সুন্দরলালকে কিছু বলে না। বলবে কী, টিকি কার বাঁধা নেই কিস্তিওয়ালাদের কাছে! অবিশ্যি লোকের সামনে তেমন বেচাল কিছু করে না সে—চোখ বাঁচিয়ে চলে। ওই একটু হাত-টাত ধরা—।

বরং সেদিন কাজলই ওই ময়নাপাড়ার ছিকান্তর ওপর আক্রোশবশে কিশোরের চোখ-মোছানো শেষ হতে তার হাত ধরে মেলায়-কেনা আংটিটা পরিয়ে দিয়ে বলেছিল—বিলাতী মতে হ'ল। হি-হি—।

কিশোর আংটির দিকে তাকিয়ে গাঢ় কণ্ঠে বলেছিল—এইডা কল্লি কী, এই বাঁদরী।

মুকুন্দ হো-হো দিলখোলা হাসিতে কামরার সবাইকে সজাগ এবং কৌতূহলী করে বলেছিল—দে, দে, কিশোইর‍্যা তর হাতের আঙুঠি পরাইয়্যা। আর ভাই চান্দা তুইল্যা পাকস্পর্শের মিষ্টান্ন ভোজ হইব।

ছিকান্ত এবার মুখের রশি ঢিলে করল—হালার ফেরিওয়ালার সংসার—মিনিটে বৌ-পাল্টায়, বর-পাল্টায়।

কাজল আংটির দিকে মোহিত দৃষ্টি ফেলে রেখে আস্তে আস্তে বলেছিল—বড় সুন্দর মানিয়েছে। হাত থেকে খুলতে মানা, খুললেই কিন্তু তোমার কাজলী মরে যাবে।

কিশোরের অত ঘোর-প্যাঁচ নেই। সে শুধু বলল—সেই কিস্তিঅলা যদি দ্যাখে তার দেওয়া আংটি তুই আমায় পরিয়েছিস। সর্বনাশ।

—এ আমার ভালোবাসা। এ কারুর না, মাথা খাও, বিশ্বাস করো—

—বিশ্বাস ?

কিশোরের বিস্মিত দৃষ্টিকে উচ্চকিত করে দিয়ে একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। সংসার ভাঙার পালা—আবার অন্য কামরায় ছিটকে বেরিয়ে পড়ে সবাই শিকারের সন্ধানে। নামা-ওঠা, হাঁকা-হাঁকি, তাড়া-হুড়ো। কিন্তু কিশোরকে ছাড়েনি কাজল—বসো, বিকিকিনি ত রোজই আছে। অনেক কথা আছে।

কিশোর শুধু সমঝে দিয়েছিল—ভালোবাসা-বাসি ভালো না। ওতে মন বড় ভার হয়। তাছাড়া কিস্তিওয়ালা সুন্দরলাল যদি আজ জানতে পারে কাজল প্রেম করছে তাহলে বড় বিপদ হবে।

কেন? কিশোরকে দশ নয়াপয়সা দিয়ে একটা আংটি পরাবার অধিকার কি কাজলের নেই? সুন্দরলাল যা চায় তা পায় না? তবে? ভালোবাসা আলাদা জিনিস, পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।…

পয়সা দিয়ে যা কেনা যায়, পয়সা পেলে যা দেওয়া যায়—তারই লেনদেন চলছে। আর তার ওপরেই মতিলালের পরিবার টিকে আছে।

গাড়িখানা আসবেই। রোজ আসে। রোজ যা যা ঘটে তা-ই ঘটবে। অনেক রাতে কলকাতার দিক থেকে যে ট্রেনখানা জগৎপুরে এসে দাঁড়ায় আজও দাঁড়াবে। লাভের হিসেব আর শ্রান্ত দেহ নিয়ে অনেকগুলি প্রাণী নামবে।

কাজল লক্ষ্য করেছে কিশোরের হাতের আংটিটা কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে

গেছে। ও বলেছিল—ওটা পিতল ফেলে দাও। পয়সা হলে সোনার বানিয়ে দেবো।

কিশোর ধমকায়—ভারি কুটকুটানী। ভালোবাসায় কি পিতল, তামা, সোনা, আলাদা হয় নাকি।

কি সুন্দর কথাটা।

কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল কাজল। ভিজে জামাকাপড়ের ল্যাপ্টানো স্পর্শ মনে হল বড় সুখকর। যেন—

আলোটা হঠাৎ রং বদল করল। সবুজ হয়েছে।

কাজল নিজেকে প্রস্তুত করে। এমন জায়গায় দাঁড়াতে হবে যাতে—এমনভাবে গাড়িতে উঠতে হবে যাতে—অনিলের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে না পড়ে কাজল।

মাথা জোড়া টাক, গায়ে হাত-কাটা মোটা একটা ফতুয়া, পরনের ময়লা, ছেঁড়া কাপড়খানা এমন যত্নসহকারে পরা হয়েছে যেন গরদ বেনারসী পট্টবস্ত্র। লোকটির হাত ধরে একটি বছর দশ-এগারোর সুশ্রী বালক গাড়ির মধ্যে উঠল। বৃদ্ধ লোকটির হাতে ছাতাটা ধরিয়ে দিয়ে ছেলেটি একটু তফাতে দাঁড়াল। চাপা গলায় শুধু বলল—এডা ফার্স্ট ক্লাস।

ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের মাঝামাঝি ফাঁকা জায়গায়টায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ গলা ঝেড়ে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে শুরু করল—আপনাদের কাছে আমার নিবেদন—

বৃদ্ধ ছাতা দিয়ে নিশানা ঠিক করে নিয়ে এগোয়—আমি অন্ধ। জন্মান্ধ নই। ভাগ্যের দয়ায় আমার দৃষ্টি ভগবান ফিরিয়ে নিয়েছেন। ঘরে তিনটি সন্তান। আমার বড়মা-জননীর জন্য একখানা শাড়ী কেনার বড়ই দরকার। আপনারাও সন্তানের পিতা-মাতা-ভ্রাতা। তাদের আহার জোগাবার জন্য আপনাদের মতো আমিও পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ভগবানের দয়ায় কিছু কম করি নাই। কিন্তু আজ তিন বচ্ছর হয়—মা-জননীর জন্যই ভাবনা। আপনাদের দয়ায় অন্ন তবু কষ্টে জুটছে। কিন্তু গিরস্থর দুহিতা ফরক্ পইরা মেমসাহেব—হায় কপাল। আপনাদের দয়ায় য্যান—

ছেলেটা প্রথমে চিনতে পারে নি। মাত্র দুটি যাত্রী ছাড়া কামরায় কেউ নেই। ছেলেটা সসংকোচে তফাতে থাকতে চায়, ভিখারীর সঙ্গী নয় যেন সে। গোটা ট্রেনখানায় শুধু তার বাবার গলা ছাড়া আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

ছেলেটার কী মনে হল একটু এগিয়ে সামনে গিয়ে সন্দেহভঞ্জন করে হাসল। উৎসাহিত হয়ে সে কিছু বলবার আগে কাজল মুখের ওপর তর্জনী তুলে ইশারায় ভাইকে চুপ করতে বলল। সুন্দরলাল ভ্রূকুটি করে পকেটে হাত দিল।

ছেলেটা এবার বড় গলায় বলল—বাবা!

—কী।

—এইখানে কেউ জাগা নাই বাবা, সবাই ঘুমায়া পড়ছে।

মতিলাল বক্তৃতায় ব্রেক কষে কপালের ঘাম মুছল। তারপর আপন মনে বলল—ফাস্ট ক্লাসে ক্যান্ যে ওঠা। হারামীর পুত বাবু হইছে। থার ক্লাসের বাচ্চা, থার ক্লাসে চল্।

গাড়ির গতিবেগ ক্রমেই বাড়তে থাকে। আকাশে এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকে কড়-কড় শব্দে সব কথা ঢেকে দিল।

মুখখানা ভার করে বিণু বলল—আজ আর একটু হলে পুড়ে মরছিলাম। তোমায় কদ্দিন ধরে বলছি সাঁড়াশিটা একটু মেরামত করিয়ে দাও, তা কানেই তোলো না।

অভিরাম বিরক্ত হ'ল—কই কবে আমায় বলেছ?

বিণু ক্ষুন্নকণ্ঠে দাঁতে দাঁত চেপে বলে—বেশ, বলি নি ত বলি নি। যেদিন সত্যি পুড়েমরে—

আর পারা যায় না। অভিরাম ভাবে। ভাবে আর বিরক্ত হয়। জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই তার একার ঘাড়ের ওপর। পাঁচটার সংসারে এতো ঝামেলা পোয়াতে হ'ত না। মাসে মাসে হিসেব মতো টাকাটা বাবার হাতে ধরিয়ে দিলেই ছুটি। আর এই আলাদা বাসা করে বাজারহাট কী না তাকে করতে হয়। বিণুরও দু-বেলা রান্না-বাড়ি, ঘরকন্নার কাজ—ফলে দু'জনেরই অবকাশ ঘুচে গেছে। খরচও বেড়েছে। চিন্তা আরও বেড়েছে। কী লাভ হয়েছে? কার কী সুবিধে হয়েছে। বিণু বলবে, অশান্তি নেই। তা অবিশ্যি নেই। ওর আর কী, হাঁড়ি-হেঁসেল, চাই-নেই, এই নিয়েই দিব্যি থাকতে পারে। জীবনে যেন আর কিছুই করার নেই। অভিরাম বাজার যাবার সময়েই মনে মনে ভেবে রেখেছিল, ছুটির দিনের সকালটা একটু রেওয়াজ করা যাবে। সামনের মাসে রেডিও প্রোগ্রামে যে-যে গান গাইতে হবে সেগুলো একটু ঝালানো দরকার। বিণুর সাঁড়াশি-আক্রমণে তার দফা রফা হল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে হাত বাড়িয়ে বলল—কই দাও, সাঁড়াশিখানা দেবে ত! নাকের ডগায় কামারশালা রয়েছে' নিজেও ত দু-পা গিয়ে ওটা সারিয়ে আনতে পারতে।

বিণু ঝংকার দিয়ে উঠল—ওই নোংরা নর্দমা পেরিয়ে, বস্তীতে গিয়ে—ম্যাগোঃ!

অভিরাম এতে আরও উত্যক্ত বোধ করে—থাক আর নাক-শিঁটকে ঢঙ করতে হবে না। দাও—

—এখুনি। ওটা যে এঁটোর মধ্যে রয়েছে। ওবেলা বরং যেয়ো—

—হয়েছে। দেবে? না আমাকেই খুঁজে নিতে হবে।

স্বামীর মেজাজ দেখে বিণু গজ গজ করে—কোনো কাজ বললেই বাবুর মাথা গরম হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সাঁড়াশিখানার কপালে হাতুড়ির ঘা আর জুটল না। অভিরাম বেজার হয়েই বড়-নর্দমার বুকের ওপর বাঁশের নড়বড়ে সেতুটি পেরিয়ে কামারের বিষণ্ণ ঘরখানায় পেঁছে দেখল লোকটা একাই আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বকছে—আমি পারব না! সে আমি পারব না। কিন্তু ওরা যে বোমা মেরে আমার দোকান উড়িয়ে দেবে বলে গেল। কি হবে?

প্রথমে কিছু মনে হয়নি অভিরামের। এপাড়ায় আজকাল বোমা মারামারির হিড়িক পড়েছে। এই ত দিন কয়েক আগে রাত দুপুরে কী কাণ্ডই হয়ে গেল। হয়ত সেই ব্যাপার নিয়েই লোকটা কিছু ভাবছে! মিনিট দুই দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনলো অভিরাম। কেন না, সেদিনের বোমার হাঙ্গামার সঙ্গে এই বস্তী-বাড়িটার একটা সম্পর্ক রয়েছে—মানে, বোমার এক পক্ষ এই বাড়িরই পিছন দিকে থাকে, অভিরাম শুনেছে।

একটু পরে সে বলল—ও ভাই শুনছো! আমার এই সাঁড়াশিখানা একটু পিটিয়ে দাও!

লোকটা তার কথা কানেই তুলনা না। আপন মনে বকেই চলেছে—ওরে বাবা, ছোরাছুরি বানিয়ে শেষে মরতে যাবো নাকি। বৌ-ছেলে নিয়ে ঘর করি! ওপর থেকে তিনি দেখতে পাচ্ছে না? ছোরা দিয়ে তোরা মানুষ খুন করবি, লুট-পাট ছেনতাই করবি আর রাজ-কামার তোদের হাতিয়ার বানিয়ে দেবে। তারপর? যাদের সর্বনাশ হবে তাদের মা-বোন বাপ-বৌ-এর শাপমন্যির পাপ কা'কে লাগবে। বলি রাজু-কামারের লাগিবে কিনা তাই বল! সেটা আমাকে ব'লে দে!

চিৎকার ক'রে লোকটা এমনভাবে মুখ তুলে চাইল, মনে হ'ল অভিরামের কাছেই সে কৈফিয়ৎ তলব করছে।

এ অবস্থায় কী করবে অভিরাম ভেবে পায় না। তবু বিণুর অসুবিধের

কথা চিন্তা ক'রে সে আর একবার বলল—এই সাঁড়াশির খিলটা একটু পিটিয়ে দেবে ?

কে কার কথা শোনে। লোকটা ডুকরে কেঁদে উঠল—কান্নার ফাঁকে ফাঁকে হেঁচকি তোলার মত থেমে থেমে সে বলতে লাগল।—না, না, আমি পারব নি। তোমার পায়ে ধরছি অশোকদা' ক্ষ্যামা দাও।…হ্যাঁ, তাই তোকে বলতে হবে রাজু। পষ্টা-পষ্টি বলে দিবি আগে যা করিচি-করিচি। তখন ত বিয়ে-থাও করিনি, পাঁচুর মায়ের পেটে পাঁচুও হয়নি। একা ছিলাম, শাপ-মন্যি লাগলে আমাকেই লাগতো। কিন্তু—না, ওরে বাপরে—দুধের বাছা যদি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে।…হ্যাঁ গো, তাই হয়েছিল যে—সেই পীরপুরের হরিপদর বড় ব্যাটা, ইয়া তাগড়া মোষের মতো ব্যাটা ভীম মরল না রক্ত উঠে! ও-হো-হো-হো—

অভিরাম অসহায় ভাবে সাঁড়াশিখানা নিজের সামনে তুলে দেখল। ইচ্ছে হ'ল লোকটার গায়ে ধাক্কা দিয়ে ওর এই ভাব-লাগা দশাটা ঘুচিয়ে দেয়। কিন্তু ভরসা হ'ল না। কামারশালার উনুনে আঁচ কেমন ঝিমিয়ে গেছে, ছাই-এর তলায় হয়ত তখনও কিছু রয়েছে, চুপসে পড়ে থাকা হাপরটার দিকেও চোখ পড়ল, আর উপু হয়ে বসে থাকা লোকটার আশ-পাশে লোহালক্কড় আরও কী-কী যে দেখল অভিরাম পর-মুহূর্তে ভুলে গেল। ওই সবের ওপরে বিণুর অপ্রসন্ন মুখখানা যেন ছায়া ফেলে আড়াল করে দাঁড়াল। অভিরাম হঠাৎ ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল—কী হে, গাঁজাগুলি খেয়ে কি সব বকছ! কাজ করবে না ? দাও-দাও সাঁড়াশির খিলটা একটু পিটিয়ে দাও—

লোকটা চমকে উঠল। একবার সরাসরি অভিরামের মুখের দিকে চাইলও। কিন্তু তার বেশি কিছু লাভ হ'ল না। মাথা নেড়ে সে আবার বিড়-বিড় করে' বকতে শুরু করল। অভিরাম তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পিছন ফিরল। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল বিণুর ওপর। যার কর্ত্রীত্ব করার এত শখ তার যোগ্যতা থাকা উচিত! এর নাম বুঝি প্রেম ? একটা মানুষের ওপর নাগাড়ে হুকুম চালায়, তার যা কিছু সূক্ষ্ম, সুন্দর অনুভূতি সব দুরমুশ ক'রে সংসারের সবার মতো ছাঁচে ফেলে দেওয়ার নামই কি সুখ ?

বড় নর্দমার কালো ঘোলা জলের ওপর থুতু ফেলে সে মন্থর গতিতে পথে নামল। আবার কি মনে ক'রে নর্দমার সেতু দিয়ে পানবিড়ির দোকানে

গিয়ে একটা সিগারেট দিতে বলে, নিতে ভুলে গেল। গোপাল যখন বলল—বাবু সিগ্রেট নেবেন না?

—ও হ্যাঁ! দাও। আচ্ছা এই কামারের কি হয়েছে বল তো?

গোপাল মুরুব্বিআনার সুরে বলে—নেই ত দোকানে! শালা ভুখমারী সকাল থেকে সতের বার খেঁকী কুত্তার মত বাচ্ছাটাকে দেখবার জন্যে ঘরে দৌড়বে তা খদ্দের টিকবে কোথেকে!

অভিরামের কথা শেষ করার ফুরসুৎ না দিয়ে বকতে বকতে গোপাল দোকান থেকে নেমে পড়ল—আপনি এক সেকেন্ড দাঁড়ান বাবু। শালার ছেলে আদর-করা দেখাচ্ছি!

অভিরাম বিব্রত হয়ে পড়ল - আরে না, দোকানেই আছে সে। কিন্তু কাজ করছে না।

আকাশ থেকে পড়ল গোপাল - দোকানে রয়েছে! কিন্তু! মানে আপনার কাজ করবে না? এতবড় আস্পদ্দা! চলুন তো দেখি। শালা ভেবেছে কী! ছেনতাই পার্টির কাজ করিস বলে তোর এত তেল হয়েছে যে, রেডিও আর্টিসের কাজ ছুঁবি নি।

গোপালকে কিছুতেই ঠেকানো গেল না। অভিরামের হাত থেকে সাঁড়াশিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই সে কামারের দোকানের দিকে মারমুখো হয়ে চলল। গোটা ব্যাপারটা অভিরামের কাছে কেমন অস্বস্তিকর লাগে - বছর দেড়েক আগে তার বন্ধু মৃণাল যেন ঠিক এমনি করেই তাকে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। হাসি পেল, এরকম মনে হওয়ার কোনো মানে হয় না, তবু মনে হল। আশ্চর্য, নিজের এই উদ্ভট ধরণের মনে-হওয়ার জন্যে কতোবার আপন মনে হেসেছে। এরকমটা তার হামেশাই হয়। এই জন্যে কতোদিন বিণু তার ওপর...ভাবছিল আর বিড়িওয়ালা গোপালের পিছু পিছু চলছিল 'রেডিও আর্টিস' অভিরাম রক্ষিত।

রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই গোপাল হুংকার ছাড়ল - নেমে আয় শালা! আগে নেমে আয়, বাবুর পায়ে ধরে' ক্ষমা চেয়ে নে রাজুদা'!

রাজু কামার যে গোপালের কথা কানে তুলেছে তা মনেই হ'ল না। অভিরাম ভয় পেয়ে গেছে। শেষে গোপাল হয় ত লোকটাকে মেরেই বসবে। এ পাড়ায় কথায় কথায় সোডার বোতল আর 'পেটো' চলে। তা চলুক। ঠেকাবার

সাধ্যি কারুর নেই। কিন্তু অভিরামকে ঘিরে—ছি-ছি-ছি। সে গোপালের হাত ধরে টানে—আরে ছেড়ে দাও ভাই। ও-বেলা শ্যামবাজার থেকে কিনেই আনবো। একখানা সাঁড়াশির ভারি ত দাম। চলো—

গোপাল ততক্ষণে কামারের দোকানে ঢুকে পড়েছে—শালা এখনো রং-নিয়ে বসে আছো।

এবং পরমুহূর্তে তার একটা ধাক্কায় রাজু কাত হয়ে পড়ে গেল। অভিরাম দৌড়ে গিয়ে গোপালকে চেপে ধরল—এই-এই এসব কি হচ্ছে।

গোপাল তখন ফুঁসছে—শালা ভুখ্‌মারী, আমার সঙ্গে পেঁয়াজী। ওঠ্‌, সিধে হয়ে কাজ কর বলছি!

লোকটা কিন্তু ওই লোহালক্কড়ের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। ওর জ্ঞান-বুদ্ধি সব যেন লোপ পেয়েছে। গড়াতে গড়াতে শেষে উনুনের ওপর গিয়ে পড়তো, অভিরাম 'হাঁ হাঁ' করে ঝুঁকে পড়ে তাকে আটকাতে চেষ্টা করে। লোকটা আর্তনাদ করছে—আমার পাঁচুর মুখ চেয়ে মাপ করো অশোকদা আমি ওসব খুনে-যন্তুর বানাতে পারবো না। মেরে ফেললেও তা রাজু পারবে নি। ও অশোকদা' এসব বে-অন্যেয়ে কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ো না।

অভিরামের কাছে বাধা পেয়ে লোকটা তার পা-জড়িয়ে ধরেছে—ছাড়বো না! তোমার ছিচরণে মাথা কুটে মরবো। অশোকদা' তোমার বাবা কতবড় মানী নোক, আর তুমি গরীবের দুঃখু বুঝবে না!

অভিরাম একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে কাতরভাবে ডাকে—অ গোপাল, এ কী হ'ল।

গোপাল বিজ্ঞভাবে বলে—আপনি সরে আসুন। বুঝিচি। শালা সকাল বেলায় নিশা-বিড়ি টেনে বুঁদ্‌ হয়ে আছে। বাড়ি যান, ওর ঘোর কাটুক—সাঁড়াশি সারিয়ে ও-শালাই আপনাকে দিয়ে আসবে। খবরদার শালাকে এক পয়সা দেবেন না।

—কিন্তু সরবো কি, পা—

—লাথি মারুন।

ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে অভিরাম গোপালের দিকে তাকায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে

সে মাথা নাড়ে—কী ফ্যাসাদেই পড়েচি। ওহে ও রাজু পা ছাড়ো—

অনেক কসরৎ ক'রে পা দু'খানা খালাস ক'রে নিয়ে অভিরাম সিগারেট টানতে টানতে মুহূর্তের মধ্যে নর্দমার বুকের ওপর সেতুতে এসে দাঁড়াল।

গোপাল বলল—এ বস্তীর দস্তুরই এই। বৌটা ঝি-গিরি করবে পরের বাড়ি আর জানোয়ারগুলো গাঁজা-গুলী খাবে, বছর-বছর বাচ্চা হবে। রাজুদা কিন্তু এমন ছিল না—

শেষ কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা সমবেদনার সুর শোনে অভিরাম।

॥ দুই ॥

একখানা ভাঙা সাঁড়াশি যে এত ঝামেলা পাকাতে পারে অভিরাম তা কল্পনাই করতে পারে নি। দুদিনেই ওটার কথা সে ভুলে গিয়েছিল। বিণুও আর উচ্চবাচ্য করে নি কদিনের মধ্যে। কিন্তু অফিস যাবার পথে সেদিন গোপালের দোকানে পান কিনতে গিয়েই ফ্যাসাদ হ'ল। কতকটা তিরস্কারের ভংগীতেই গোপাল বলল—আচ্ছা ভুলো মানুষ ত আপনি। সাঁড়াশিটার কি হ'ল খোঁজও করলেন না?

জিভ্ কেটে অভিরাম বলল—দাও-দাও হাতে খানিকটা সময় আছে, বাড়ি দিয়ে আসি!

—আরে সারানো হ'লে কি আর পড়ে' থাকতো?

—আপদ গিয়েছে। ফিরতি পথে মনে ক'রে আজই একটা কিনে আনতে হবে।

গোপালের যেন পান সাজতে মনই নেই এমনিভাবে সে উদাস হয়ে বসে রইল। তার দীর্ঘশ্বাসে অভিরাম আশ্বস্ত বোধ করে। সেই সংগে আশা করে এবার গোপাল কাজে হাত দেবে। কিন্তু তার উৎসুক দৃষ্টিকে উচ্চকিত ক'রে গোপাল বলল—জানেন, রাজু কামার সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। আমি তখনই আন্‌দাজ ক'রেছিলুম এর মধ্যে একটা বিকজ্ রয়েছে। নইলে, রাজুদার মতো সাচ্চা লোক, সে কেনই বা নিশার বিড়ি

খেতে যাবে আর যদি খেয়েই থাকে ত তাতে অমনটাই বা হবে কেন! আরে আপনি ত সেদিন চলে গেলেন সাঁড়াশি গছিয়ে দিয়ে। (অভিরামের মনে ছিল, গোপালই জোর ক'রে ওটা রেখেছিল। কিন্তু গোপাল যে-ভাবে কথা বলছে তাতে বাধা দিতে ইচ্ছে করল না।) তারপর ওর ঘাড় ধরে টেনে নিযে গিয়ে দিলাম চ্যান্ করিয়ে, যাঃ শালা তোর শখের ক্যাঁতায় আগুন পড়ুক। কিন্তু দাদা, সেই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল সাঁপ—একেবারে কাল্-সাঁপ।

গোপাল যাত্রাদলে অভিনয় করে। তার কথার মধ্যে অতিনাটকীয় ভাবভঙ্গী অভিরামের আপিসের তাড়া ভুলিয়েই দিয়েছিল। মাঝখানে বাধা পড়ল, একটি দেড়-হাত সাইজের বাচ্চা অস্বাভাবিক হেঁড়ে গলায় (যেন অভিরামের পকেটের তলা থেকে ফুঁড়ে আওয়াজটা আসছে) বলল—এ গোপালদা' বাবাকে নালসুতোর বিড়ি দশ নয়ার দাও—!

তাকে ধম্‌কে থামিয়ে দিল গোপাল—থাম্! ব্যাটা, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছে। হুঁঃ, বাবুকে আগে পান দেবো, তারপর ত—(সেই টানেই) বুইলেন দাদা, শালা তুই ভুখ্‌মারী, তোর অতো ধম্ম-বিচার করতে গেলে চলে?

এবার অভিরাম ঘড়িটা একটু বেশি উঁচু করে হাত তুলে দেখল। ইঙ্গিতটা গোপালের বুঝতে দেরি হল না। সে পানের বোঁটা ছাঁটতে ছাঁটতে বলল—ওই আপনাদের অলকবাবুর মস্তান ব্যাটা অশোকই হল যত সব্বনাশের গোড়া। ওদের কাণ্ড-কারখানা জানতে ত কারুর বাকী নেই! অলকবাবু লীডার বলে তার ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে হাজত থেকে ছাড়া পায় —এই ত অবস্থা—দেশে ধম্ম, বিচার বলে কিছু আছে—(পান সাজা হয়ে গেল। কিন্তু গোপাল সেটা দিল না।) বলুন দাদা আপনিই বলুন—বলে কি না ছোরা তৈরী করে দাও—কালই চাই। তা রাজু বলেছে 'পারব না!' এই তার অপরাধ। অশোক গুণ্ডা তড়পেছে, টাইমে মাল রেডী না পেলে বোমা মেরে রাজুর দোকান উড়িয়ে দেবে। বলুন দেখি কত বড় বেঅন্যেয়ে আবদার! বেচারা রাজু কারু সাতে-পাঁচে থাকে না, ভালোমানুষ

লোক। ও পড়ে গেল রাম ফাঁপরে—আজ ক-দিন ধন্দ মেরে বসে থাকে আর থেকে থেকে চিক্‌রে ছাড়ে, ওরে বাবা বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, আমাকে মেরে ফেলবে। আমার পাঁচুর কি হবে?···আবার কখনো বিড়্‌-বিড়্‌ করে পারব না, সে আমি পারব না খুনে যন্তর তৈরী করলে পাঁচু আমার মরে যাবে!—বুঝুন ব্যাপার! লোকটা একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে গিয়েচে! বলতে বলতে গোপালের চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল।

এদিকে অপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। বাসে ঝুলে যাবারও ঠাঁই জুটবে না। কোথায় হাতে একটু সময় নিয়ে বেরিয়েছিল অভিরাম, পান চিবোতে চিবোতে আরাম করে বসে যাবে! মনে মনে ছটফট করলেও মুখে কিছু বলতে পারে নি। বিবেকের ছিটেফোঁটা এখনো বোধহয় টিকে রয়েছে, তাই ধৈর্য ধরে পরের দুর্দশার কথাটা না শুনে পারে নি। কিন্তু এই মুহূর্তে, গোপাল যখন তার হাতে পানের খিলিটা ধরিয়ে দিল তখন অভিরাম আরও মুশ্কিলে পড়ে গেল। এতক্ষণ সে শুধু মুখ বুজে শুনেই গেছে এখন কিছু বলা উচিত—কিন্তু কী বলবে! কথা খুঁজে পাচ্ছে না—তার চেয়েও বড় কথা, সেদিনের সেই কামারশালার দৃশ্যগুলো ছবি হয়ে তার মানসপটে ভেসে বেড়াচ্ছে। অভিরামের কেবলই মনে হচ্ছে লোকটার পাগল হয়ে যাওয়ার জন্যে সে-ও দায়ী!

এই অস্বস্তিকর শাস্তি থেকে গোপালই তাকে উদ্ধার করল—ভেবে আর কি করবেন বলুন দাদা। যান অপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

অব্যাহতি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অভিরাম পানটা গালে গুঁজে বলল—তা বটে। ভেবে কিছুই করার নেই। কিন্তু এই দুদিনে একটা লোক পাগল হয়ে গেল চোখের সামনে—ভাবতেই কিরকম লাগে!

দেড়-হাত লম্বা ব্যক্তিটি অকস্মাৎ আলোচনায় যোগ দিয়ে মুরুব্বির মতো বলল—পেঁচোর বাবা না আখুন উটুনে লাচ করছে জানো গোপালদা'!

গোপাল ধমকে উঠল—লাচ্‌ কচ্চে বেশ কচ্চে, তোর বাপের কি রে—

এই নে বিড়ি নিয়ে দূর হ।

ছেলেটা এমন মজাদার খবর দিয়ে বাহবার বদলে খিঁচুনি খেয়ে দমে গেল। তার হাতে বিড়ি দিতে দিতে গোপাল আর-এক পশলা গাল পাড়ল —খবরদার তোমরা যদি ফের ওর পেছনে লেগেছ ত জ্যান্ত পুঁতে ফেলব —হাঁ! শালা তামাশা পেয়েছে সব।

অভিরাম বিমর্ষভাবে পুঁচকে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই অবস্থায় তার কানে গেল—লোকটা পাগল হয়েছে, যেন ভারি মজা হয়েছে! কী সব জানোয়ার! বুড়ো-বুড়ো লোকগুলো পর্যন্ত রগড় করে!

অকারণেই অভিরাম অপিসে সেই পাগল লোকটার কথা ভাবল। ভাবলো বেশি করে পাঁচুর কথা, যাকে সে চোখেও দ্যাখে নি। কোনো কাজে মন দিতে পারল না। তার পাশে যে বুড়ো গাঙ্গুলী বসেন তিনি খোঁচাখুঁচি করলেন—বৌ এর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?··· পকেট মার গিয়েছে?··· বাবার অসুখ?··· ইত্যাদি যতো রকমের দুশ্চিন্তার কারণ থাকতে পারে একে-একে টোপের মতো ছুঁড়তে লাগলেন। শেষে বললেন—'তাহলে এ্যামিবায়োসিস!' অভিরাম হাল ছেড়ে দিয়ে শেষের কারণটাই মেনে নিল। কেন না একটা পাগলের জন্যে মন খারাপ করা এ অপিসে বেমানান। বেমানান তার কারণ, এখানে সুস্থ-মগজের লোক খুব বেশি নেই। বছরে গড়ে দুটো লোক পাগল হয়ে যায়। এইসব শিক্ষিত পাগলের একটা কাব্যিক নাম আছে 'ফ্রাস্ট্রেশন'। কেউ বা অনেক উন্নতির আশা নিয়ে আসে আর ঘষটে-ঘষটে দু-এক ধাপ উঠেই আটকে যায়! কেউ বা তার কলিগ্ কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে ধাক্কা খায়। কেউ হয়ত আর্থিক সমস্যা নিবাকরণে অক্ষম হয়। মোট কথা, পাগল হবেই দু-একজন। তারপর মেডিক্যাল লীভ নিয়ে, শক্ খেয়ে খানিকটা মেরামত হয়ে আপিসে ফিরে আসবে। কাজ করবে কিম্বা করবে না। সরকারী চাকরীর এই একটা সুবিধে—সহজে যায় না। বাড়াবাড়ি হলে আবার ছুটি নাও। কাজেই অভিরাম ভরসা করে বলতে পারে না রাজু কামারের কথা। তা ছাড়া তার নিজেরই ব্যাপারটা খারাপ লাগছে। অনেক কষ্টে মন থেকে ওই ছেঁদো ভাবনার ছেঁড়া কাঁথাটা টান

মেরে ফেলে দিল। দিতে পারল অঞ্জনার সঙ্গে গল্প করে। অঞ্জনা বিল সেকশনের মেয়ে। এসেছিল ইউনিয়নের বিষয়ে পরামর্শ করতে। তা থেকে উঠে পড়ল ওদের ড্রামা গ্রুপের কথা। অভিরাম কেন আসছে না ওদের দলে। তার মতো একটা ভার্সেটাইল গুণের যুবক শুধু কেরানিগিরিতে পার্টস নষ্ট করছে দেখে অঞ্জনার খারাপ লাগে।...মোট কথা বিকেলের দিকে অভিরামকে চাঙ্গা দেখে গাঙ্গুলীমশাই চোখ কুঁচকে স্বগতভাবে বললেন — আরে ও দুটোই এক।

অভিরাম তখন জরুরী কাজটুকু সারতে ব্যস্ত ছিল। একবার চোখ তুলে জিগ্যেস করল—আমাকে কিছু বলছেন ?

—না।

পিঁপড়ের সারির মতো অঙ্কের দিকে তাকিয়ে অভিরাম আবার কাজে মন দিল। কিন্তু তার কানে ঠিকই গেল—বুঝলে দত্ত, এ্যামিবায়োসিস আর ফেমিনায়োসিস দুটোই এক।

দত্ত উচ্চকণ্ঠে তারিফের বটুয়া খুলে বলল—কী! পান চাই বুঝি। কার আবার ফেমিনায়োসিস হল দাদা ?

—ও ভাই কখন কার হয় বলা কি যায়! আর এ রোগের মজাই হল, পাগলের মতো রোগী নিজে টের পায় না।

অভিরাম ঘাড় গুঁজে নিজের কাজ করে গেল। না, কাজ ঠিক করে নি সে, কেন না কান খাড়া রেখে সব কথাই শুনছিল—কিন্তু বুড়োদের ওই পানসে রসিকতা তার পছন্দ নয়, তা ছাড়া কাজে মন দেবার ইচ্ছেটাও তার ষোল আনাই ছিল। ঘাড় গুঁজে কাজের চেষ্টায় একটা সুফল হল—আজ ফিরে গিয়ে গোপালকে রাজুর শক্‌ট্রিট্‌মেন্টের পরামর্শ দেবে। সেরে যাবে মনে হয়। কিন্তু গোপাল যদি এগিয়ে না আসে। সে যদি বলে, রাজু তার কে ? অভিরামের যদি অতোই মাথাব্যথা তবে সে-ই ঝুঁকিট নিক্‌গে যাক। নাঃ, তা বলবে না। গোপাল কিছুতেই পারবে না। কেন পারবে না তা অভিরাম জানে না—তবু তার দৃঢ়বিশ্বাস গোপাল সে প্রকৃতির নয়। তা

ছাড়া, গোপাল যে রাজুর এক বস্তীর ভাড়াটে। আচ্ছা, অঞ্জনা যে তার ভার্সেটাইল গুণের কথা বলল, সেটা মন থেকে বলল—না, মন-রাখার জন্যে বলল? যাক, বলেছে ত। আর মিছে কিছু ত বলে নি। কিন্তু বিণু ত কই বলে না! আগে আগে বলতো, আজকাল যেন— ।

॥ তিন ॥

কোনো লাভ হয় নি। না, রাজুর কামারশালা বোমা মেরে উড়িয়েও কেউ দেয় নি। দোকানটা নতুন মাটির পোঁচড়া দিয়ে অন্য ভাড়াটে নিয়ে ঘুড়ি আর লাড্ডু সাজিয়ে বসেছে। আর রাজু কামার এখন পাকাপোক্ত পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে নিয়ে রং-তামাশা করে বস্তীর ছেলেমেয়ের পাল। অভিরামের পরামর্শ এবং পত্র নিয়ে গোপাল একদিন হাসপাতালে রাজুকে সঙ্গে করে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। কি করে হবে? যে চেয়ারে বসিয়ে শক্ দেওয়া হয় সেটাতে একবার শক্ খেয়ে সেই যে লাফ দিয়ে 'বাপ্' বলে মাটিতে পড়ল রাজু, তারপর আর তাকে দ্বিতীয়বার চেয়ারে বসানো গেল না। ভূতের চেয়ারে সে বসবে না! অনেক কায়দাকানুন করেও কিছু সুবিধে হয় নি। তারপর কামেশ্বরপুরের সিদ্ধবাবার কাছ থেকে পাগলের-বালা এনে পরিয়েও কোনো ফল হয় নি। এত খবর অভিরামের জানবার কথা নয় কিন্তু গোপাল তাকে না শুনিয়ে ছাড়ে না। আজকাল পারতপক্ষে গোপালের দোকানে ওই জন্যেই যায় না অভিরাম। রোজ রোজ অন্যের দুঃখের একঘেয়ে কাহিনী শুনতে কারই বা ভালো লাগে! সে যখন কিছু করতেই পারবে না তখন শুধু শুধু বিড়ম্বনা বাড়িয়ে কীই বা লাভ।

ক'দিন আগেই ইলেকট্রিকের তার কেটে নেবার ফলে সন্ধ্যের পর রাস্তাটা অন্ধকারই থাকে, কাজেই ফেরার সময়ে চক্ষুলজ্জার হাঙ্গামা পোহাতে হয় না।

সেদিনও আঁধারেই ফিরছিল অভিরাম। একটা জায়গায় হৈ-হল্লা আর লোকের ভিড় দেখে একটু থমকে দাঁড়াতে হল। দিনকাল যা পড়েছে তাতে হুঁশিয়ার হয়ে পা বাড়াতে হয়—তা সে পাড়াই হোক বেপাড়াই হোক। একটু লক্ষ্য করে বোঝা গেল, তেমন কিছু নয় রাজু পাগলার পিছনে চ্যাংড়ার

দল লেগেছে। পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে একেবারে গোপালের মুখোমুখি পড়তে হল। আঁধারের মধ্যে গোপাল তখন ফেউ তাড়ানোর মতো এলোপাতাড়ি গামছার বাড়ি মারছিল আর গাল পাড়ছিল। মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমন হয় বাচ্ছা-বাচ্ছা ছেলেমেয়েরা তেমনি ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, পথে আর চলার উপায় রাখছে না। আর দূর থেকে চেঁচাচ্ছে 'এই পাগল ছোরা বানাবি—ছোরা বানাবি এই পাগল!' অভিরাম চেষ্টা করে না এগোবার। কার ঘাড়ে পা দিয়ে ফ্যাসাদ বাধাবে। রাজু পাগলা বিড়বিড় করে কিছু নিশ্চয় বলছে কিন্তু তা ওই হট্টগোলে শোনা যাচ্ছে না।

গোপালের গালাগাল আর গামছা-আস্ফালন হঠাৎ থেমে গেল। ছেলে-মেয়েরা সুযোগ পেয়ে আবার পাগলের কাছে আসতে লাগল। একটু ফাঁক পেয়ে অভিরাম এগোলো। নজরটা অবাধ্য ও পঙ্গপালের মতোই তারও গোপালের ওপর পড়ল। আর সব জায়গায়ই ত বস্তীর চ্যাংড়াদের দ্বারা ঘেরাও, শুধু গোপালের আশ-পাশ ফাঁকা। অগত্যা অভিরাম মনকে তৈরি করে নিয়েই এগোয়। কী করবে, এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে না হয় দুটো কথাই শুনবে। নিজে থেকেই কথা বলবে সে!

প্রস্তুত থাকলেও সে এতখানি বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

—কী গোপাল। তোমার এক কাজ হয়েছে ভালো—এ্যাঁ!

অভিরাম কথা না বললে হয়ত গোপাল লক্ষ্যই করত না। তার কথা থেকেই বোঝা গেল—কে?

একটা পুঁচকে ছেলের কান ধরে গোপাল ওপর দিকে চাইল—ও দাদাবাবু! আর বলেন ক্যানো, কাণ্ড দেখুন এই বাচ্ছাটাও বাপের পেছনে লেগেছে।

অভিরামকে কিছু বলতে হল না গোপালই ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—এ্যাই, এই দেখুন রাজুদার ছেলে পাঁচু। আরে হতভাগা বাবাকে পাগল বলতে নাই।

ছেলেটা গোপালের গালে চড় বসিয়ে দিল—না, না, ও বাবা না—ও পাগল। আঃ, লাগে, ছালো, বলছি, এঃ—এঃ—এঃ ছালো।

গোপাল ছেলেটাকে ছাড়তে নারাজ, অভিরামকেও ছাড়তে চায় না সে। পরাভূত সেনাপতির মতো হতাশ সুরে সে বলে—এর কী বিহিত করি বলুন

তো দাদাবাবু।

উল্টোদিক থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে একখানা গাড়ি আসছে। সেই আলোতে অভিরামের মনে হল গোপাল যেন কাঁদছে। আর কিছু খুঁজে না পেয়ে সে গোপালের হাত ধরে বলল—সরে এস।

বাচ্ছাটা তখনো গজরাচ্ছে—ছালো—পাগল আমাল বাবা না।… গোপালের কোলে থেকেই ওই অবস্থাতে সে অন্যের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে চিৎকার করে…'এই পাগল তুই ছোলা কিব…ছোলা।'

॥ ছয় ॥

কথা ছিল সরস্বতী পুজোতে নাটকটা মঞ্চস্থ করা হবে। কথা মতো সব হয় না। অতএব—। তবে সরকারী পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের মতো সরস্বতী পুজোর তারিখ ত আর সরানোর উপায় নেই। অতএব নাটক বাদ দিয়েই ক্লাবের সরস্বতী পুজো হচ্ছে। অবশ্য নাটকের পূর্ণাঙ্গ রিহার্সালও এই দিনে হবার কথা আছে—। অন্তত সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে আলাপ-আলোচনা করা যাবে। আর নাটকখানা এতোকাল ধরে যেমনভাবে অভিনীত হচ্ছিল তার সঙ্গে আরও কিছু কিছু জুড়ে নূতনত্বের আল্পনায় রঞ্জিত করা যায় কি না তাও দেখা যাবে। যুব সংঘের ছোট ঘরখানায় জোয়ার-ভাটার মতো সভ্যেরা যাতায়াত করছে।—'কই, তিনি এখনো এলেন না?' কখনো কলকণ্ঠে কোনো রমা বা মানিক বলে—'ওদিকে পুজোপ্যাণ্ডেলে কাজ রয়েছে, চলি অলকদা, উনি এলে খবর দিয়ো কিন্তু।' মক্ষিরানীর সঙ্গে আবীর, ছোটু ইত্যাদি চুলবুলে ছোকরারাও হাওয়া হয়ে গেল। নিতান্ত নাট্যোৎসাহীরা মুখ চুন করে অপেক্ষারত। রিহার্সালটাও বুঝি মোশান মাস্টারের গরহাজিরার জন্যে নাকচ হয়ে যায়। হয়ত বা তিনি—। মামুলি আলাপেও তেমন গরজ নেই কারুর। সিগারেট, খবরের কাগজে মন দিয়ে সময় কাটাচ্ছে।

সবই কেমন ফিকে। একঘেয়ে।…মাইকের আওয়াজে ভেসে আসছে হিন্দী সংগীত।

এমন সময়ে রবিদার গলা শোনা গেল।

বিশু বলল—রবিদাকে নিয়েই না হয় আরম্ভ করা যাক।

হেমন্ত সায় দিল—তা আর বলতে। আমি ত আগেই বাত্লেছিলুম। বড় বড় স্পেশ্যালিস্টের ল্যাজ ভারী, কী দরকার ওসব পাঁয়তারায়—

হয়ত আরও কিছু বলতে হেমন্ত। কিন্তু বাধা পড়ল। রবি রায় ঘরে গা দিয়েই স্বভাবসিদ্ধ হাসি বিলেয়ে প্রশ্ন করে—'কই, আর সব কোথায়!' উত্তরের অপেক্ষা রাখে না সে, একটু মেজাজ দেখিয়ে বলল—'এই রকমটাই

আশা করেছিলাম।'

তার সঙ্গী ভদ্রলোক খুব কুণ্ঠিত স্বরে বলে—'যাঃ রবি কী হচ্ছে। আমাদেরই ত দেরি হয়েছে। শুধু শুধু দুষছো কেন এঁদের। কোথায় ছটায় আসার কথা, এখন আটটা দশ।' কব্জির ঘড়িতে চোখ রাখেন তিনি।

অলক ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়—আরে আসুন—আসুন। বসুন দেবেন-বাবু। আজ আমাদের কত সৌভাগ্য—

বিশু এবং ঘরের আর পাঁচজন যুবক, সকলেই দেবেন দাসকে অভ্যর্থনা জানাতে সতরঞ্জির উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেউ বলল—'পথ-ঘাটের যা অবস্থা তাতে শেষ পর্যন্ত'—কেউ বা দেবেন দাসের জন্য চায়ের অর্ডার হাঁকলো। কেউ বলল 'প্লীজ, আপনারা বসুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাইকে ধরে আনছি পুজো প্যাণ্ডাল থেকে।'

দেবেন ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বিব্রত ভঙ্গীতে হাসলেন—আরে, কাণ্ড। আপনারা সবাই দাঁড়িয়ে? বসুন—বসুন—।

অলক বলল—আমরা ত আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। অবিশ্যি আজকের দিনে আপনার মতো 'বীজি' মানুষকে পাওয়া—নেহাৎ রবি ভরসা দিয়েছিল—

দেবেন ঘাড় নেড়ে কিসের যেন প্রতিবাদ করেন—আরে কাণ্ড! কী বলেন—! রবির কোনো দোষ নেই। দেরিও হত না। ঠিক সময়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা। ফড়েপুকুরে একটা কাজে দেরি হয়ে গেল। কাজ মানে তেমন কিছু নয়, এই ইয়ে—

—নিশ্চয়—নিশ্চয় কাজ ত আগে করতেই হবে। আমাদের ত নেহাৎ রিক্রিয়েশন—

অলকের এ কথায় দেবেন হো-হো করে এমনভাবে হাসলেন যে উপস্থিত সকলে চমকে উঠল। দেবেন বললেন—আরে কাণ্ড, কাজটাও আমার রিক্রিয়েশন মশাই মানে, কয়েকটা সাউণ্ড হলে রি-টেপ করতে আর কতোই সময় লাগতো —ঝড় আছে, মিছিলের শব্দ আছে আবার পাখির ডাক, এইরকম টুক-টাক সব জড়িয়ে সাত রকমের সাউণ্ড। যাক গে, ওসব । এমনিই দেরি করে ফেলেছি আর নয়। এবার চটপট শুরু করে দেওয়া যাক।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ! গলাটা ভিজিয়ে নিন। তা করতে, ওরাও পুজা প্যাণ্ডাল থেকে এসে পড়বে। এই বিশু—কি রে

বিশু যদিও গোড়াতেই সভ্য-সভ্যাদের ডাকতে যাবার জন্য ব্যস্ততা

দেখিয়েছিল, এখন আসরে দেবেনের কথাগুলো হাঁ-করে গিলতে গিলতে সে কথা একদম হজম করে ফেলেছে। অলকের খোঁচা খেয়ে জিভ কেটে 'ইন এ মোমেণ্ট' উচ্চারণ করে দৌড়বার ভঙ্গিতে উধাও হ'ল।

রবি রায় চারমিনারের প্যাকেট বার ক'রে দেবেনের সামনে এগিয়ে দিতেই মুখখানা উজ্জ্বল হযে ওঠে এবং দেবেন 'রাইট' বলে হাসির পালা শেষ করে কাজের লাটাই ধরলেন। 'আসতে আসতে পথে রবি যে আইডিয়াটা দিয়েছে সেটা খুব ভালো' মানে আমার ত খুবই ভালো লেগেছে। অবিশ্যি আপনাদের কেমন লাগবে জানি না—'

—কি, কী বলছেন, রবিদা ?

দেবেন সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে সবশেষে সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে অলকের ওপর চোখ রাখলেন—আপনাদের পাড়াটা ত কট্টর দক্ষিণপন্থী তাই—মানে—

অলক জবাব দিল—হ্যাঁ পোলিটিক্যাল ফিল্ডে এখন সব পাড়াই ত তাই। তবে ক্লাবে আমরা সবাই আলাদা ইউনিট। এই দরজায় রাজনীতি ঢুকতে দেওয়া হয় না। ব্যক্তিগত মতামত যার যার নিজস্ব ব্যাপার—।

কথাটা দেবেনের কাছে কতখানি গ্রহণযোগ্য মনে হ'ল তা বোঝা গেল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন—তাও কি সম্ভব ? যাক সম্ভব হ'লেই ভালো। হ্যাঁ যা বলতে যাচ্ছিলাম। আপনারা চাইছেন নতুন কিছু করতে। তা সেটা একেবারে গোড়াতেই, মানে ড্রামাকে ডিস্টার্ব না করেও করা যায়। যেমন ধরুন প্রথমে স্টেজটা অন্ধকার থাকবে, সেই অন্ধকারের মধ্যে অডিটোরিয়াম থেকে একটি লোককে স্টেজের সামনের দিক থেকে, তার মানে দর্শকের দিকে পিছন ক'রে মাঝ বরাবর সিঁড়ি দিয়ে—

এই পর্যন্ত ব'লেই দেবেন থমকে থামলেন এবং খেদের সুরে বললেন—আরে ক্কাণ্ড, এটা যে রবির আইডিয়া, আমি কেন, রবি তুমিই বলো না—সেটাই ভালো হবে।

—পাগল না কি ! আপনার কনসেপশনের ধারে-কাছে আমি কেন, কলকাতা শহরে পেঁছিতে পারে এমন জায়ান্ট দেখি না ত ! খামাখো রবি রায়কে গ্যাস দিয়ে ল্যাং মারছেন কেন দাদা !

পোড়া কেৎলী আর কতকগুলো মাটির ভাঁড় হাতে বছর বারোর একটি মেয়ে এল। জনে জনে চা বিলি হ'ল।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম—লোকটার ঘাড়ে একটা আস্ত লাইট-পোস্ট। লোকটার কাঁধের লাইট পোস্টে আলো জ্বলছে। লাইটিং-এর বন্দোবস্ত এমন ভাবে রাখা হবে যাতে অডিয়েন্স শুধু ল্যাম্পপোস্টওয়ালাকেই দেখতে পাবে। লোকটি স্টেজে উঠে পোস্টটাকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে, এবার দর্শকদের দিকে ঘুরে একটু হেসে মাথা নাড়বে এবং বলবে—'আপনারা যা ভাবছেন আমি কিন্তু তা নই। না, না অভিনেতা নই। এখানে কাজ করি, মানে এই ল্যাম্পপোস্টটা স্টেজে তুলে দেওয়াই আমার ডিউটি। মালিকরা হুকুম ক'রে বললেন, ওপরে যাও, ওখানে যাঁরা আছেন তাঁরা যেভাবে বলবেন ঠিক সেইভাবে এটা বসিয়ে দেবে। কিন্তু—কারুর পাত্তা নেই। বলি কাকে? এখন আমি করি কী। এটা কিভাবে রাখি? আলোটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? এই আলোতে চারটে পথ ডানদিকে হ'ল বড়লোক সরণি, তার উল্টো দিকে, মানে বাঁদিকে হ'ল গরীব সরণি, পুবের পথটা চলে গিয়েছে মধ্যবিত্ত সরণিতে আর ওই পশ্চিমে মহাপ্রস্থানের পথ। দেখুন ত আলোটা ঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে কি না? নাঃ, মনে হচ্ছে আপনারা আমাকে হদিস দিতে রাজি নন।'

ঘরের সকলেই মন দিয়ে দেবেনের কথা শুনছিল। রবি স্মরণ করিয়ে দিল,—দেবুদা আপনার চা কিন্তু জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।

ও, হ্যাঁ।

একটা চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা হাতে ধরেই দেবেন আবার শুরু করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে অলক বলল—মাফ করবেন দেবেনদা, আমায় যদি মিনিট কয়েকের জন্যে ছেড়ে দেন ত ভালো হয়।

দেবেন একটু অবাক হলেন—আমি ছেড়ে দেবো মানে?

—মানে, যাবার ইচ্ছে মোটেই নেই, এমন চমৎকার আপনার কল্পনাশক্তি যে, অসাধারণ বললে কিছুই বোঝানো হয় না, মাঝপথে ছেড়ে যাওয়া ত লোকসান তবু উপায় নেই—। যা দিনকাল পড়েছে এখন ছাই দেখলেও উড়িয়ে-সরিয়ে দেখতে হয়, রতন না পাওয়া যাক অন্তত দু-এক টুকরো কয়লা ত পাওয়া যেতে পারে। তা-ই বা কম কী।

অলকের কথাটা শুনে দেবেন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন—বাঃ, সুন্দর বলেছেন ত, ফাইন। কয়লা মানে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড।

রবি প্রশ্ন করে—হন্তদন্ত হয়ে রাত দুপুরে কোথায় যাচ্ছ?

অলক মুখ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল—জনৈক হরিদাস পালের কাছে, তিনি রাত ঠিক নটার সময়ে যেতে বলেছেন, সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে যদি মিনিস্টার মশাই এসে পড়েন ওঁর বাড়িতে ত—মানে…

মাধব মাঝে পড়ে অলকের ত্রাতা হ'ল—থাক আর দরকার নেই তোমার শুনে রবিদা। অলকদাকে আটকে শুধু শুধু ইয়ে করা।

দেবেনের দিকে তাকিয়ে অলক অসহায় হাসি হেসে অর্ধস্বগত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে সাইকেল নিয়ে যাবো আর আসবো। চাকরি-বাকরি একটা না জোটাতে পারলে—ইয়ে—

মাধব হাঁ হাঁ ক'রে উঠল—খবরদার সাইকেল নিয়ে ওখানে যেয়ো না। উনি ঠিক কাজের ফরমাস দিয়ে বসবেন। উঃ সেদিন আমার যা নাকাল হয়েছিল।

হাতঘড়ির দিকে চোখ রেখে দেবেন তাগাদা দিলেন—আর এক সেকেণ্ডও আপনার দেরি করা উচিত হবে না। উইশ ইউ সাকসেস।

অলক যাবার পরই ঘরখানা কেমন যেন মিইয়ে গেল।

রবি চাঙ্গা করতে চাইল—আচ্ছা, কাজের কথায় ফিরে আসা যাক দেবেনদা।

মাধবও সায় দিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবেনদাকে আবার কবে পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই—

রবি টিপ্পনি কাটে—সবাই তা বোঝে কই! অলকদার কি আজই না গেলে চলত না! আরে বাবা এম এল এ তো পাড়ার লোক—তার চামচাগিরির জন্যে যথেষ্ট সময় রয়েছে বাবা। আমারই কি কাজ কিছু কম ছিল নাকি—। সবাইকে চাকরি দিচ্ছেন উনি, হুঁঃ!

—রবি বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কী? শুনলে চাকরির ব্যাপার! বলা যায় না, কার ভাগ্যে কি আছে।

রবি হাসল এবং বেশ মুন্সিয়ানার ভঙ্গিতে জবাব দিল—আচ্ছা বেশ, ওর নয় চাকরির ব্যাপার। কিন্তু আরও যারা অ্যাবসেণ্ট, তাদের? আবীর, ছোটু, রমা, মুকুল, সন্দীপ? বিশুটাও সেই যে গেছে অগস্ত্য যাত্রা। যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই এমনভাবে ফুল রিহার্সাল হয় নাকি। গরজটা আমাদের না, যে-ভদ্রলোকের কাজের ক্ষতি করিয়ে টেনে আনা হয়েছে তাঁর?

মাধব ব্যস্ত হয়ে ওঠে—সত্যি! সত্যি বিশুটার কী হল? ধুনুচি নাচের খপ্পরে পড়ল নাকি! যাই আমিই—

রবির মেজাজ যেন বেসামাল হয়। সে দাঁতে দাঁত চেপে গজরে ওঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও তুমিই বা বাদ থাকো কেন।

দেবেন ধমক দিলেন—'এই রবি কী ছেলেমানুষী হচ্ছে!' নিজের কথায় নিজেই যেন মজা পেয়ে হেসে উঠলেন—'আরে কাণ্ড, তোমায় বলছি কী! তোমরা তো আসলে সবাই ছেলেমানুষ। ব্যাপারটা র‍্যাসনালাইজ করলে সব পরিষ্কার বোঝা যাবে, আজকে তোমাদের পাড়ায় পুজো, আর পুজোর গ্ল্যামার তো আকর্ষণ করবেই—সেটা খুব স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, এই রকম একটা কমিউনিটি উৎসবের দিনে ফুল রিহার্সালের ডেট ফেলাই ভুল হয়েছে। মোটামুটি আলোচনা তো হল। আর একদিন বরং একটু সকাল-সকাল বসা যাবে।'

মাধব এবং রবি দুজনেই একসঙ্গে প্রতিবাদ করে। মাধব বলে—প্লীজ, আপনি বসুন। দশ মিনিটের মধ্যে সব ক'টাকে টেনে আনছি।

রবি মাথা নাড়ে—দশ মিনিট? ফুঃ! তিন মিনিট—ছোট আদালতে পাঁচ আইনের মামলার শুনানী আর রায় খতম হতে যেটুকু সময় লাগে। পিসাব কিয়া কি নেহী? হ্যাঁ বা না–যা-ই বলো, জরিমানা হবেই। এও তেমনি! তোমার জন্যে ক্লাবের গ্রেটার ইন্টারেস্ট সাফার করতে পারে না।

দেবেন হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন—ঠিক আছে চলো আমিও যাই পুজোর ওখানে।

—যাবেন? বেশ তো।

মাধব বলল – আবার কিন্তু এখানেই ফিরতে হবে।

দেবেনের যেন সব ব্যাপারেই সমান সম্মতি—আরে ছি, ছি–নয়ত বলেন তো বসতেও পারি, সেটাও মন্দ নয়।

রবি বলল—মনে কিছু করবেন না দেবুদা। এদের কেবলই ভয়, আপনি বুঝি বিরক্ত হচ্ছেন।

রবির মুখের কথার ওপরই একটি প্রশ্ন আছড়ে পড়ল—অলকদা—অলকদা—

রবি তাকাল—এই যে হেমন্ত! রাত দুপুরে হন্তদন্ত হয়ে শ্রীমুখ দেখিয়ে ধন্য করতে এলে? তুমি কি জানো না আজ এখানে সন্ধ্যে থেকে ফুল রিহার্সাল হবে।

নবাগত ছোকরাটি মাথা থেকে চাদরের ঘোমটা খুলে একগাল হেসে জিভ

বার করে বলল—আমি মরে গেছি রবিদা, প্লীজ এখন কিছু ব'ল না। আপাতত অলকদাকে খুব দরকার। এখানে তো নেই দেখছি, বাড়িতেও পেলাম না। কিন্তু—

হেমন্তর ভাবভঙ্গী অস্থির অসহায় এবং যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি ত্বরিতে সে বেরিয়ে গেল।

মাধব বলল—ওর কি হয়েছে বল তো!

রবি দরজা থেকে এক পা বার করে হাঁক দিল—হিমু—হিমু—

দেবেন মাধবের দিকে তাকিয়ে বললেন—ছেলেটাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

রবি স্বগতভাবে বলল—একটা ঝড়! সর্বদাই ব্যস্ত—। ওকে কিছু দেওয়া দরকার ছিল। অলকের কাছে নিশ্চয় সেই জন্যেই এসেছিল। এখন কোথায় খুঁজে মরবে! যাক গে—

তারপর দেবেনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল—আরে আপনি ওকে চিনতে পারলেন না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! খুব পরিচিত মুখ—অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছি না। নাঃ, আমার দফা গয়া—

বিচলিত ভঙ্গীতে দেবেন পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করে খুলে দেখল এবং ছুঁড়ে ফেলে দিল। রবিকে বলল—এখানে কাছাকাছি সিগ্রেটের দোকান নিশ্চয়ই আছে। আমি চট করে—কিন্তু এমন কেন হচ্ছে! দূর, এ আচ্ছা যন্ত্রণায় পড়া গেল।

রবি, মাধব এবং আরও কয়েকজন দেবেনের মুখের দিকে বিভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ। লোকটাকে যেন বোঝা যাচ্ছে না। ওরা বিব্রত, ব্যস্ত হয়ে জনে জনে একক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে।

—যন্ত্রণা? কিসের!—গ্যাস হয়েছে—

—মাথা ধরেছে?

—অ্যানাসিন চাই। বুঝেছি, সিগারেটের জন্যেই আপনার—

দেবেন জবাব দিলেন—আমি ভি আই পি নই ভাই! এমন কি এম আই পি-ও নই যে, মরবার পর খবরের কাগজে তিন চার লাইনের প্যারা পাবো। নেহাতই—নেহাতই এই যাকে বলে ভপ, ভেরি-অর্ডিনারি পার্সন। এবং তারপরই আচমকা 'হো-হো' হেসে ঘরখানা কাঁপিয়ে দিলেন দেবেন—আরে

স্ক্যান্ড। এ তো সেই ছেলেটা—। এখন একেবারে ছবির মতো, গোটা এপিসোডই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন ময়ূর-মহলে আমায় অ্যাসিস্ট করছিল যারা, এ তো তাদেরই একজন। ওরা দুজন ছিল অল্ রাউন্ডার। সেই ছোকরা ফেরিওয়ালা—আঃ গ্র্যান্ড। আর পাগলের রোলে এ ছিল—হ্যাঁ। আর বিমল যখন অডিটোরিয়াম থেকে অন্ধকারের মধ্যে ভারী বুটের আওয়াজ করতে করতে স্টেজে ওঠবার সময় 'ইকো' করল "এই যে আমি এখানে—এই যে—" আর ওরা দুজন 'সেরেছে! খোঁচর'—বলে পিছনের দরজা দিয়ে দে দৌড়। তাই না রবি?

রবি একটু যেন তেতে উঠল—আঃ সেজন্যে ওদের কোনো দোষ দিতে পারেন না। ওরা দুজনেই আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে। আর 'মুক্ত অঞ্চলের' ডিরেক্টর, মানে শ্যামল চৌধুরী খুব কায়দা করেছিলেন—

দেবেন সায় দিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক। শ্যামলের ব্রেন ওয়েভের জন্যেই লাস্ট সিনটা ক্লাস হয়েছিল। কী ইউনিট প্ল্যানই বার করেছিল, ওইটুকু ছোকরার মাথা আছে যা-ই বলো।

দেবেনের মুখে এরকম প্রশংসা শুনে কৌতূহলী মাধব মাথা চুলকে বলল—শ্যামল আবার কি করল?

—না, এমন কিছু নয়। ময়ূর-মহলের অডিটোরিয়ামের বিভিন্ন জায়গায় এক-এক জনকে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল। প্রত্যেককে আলাদাভাবে জানিয়েছিল, তাকে কখন কি করতে হবে—কিন্তু একজনের মুভমেন্ট অ্যাকশন অন্য কাউকে বলেওনি টেরও পেতে দেয়নি। ফলে লাস্ট সিনটায় নিজেরটুকু ছাড়া অন্য ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গও কেউ জানতো না। এমন কি আমরা যারা সেট-এ ছিলাম তারাও খুব অস্বস্তির মধ্যেই ছিলাম। হাজার হোক ছেলেমানুষ—তবু—এখন হয়েছে কী, বিমলকে পুলিস করে একেবারে পিছনের সারিতে বসিয়ে দিয়েছিল। আর বিমলের যা গলা, চলা—

রবি একটু ফাঁক পেয়েই মোক্তারের ভঙ্গীতে শুরু করল—তা হলে?—তা হলে হিমুই বা ঘাবড়ে যাবে না কেন?

দেবেন তাকে সমর্থন করেন—না, না, আমি তা বলিনি। অন্য কেউ হলেও—তবে ওরা দুজনে ইলেকট্রিক শক খেয়ে যেন ভোঁ-দৌড়। আসলে এমন একটা ইনসিকিওরড মন নিয়ে—

মাধবও আর মুখ বুজে থাকতে পারল না—হিমু বা নন্দন এমনিতে

দারুণ ডেয়ারিং। ওদের এগেনস্টে যদিও কোনো প্রমাণ নেই তবু—

—প্রমাণের আবার দরকার লাগে নাকি। দাদাদের কারুর কৃপায় একবার নামটা পুলিসের খাতায় উঠলেই ব্যাস—।

দেবেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং হঠাৎ রবিকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই বললেন—আরে রবি, তুমি বরং ছুটে যাও হিমুকে ধরো। নিয়ে এস। ওর যখন পয়সাকড়ি দরকার, একটা তো ব্যবস্থা করতে হয়। কি জানি হয়ত আমায় দেখে লজ্জা পেয়েই গা-ঢাকা দিল। সেদিন ওর পালানো দেখে খুব হাসাহাসি করেছিলাম কিনা—

মাথা নাড়ল রবি—ভয় নেই, লজ্জা-সরমের মতো বাজে বালাই আমাদের কারুরই নেই। হিমুর তো আরোই নেই। তা ছাড়া ওকে ডেকে কি হবে, আমাদের সবারই তো টিকে ধরাতে জামিন লাগে!

দেবেন পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাসলেন—অল্প দু-চার টাকা হলে আমি দিতে পারবো। খুব বিশ্রী লাগছে—সত্যি!

মাধব হাঁ-হাঁ করে ওঠে—খবরদার! না, না, দাদা—এ কিছুতেই হতে পারে না।

হিমুকে কেন্দ্র করে যখন সমস্যা তুঙ্গে উঠেছে অর্থাৎ দেবেন নিজেই খুঁজতে যাবার জন্যে স্যাণ্ডেল পায়ে গলাচ্ছেন তখনই বিশু এবং তার পিছু পিছু আরও দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে দরজার মুখে যেন পথ আগলে দাঁড়াল। এবং বিশু হাঁপাতে হাঁপাতে কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করে—এই দ্যাখো, দেবেনদা নিশ্চয়ই রেগে চলে যাচ্ছেন আপনি। দোহাই এবারের মতো মাফ করে দিন।

—আরে না, না—আপনারা সব বসুন—আমি একটু—

দেবেনের কথা শেষ হতে দিল না ওরা। সমস্বরে কলরব উঠল—যান তো দেখি! আমরা এই বডি ফেলছি, মাড়িয়ে যান। ঘেরাও করবো! অহিংস অনশন ধর্মঘট।

দেবেন হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন—অল রাইট তোমরা সবাই সবুর করো, আমি আর রবি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে দেখতে চাই—

—কোথায় চললেন?

রবি গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—বদলা নিতে। দেরির বদলে দেরি!

দেবেন মাথা নাড়লেন—উঁহু, ফর্মুলা খুঁজতে।

—কিসের ফর্মুলা ?

—আরে আজকাল তো সব বিরোধই ফর্মুলা দিয়ে নিষ্পত্তি হয়।

—না, না, একটু ছোট কাজ আছে—ভয় নেই, পালাতে পারব না, সিকিউরিটি গার্ড তোমাদের রবি তো সঙ্গেই রইল!

রমা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পথ আগলে বলে—হ্যাঁ ওই বলে আমাদের ফাঁকি দিয়ে—

রবি ধমক দেয়—মিছিমিছি আরও দেরি করিয়ে দিচ্ছ কেন—মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখো!

এর পর সব বাধা ঘুচে গেল।

বাইরে বেরিয়ে দেবেন বললেন—এটা কিন্তু ভালো হল না রবি। বেচারার মুখখানা কেমন নিবে গেল। অত কড়া শাসন কি খুবই দরকার ছিল ?

—আপনি জানেন না, একটু শক্ত না হলে চলে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন, বেরুনোর জন্য এত উঠোন-চচ্চাড়ি কি কারণে—

—এমনি। মানে হেমন্তকে একবার খুঁজে দেখা দরকার আর সিগারেটও ফুরিয়েছে—মাথাটা কেমন জ্যাম মেরে—

ক্লাব ঘর থেকে খানিকটা কানাগলির সরু পথ পেরিয়ে বড় গলিতে পেঁছিলো ওরা দুজনে। এবং সঙ্গে সঙ্গে থৈ থৈ মাথার ভিড়। পুজোমণ্ডপে রাস্তার মাঝখান জুড়ে থাকার দরুন সাধারণের যাতায়াত চলেছে কোল ঘেঁষে এবং ভিড় সেই কারণেই। আসলে প্রতিমার সামনেটা ফাঁকা। তেরঙা পৃষ্ঠপটের সামনে সরস্বতী প্রতিমার পাশেই একটি বড় লাইফ সাইজের ফোটোগ্রাফ। চোখ গিয়ে সেখানেই প্রথমে পড়ল এবং দেবেন থমকে দাঁড়ালেন। অল্পবয়সী একটি ছোকরা, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। যেহেতু মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাফসার্ট আর পায়জামা পরা, ফোটোটাতে প্রাণ ছাড়া বাকী সবই পরিদৃশ্যমান। এর গুরুত্ব যেন মৃন্ময়ী প্রতিমার চেয়ে কম ত নয়ই বরং বেশি।

দেবেন চলতে ভুলে গেছেন। রবি বলল—কি দেখছেন, হিমু এখানে নেই। চলুন—

কতকটা আচ্ছন্ন সুরে দেবেন প্রশ্ন করেন—কোথায় ?

—সিগারেট।

—ও, হ্যাঁ। কিন্তু হেমন্ত ?

দুজনে আবার পাশাপাশি চলে। কেউ কোনো কথা বলছে না।

নতুন প্যাকেট থেকে একটি রবির হাতে দিয়ে নিজের মুখে আর একটা গুঁজে অগ্নিসংযোগের পর দেবেন এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে মৃদু দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়ার সংগে জড়তা উড়িয়ে বলেন—আচ্ছা, ছেলেটি কে ?

রবি তীক্ষ্ন নজরে প্রশ্নের সূত্র খুঁজল—কার কথা বলছেন ? ওঃ, বুঝেছি ওই ফোটো !

—হ্যাঁ।

—কি বলি বলুন তো।

রবির মুখচোখে বিব্রত কুণ্ঠন লক্ষ্য করে দেবেন সংযত ভঙ্গীতে বলেন—থাক—থাক। কষ্ট হলে—কী দরকার—

—না, কষ্ট যা হবার তা আসল ঘটনার তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ। ও—ও এই পাড়ারই ছেলে। আমাদের বন্ধু—। সেই সময়ে পাড়ার ছেলেদের হাতেই খুন হয়েছিল। কিন্তু ভুল দেবেনদা, বুঝলেন, একটা মস্ত ভুল।

—বুঝেছি। এ ভুলের সাক্ষী এখানেই প্রথম দেখছি না। আরও অনেক পাড়াতে পুজোর মন্ডপে এরকম ছবি টাঙানো হচ্ছে। তবে এটা লাইফসাইজ তাই খুব প্রমিনেণ্ট।

—হ্যাঁ, পাছে আবার এ ধরনের ভুল-পথে কেউ পা বাড়িয়ে বসে, সেই জন্যই —বড়—।

রবির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, কথা শেষ হবার আগেই। সে যেন বড় বেশি তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল। দেবেন তার সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন। রবি সোজা প্যান্ডালের সামনে এসে থামল এবং নিজেকেই শোনালো—ভুলি নি তোমায়, তোমায় ভুলবো না সরোজ।

তারপর মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—চলুন দেবেনদা !

—হ্যাঁ। চলো।

দু-পা এগিয়ে রবি বলে—আচ্ছা দেবেনদা—

—কী ?

সাড়া নেই। সামনে ভিড় নেই, অথচ রবি এগোচ্ছে না বা কোনো কথা বলছে না।

দেবেন জিজ্ঞাসা করেন—কি হল ?

—না, কিছু না। বলছিলাম, আমরা এইভাবে কোথায় পেঁছিবো ?

—মানে ?

—বুঝতে পারছেন না। এই আমাদের বয়সী যারা, তাদের সামনে পথ কোথায় ! আমি রাজনীতির কথা বলছি না।

—তবে ?

—জীবনে চলার মতো পথ ত দেখা যাচ্ছে না। দেবেনদা, সত্যি বলছি, সব কেমন জোড়াতালি আর ফাঁক-ফাঁকি মনে হয়। এই সরোজকে যারা দুনিয়া থেকে মুছে দিয়েছিল একদিন, আজ তারাই তাকে দেবতার পাশে ঠাঁই দেবার জন্যে উৎসুক। আদর্শবাদের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু খাঁটি নয়। এটা বেশ টের পাই, উঠতি বয়েসের মানুষের কাছে কলকে পাবার উপায় হিসেবেই মৃতের শরণ নিতে ছুটে এসেছে।

দেবেন মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন, রবি থামবার পর ছাই ঝেড়ে আগুনটা উস্কে নিয়ে মুখ খুললেন—তুমি বলতে চাও এরা হিপোক্রিট !

—যদি বলি তাই।

—তাহলেও, তারপরও একটা কথা থেকে যায়।

—কী ?

—এরা অসহায়—বড় অসহায়। এও ত বলা যায়।

রবি ম্লান হাসি হেসে বলে—হতে পারে! আপনার অনুমান যতোই নির্ভুল হোক, আমার প্রেমিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক মানে সংঘর্ষ হচ্ছে না।

ওরা কানাগলির মুখে পেঁছে গেছে। মধ্যে কখন যে দেবেন সামনে আর রবি পিছনে হয়ে পড়ে ছিল তা এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি। বাইরের জোরালো আলোর মালা পেরিয়ে সরু এবড়ো-খেবড়ো পথে ঠিক ঠাওর করে চলতে দেবেনের পাছে অসুবিধে হয় তাই সে ব্যস্ত হয়ে এগোলো—দাঁড়ান আমায়

আগে যেতে দিন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম দেবেনদা, সেটা এই যে, আমরা কিন্তু মূতের শরণার্থী এই আত্মপ্রাধান্যময় লোভীদের কাছেই পথের প্রত্যাশা করছি—বাধ্য—না করে উপায় নেই—বুঝলেন ?

—খানিকটা।

—তার মানে ? সবটা নয় ?

—না।

—আপনিও টিপিক্যাল মধ্যবিত্তের মতো কিছুতেই স্পষ্ট দেখার পক্ষপাতী নন।

ওরা ক্লাব ঘরের মুখোমুখি পেঁছে গেছে। দেবেন বললনে—আচ্ছা আপাতত আলোচনাটা মুলতুবী রাখা যেতে পারে।

রবি হাসল—নিশ্চয়।

ভেতর থেকে অলক উচ্চকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়—দেখুন দেবুদা, আপনার জন্যে ঘুঘনি আর চা নিয়ে বসে আছি।

—বাঃ, বাঃ, আপনি এর মধ্যে ফিরে এলেন ! তা নয় জমানো গেল, কিন্তু যে জন্যে গেলেন তা নিশ্চয়ই ফতে করেছেন— !

—আজ্ঞে হ্যাঁ !

রবির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেবেন বললেন—কী রবি, বাকী খানিকটা গ্যাপ রাখা খুব খারাপ নয় এবার দেখচ ত !

অলক রহস্যটার কিছু না বুঝেই বলল—আমার হোক বা না হোক তাঁর কাজ হয়েছে। কালই সকালে একটা প্রধান অতিথির ভাষণ লিখে পেঁছে দিতে আজ্ঞা হয়েছে। গর্লাস স্কুলের সারস্বত সভায় তিনি চীফ গেস্ট হচ্ছেন কিনা।

ঘুঘনির চামচে হাতে নিয়ে দাঁড়ালো, মুখে বিস্ময় নিয়ে দেবেন বললেন—আচ্ছা ! ওয়াণ্ডারফুল—

—ফুল এখনো পুরো ফোটেনি হুলটা বাকী আছে।

—সেটা আবার কী ?

—একটা রিপোর্টও লিখে খবরের কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করতে হবে। এক পিসতুতো দাদা নিউজ পেপারে আছেন কিনা। যাক ওসব—এখন এরা সব হাজির, আপনি সেরে নিয়ে শুরু করুন দাদা ! চা জল হয়ে যাচ্ছে— !

দেবেন বললেন—হ্যাঁ, গোড়া থেকে—

—তার দরকার নেই। চারটে রাস্তার মোড়ে ল্যাম্পপোস্টের বাহক দাঁড়িয়ে আছে। পথ দেখা যাচ্ছে কি না এই প্রশ্ন নিয়ে—এ পর্যন্ত আমি গুছিয়ে সেরে রেখেছি—এরা সবাই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছে।

অলকের দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দেবেন চাইলেন—বেশ! বেশ! এর পর একটি ছেলে মধ্যবিত্ত সরণি থেকে ছুটে এসে বড়লোক সরণির দিকে একটু এগিয়েই, নাক কুঁচকে চোখ পাকিয়ে ল্যাম্প-পোস্টের সামনে দাঁড়াবে—থমকে—

রমা আর মুকুল একসঙ্গে প্রশ্ন করে—তারপর?

—তারপর, সে গরীব সরণির দিকে হনহনিয়ে এগিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে চৌমাথায় যখন ক্লান্ত হয়ে আবার পেঁছিলো—তখন এক অভিব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ। এবং দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সবেগে মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়েই পিছিয়ে এল—চোখে-মুখে ভয়ের, বিভীষিকার ছাপ।

দেবেন থামলেন। গোটা ঘরখানায় শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। থম্‌থম্‌ করছে।

রবির দিকে তাকিয়ে দেবেন জিজ্ঞাসা করেন—কেমন হবে?

রবির জবাবের আগেই মাধব বলে—ইউনিক। তারপর?

দেবেন বলেন—বাতিওয়ালা হেসে ছেলেটির পিঠে হাত রেখে বলে—কী, পারলে না! ভয় পেয়েছ? জানতাম পারবে না।—এবার ছেলেটি চেঁচিয়ে ওঠে।—'কে তুমি? তুমি কে? তুমি—তুমি—হ্যাঁ, তুমি আমায় ভুল পথে ঠেলে দিয়েছ, তোমায় চিনেছি। বারবার আমাকে নিয়ে তামাশা করেছ।' লোকটি যতই বোঝাতে চেষ্টা করে ছেলেটি ততোই প্রতিবাদে মাথা নাড়ে।—আলো নয়, আলো নয়. আলেয়ার যাদু দিয়ে—

—ওয়াণ্ডারফুল!

—মার্ভেলাস!

—তারপর?

রবি এবার বলল—তারপর শুরু হবে নাটক! মূল নাটকের কোনো পরিবর্তন নেই। গতানুগতিক নিয়মে চলবে—আমাদের জীবনের মতো, তাই না দেবেনদা!

দেবেন যেন শুনতেই পাচ্ছেন না। নিবিষ্ট ভঙ্গীতে মাথা হেঁট করে

সিগারেট টানতে ব্যস্ত। এবং সেই মুহূর্তে লোডশেডিং-এ গোটা ঘরখানা অন্ধকারে ডুবে যায়। এক ঝাঁক তরুণ-তরুণীর মিলিত চাপা আর্তি শোনা গেল।

দেশালাইকাঠির ঘর্ষণ। মৃদু ক্ষীণ আলোয় অন্ধকার যেন আরও ঘন, আরও দুর্ভেদ্য আর রহস্যময় হয়ে ওঠে। দেবেন বললেন—হ্যাঁ, তবে এমনি-ভাবেই আলো আনতে হবে। আসবে আলো। যারা আনতে পারবে, তারা মৃত্যুর শরণাপন্ন পথপ্রদর্শকদের কব্জা থেকে নিজেদের ঠিকই মুক্ত করবে। কিভাবে ?—তা, পরে, ইতিহাস বলবে।

॥ সাত ॥

'সুন্দর' শুনলেই আমার গা-পাক দেয়। কি জানি ওই কথাটায় এমন একটা চট্‌চটে পুরনো-পুরনো ভ্যাপসা ভাব, বড়লোকদের রাঙা-মুলো মার্কা 'মল্লিকী' দুলালের ছবি মনে জাগে, ওই কথাটার আগা-পাশতলায় মূঢ়গর্ভ ঔদ্ধত্য যেন মাখানো রয়েছে। 'সুন্দর' শব্দটিকে তেতো-ঝাল-টক-নোনা কোনো স্বাদের সঙ্গেই তুলনা করতে আমার ইচ্ছে জাগে না। চটচটে মিষ্টি সস্তার লজেন্সের সঙ্গে হয়তো-বা কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাই। অথচ ওই শব্দটির প্রতি অনীহা থাকলেও কোনো রূপসী, যুবতী কিংবা সুরের মাধুর্যমণ্ডিত কণ্ঠের গান, চকচকে মজবুত গাড়ি, স্বাস্থ্যশ্রীমণ্ডিত পুরুষ, নিকোনো ছিমছাম শান্তির কুঞ্জ কুঁড়ে-ঘর ইত্যাদি সুন্দর সবকিছুর প্রতি আমার সহজাত আকর্ষণই জীবনে নানাঘাটে, বিচিত্র অবস্থায় ঘুরিয়েছে—আনন্দ দিয়েছে। আমার মনে হয়, শুধু আমি কেন প্রত্যেক মানুষেরই বিশেষ বিশেষ কথার ওপর এই ধরণের বিরাগ আছে—নিশ্চয়ই আছে। ভেবে দেখলে আপনি নিজের স্বভাবেও এই প্রতিফলন পাবেন—'আসলে' 'কিন্তু' 'অথচ' 'বুঝলে' 'বটে' 'হ্যাঁ' বা ওই রকম কোন কথা হরদম যেখানে-সেখানে অকারণে বলার মতো এও একটা মুদ্রাদোষ।

না, মুদ্রাদোষ নিয়ে প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। এই মুহূর্তে মুন্সী-বাজারের গ্যাঞ্জামী গঞ্জ পেরিয়ে ট্যাক্সিখানা বেলেঘাটা খালের পুল ছাড়িয়ে খানিক দূর চ'লে আসার পর আমি যেন অতর্কিতে সুন্দর কোনো রূপকথার রাজ্যে হাজির হয়ে চমকে অবাক চোখে চাইলাম। মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল 'সুন্দর'! অমনি নিজের ওপর খাপ্‌পা হয়ে ধমক দিলাম, কেন! শব্দের কি এমনই দুর্ভিক্ষ?

তারপরই সামনের ব্যক্তিটি হাওয়ার সঙ্গে কিছু কথা এপারে পাঠিয়ে দিল—বুঝলেন স্যার, এই দিকটায় গাড়ি চালিয়ে ভারি আনন্দ পাই। বুঝে দেখুন, এই গর্মিকালে আমাদের হালখানা।

নিজের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করেই বলি—আমি ত জানতাম না এদিকটা এমন

সুন্দর। আপনি জোর করে এনে ভালোই করেছেন।

এবার এক ঝলক অবজ্ঞা ছড়ানো বিস্ময়—সেকি! ভি-আই-পি রোডে আসেন নি?

বৈশাখের রুদ্রদুপুরের দিগন্তে একমুঠো সোনামাখা হলুদ কর্ণিকার যেন বিশ্বসুন্দরীর শ্রী অতুলনীয় করে দিয়েছে। আহা কতকাল এমন দুপুর দেখিনি। এ কী, এখনই অনুরাগের রক্তিমা মাখানো কৃষ্ণচূড়া! আর—আর তার সঙ্গে প্রণয়লিপ্ত কচিসবুজ পাতাদের হিল্লোল। নাঃ, পেটের খিদে আর কষ্ট দিচ্ছে না।

ট্যাক্সি ড্রাইভার উত্তর না পেয়ে দমেনি, স্পীডের মাত্রাকে স্বাধীনতা দিয়ে বলে চলল—অনেকে এদিকে বেড়াতেই আসে। শুধু বেড়াতে। বুঝলেন!

—তাই নাকি? তা বেড়াবার মতো জায়গা বটে।

—তা বলে রাতের বেলায় এদিকটা মোটেই নিরাপদ নয়। এই আমি, দিনের বেলা বলেই জোর করলাম, রাতে হ'লে আপনি জোর করলেও আসতাম না।

দুপাশে কত ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে। কোথাও এক আধখানা বাড়ি যেন ছবির শোভা বর্ধনের জন্যেই তৈরী হয়ে, দিগন্তের বুকে মানুষের অস্তিত্ববার্তা পেঁৗছে দিচ্ছে। ওই আকাশ একদিন আমার চোখে কত স্বপ্নের মায়া উপছে দিত! আজ তারা সব কোথায় গেল? সেই সব স্বপ্নরা! চুলোয় যাক। এখন আর তার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া বিশেষ কিছু ব্যয় করার মতো পুঁজি মনের নেই। বিবেকের ধমক দিয়ে যতো না-হোক ঝঞ্ঝাটের আতঙ্ক দিয়ে ভয় দেখিয়ে আমায় স্বপ্নের স্বর্গের ত্রি-সীমানা থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। এনেছে কে? আমি। হ্যাঁ। এই আমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

ড্রাইভার বলল—আপনি ওই ফ্যাক্টরীর সামনে গাড়ি থেকে নেমে কোথায় গেলেন স্যর, ভেতরে ঢুকে খোঁজাখুঁজি করলাম কতো—কিন্তু দেখতে পেলাম না!

সিগারেট ধরিয়ে বলি—কেন হঠাৎ খোঁজ করার কি হয়েছিল, মশাই? আমি ত তিন মিনিটের বেশি দেরি করি নি। আপনার জন্যেই খামোখা দেরি হ'ল। অন্য কেউ হ'লে হয়ত হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে—

—আজ্ঞে অন্য ট্যাক্সি ধরে নিতেন। তা যা বলেছেন। এরকম কতোই হয়।

ওরই মধ্যে একবার ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল সে—আর সেটাই ত আজকের দিনের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে স্যার।

ভ্রূ কুঁচকে এল। কণ্ঠে তীক্ষ্ন শ্লেষ আর বিশ্বেষ—তার মানে?

লোকটি ঘোর-প্যাঁচের ধার মাড়ায় না, নইলে কি বলে—চারদিন পরে আজ প্রথম গাড়ি বার করেছি স্যর। গ্যারাজে সত্তরটি টাকা গুণে দিতে হয়েছে। আর সকাল থেকে ভাড়া খেটেছি মোট চার টাকার, বুঝলেন। আর এই আপনি যখন নেমে গেলেন তখনই মিটার পাঁচ টাকা চল্লিশ—

দূরের রেলগাড়ি বাঁশি বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। একখানা ঝকঝকে বড় ডিলাক্স ট্যাক্সি মোনালিশার মোহিনী ভঙ্গিমা ঝলকে পাশ কাটালো। ড্রাইভার আমায় সন্দেহ করেছিল! সন্দেহ? আমাকে। না, তার দোষ নেই। আমি ক্ষেপে ওঠার আগে, আহত মর্যাদাবোধের গায়ে হাইড্রোকর্টিজন মলমের মতো ম্যাজিক কিওর ছুঁইয়ে দিল—আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম স্যর, আমরা মানুষ দেখেই আঁচ করতে পারি। মানে, কারখানায় আমার ভগ্নিপতির এক ভাই কাজ করে, তার সঙ্গে দেখা করতেই ভেতরে যাওয়া! আর গেলামই যখন,—তবে কি জানেন, আজকাল মানুষ চেনা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—তার মানে?

আমার চোখের সামনের সুন্দর হয়ে উঠল করাল। কিছুটা বা কৌতুক ঝরেছিল আমার কণ্ঠের কৌতূহলী রূঢ়তাকে শালীন্যের আবরণ দিতে।

ড্রাইভার ধাক্কা দিল—আমরাও মানুষ। পেটের জন্যে গাড়ি চালাই বলে কি আর বিশ্বাস করি না প্যাসেঞ্জারকে। সে জন্যে ঠকতেও হয়। এই ক'দিন আগে এক ভদ্রলোক উঠলেন, আপনার চেয়ে বয়েস কিছু কম, সুট-পরা চোস্ত চেহারা। কিছু দূর এসে গাড়ি থামিয়ে এক চাঙড় বরফ কিনে আনলেন, লাগেজ বক্সে রেখে গম্ভীর ভাবে বললেন,—এত চেষ্টা করেও যদি ছেলেটাকে বাঁচাতে না পারি তাহলে মা বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারব না।···

স্বভাবতঃই আজকের দিনের ব্যবসায়িক সাফল্য থেকে মনের ঘাড়টা ট্যাক্সি-চালকের কাহিনীতে আকৃষ্ট হ'ল। পাঁচ'শ টাকা মুনাফার আনন্দের সঙ্গে এটা উপরি লাভ। বললাম—কি ব্যাপার?

—শুনুন না স্যার। ভদ্রলোকের ছোট ভাই-এর অসুখ। ব্লাড ব্যাঙ্কে

যাচ্ছেন রক্ত আনতে। মেডিক্যাল কলেজের সামনে গাড়ি রেখে নেমে গেলেন, তাড়াতাড়ি রক্ত নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে, আমায় ছাড়লেন না। কিছুক্ষণ পরে হন্তদন্ত হয়ে ফিরলেন, টাকা শর্ট পড়েছে, আরও দশ টাকা লাগবে। আমায় বললেন, বাড়ি ফিরে দিয়ে দেবেন। মানুষের বিপদ, দিলাম দশ টাকা। তারপর দেরি হচ্ছে, ত হচ্ছেই। আধঘণ্টা কেটে গেল। তখন আমার আর সন্দেহ রইল না, তবু গেলাম ব্লাড ব্যাংকে। খোঁজাখুঁজিই বেকার। ভাড়া ত পেলামই না, পকেট থেকে—উপরি গুনোগার দশ টাকা।···আর বরফ ?

—হাসালেন স্যার, বরফ ত গলে জল। আবার সেই কাঠের গুঁড়োগুলো সাফ করে, মুছে লাগেজ বক্স নিজেই পরিষ্কার করলাম—বলা ত যায় না, কোন প্যাসেঞ্জার মালপত্তর রাখতে চাইবে, নোংরা দেখলে—।

ততক্ষণে গাড়িটা রেলপুলের তলা দিয়ে এমন একটা অঞ্চলে ঢুকলো যেখানে আমায় ছেড়ে দিলে পথ চিনে বাড়ি পেঁছিতে পারতাম না কিছুতেই। ঘন-ঘন বাড়িঘরের বসতি আকাশকে ঢেকে ফেলেছে। ওরই মধ্যে এক টুকরো চৌকো জমিতে অনেক লোক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হাব-ভাব থেকে ধরা যায় যে, কৌতূহল আর উত্তেজনায় তারা সবাই চঞ্চল, অস্থির। প্রবল উত্তেজিত অবস্থায় শরীরকে এক জায়গায় আটকে রাখলে ম্যালেরিয়া রোগীর কম্প দিয়ে জ্বর আসার মতো প্রচণ্ড কাঁপুনি তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গলা বাড়িয়েই চোখে পড়ল, দুটো ষাঁড়ে শিং-এ শিং বাধিয়ে লড়ছে—ফোঁস-ফোঁস শব্দ আর পা দিয়ে মাটি আঁচড়ানোর শব্দ। দুটি টিং-টিঙে ছোঁড়া দু টুকরো লাল শালু কাপড় ধরে' ধূর্ত সতর্ক দৃষ্টিতে গোখ্‌রোর মত দুল্‌ছে।—অনেক বিদেশী নভেলে ম্যাটাডোরদের নিয়ে বিস্তর উচ্ছ্বাস পড়েছি, সিনেমাতেও বুল্‌-ফাইট দেখেছি, কলকাতার পথেঘাটে ষাঁড়ের লড়াই একদা যে পথচারীদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল তার মধ্যে আমিও পড়ি। কিন্তু প্রথম ডিভিশন ফুটবলের মতো, ষাঁড়ের বীরত্ব ও শক্তিপরীক্ষার সংগঠিত আয়োজন, না, এর আগে চাক্ষুষ করি নি। ইচ্ছে হল নেমে গিয়ে দেখিই না! এ সেই ধরনের ইচ্ছে যাতে নিজেকে বিপদের আঁচ থেকে বাঁচিয়ে, অন্যের ওপর দিয়ে লড়াই-এর আঘাত বা পরাজয়ের ঝঞ্ঝাট ঘটতে দেখে নিজের বীরত্ব-পিপাসা চরিতার্থ করার সাধ মেটে। আমাদের আশপাশে ত এখন এই মনোভাবটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা খেলা দেখি, আমরা রেডিওর ধারাবিবরণীতে খেলা শুনি—আর তাতেই খুশি হই, দুঃখ পাই, তার

ওপরে এই ত সেদিন পাড়ার দুই মস্তান তর্ক করতে করতে শেষে হাতাহাতি মাথা ফাটাফাটিই ক'রে ফেলল—অথচ যে নঈমের খেলার বাহাদুরী নিয়ে এত বড় কান্ড হ'ল সে বেচারী টেরও পেল না !

মনে হ'ল বলি ড্রাইভারকে—'থামান !' কিন্তু বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে, ট্যাক্সির মিটারও আমায় হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। তা ছাড়া ড্রাইভার তখন তার প্রতারকের গল্পে ডুব দিয়ে কথা বলছে। দুনম্বর ভদ্র-জোচ্চোরের কাহিনী। তিনি নাকি ডাক্তার। গুজরাটী হাসপাতালে জরুরী অপারেশন আছে। ট্যাক্সিতে ওঠার পর কিছুদূর এসে বললেন—'পান সিগারেটের দোকান দেখে দাঁড় করাবেন। সিগ্রেট নিতে হবে।' বুঝলেন !···সিগারেটের দোকান থেকে ফিরলেন, একশ' টাকার নোটের ভাঙানী আছে ? সকাল থেকে রোজগার হয়েছে কুড়ি-বাইশ টাকা। নোটখানা, তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হেসে বললাম—মাথা খারাপ। অতো টাকা কোথায় পাবো সার।···তা তিনি বললেন, —খুব ত মুস্কিল হ'ল ! সিগ্রেট নইলে যে মেজাজ খিঁচড়ে থাকবে। শেষে অপারেশন যদি সাকশেস্‌ফুল না হয় !'···আমিও খুব চিন্তায় পড়লাম স্যার। শেষে তিনি বললেন—'আচ্ছা, দশটা টাকা দিন ত। হাসপাতালে ত পেয়েই যাবো।'

আমার চোখের সামনে আর সেই ষাঁড়ের লড়াই নেই, তবু, বেশ দেখতে পাচ্ছি লাল শালুর টুকরো নাচিয়ে ধূর্ত দুটি চ্যাংড়া দুটো ক্ষ্যাপা পশুকে নাস্তানাবুদ করছে আর তাই দেখার জন্যে কত লোক জমে গেছে। আমিও ! কান দিয়ে ড্রাইভারের কথা শুনছি—এক প্যাকেট সিগারেট আমায় দিয়েছিলেন সেই ভদ্রলোক। তিনিও গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে হাসপাতালে গেছেন। কতো প্যাসেঞ্জার সাধাসাধি করল। কিন্তু আমি ডাক্তারের জন্যে বসেই রইলাম। তাঁর দেওয়া সিগারেট ফুঁকে—ফুঁকে শেষে হাসপাতালে খোঁজ করি। কিন্তু কোথায় সে ডাক্তার ! বুঝলেন স্যার !

বুঝতে বিশেষ অসুবিধে ছিল না। তবু সমবেদনা দেখাতে হ'ল—ডাক্তার হয়ে— !

—আপনিও যেমন ! ডাক্তার না কচু—জোচ্চোর !

উল্টোডাঙ্গার মুখে লরীদের যথেচ্ছ অবস্থান কাটিয়ে আমার চিরপরিচিত বেলগাছিয়ার মুখ দেখতে পেলাম। ভি-আই-পি'র সুন্দর দৃশ্য কোথায় হারিয়ে গেছে। এদিকে জঠরের আগুনও জানান দিচ্চে, বেলা অনেক হ'ল।

মমতা না খেয়ে বসে থাকবে। হাজার দিন বলে'—বকে' ওর এই এক-গুঁয়েপনা শোধরাতে পারি নি। ছট্‌ফট করি গাড়িতে বসেই।

দূর থেকেই দেখতে পেলাম, বাড়ির সামনে মমতা দেহের সবটাই প্রায় বাইরে বার ক'রে গ্রীবা প্রসারিত ক'রে এই দিকে চেয়ে রয়েছে। গাড়ি থামতেই উৎকন্ঠা ঝরিয়ে দিল—আমার ত ভয়ই ধরে গিয়েছিল। আজকাল যা অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে—

তাচ্ছিল্য দেখালাম—আরে আমরা হলাম যমের অরুচি।

ড্রাইভার আপন লোকের ভঙ্গীতে বলল—উনি কিছু ভুল বলেন নি। এই ত পরশু আমার গাড়িখানা আট্টু হ'লে—

মমতা ঝঙ্কার দিল—দুটো বেজে গেছে।

মিটারের কাঁটায় আট টাকা দেখে দশের নোট বার করে দিলাম। আমার হাতে যখন ড্রাইভার একখানা পাঁচ আর তিন খানা এক টাকার নোট দিল তখন বোধহয় খেয়াল না করেই পকেটে কাগজগুলো হেলাভরে চালান করে দিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। এক-পা বাড়াতে না-বাড়াতে ড্রাইভার বলল—আপনার নিজের বাড়ি? সামনের শো'-টা ত বেশ সুন্দর! বুঝলেন, আমিও বাড়ি আরম্ভ করছি, ফ্রণ্টেজ-টা নিয়ে চিন্তায় পড়েছিলাম। নোট করে নিলাম, এটা আমার পছন্দ হয়েছে।

বলা হ'ল না, এটা আমার বাড়ি নয়। ভাড়াটে। ঠিক সেই মুহূর্তে খটকা লেগেছিল, লোকটা বুঝি বলে, 'বেশি টাকা নিয়েছেন আপনি!' নাঃ, তা নয়।

ভেতরে ঢুকতেই মমতা জিজ্ঞাসা করল—সমীরদা কি বলছিল গো?

গায়ের খোলস ছাড়তে ছাড়তে বলি—সমীরদা? কে?

—আরে ও-ই ত সমীরদা! যার ট্যাক্সিতে এলে। শেষে ট্যাক্সি চালাচ্ছে! চিনতে পেরেই ত পালিয়ে এলাম—ও যদি লজ্জা পায়।

বুকের ভেতরে একটা ধড়ফড়ানি শুরু হ'ল। লোকটা যদি ফিরে আসে। যদি লোকটা মমতার কাছে—! নাঃ, এমন কিছু করি নি যে, কেঁচো হয়ে থাকতে হবে। টাকা পয়সার ব্যাপারে আমি ত উদাসীন, কতোবারই ত বেহিসেবির জন্যে…। কিন্তু মমতার কন্ঠে সমীরদার জন্যে কিছু আক্ষেপ ঝরেছে বলে মনে হচ্ছে। হয়ত সেই প্রণয়-কাহিনীর নায়ক এই সমীরদা!… লাল শালুর টুকরো নিয়ে সেই চ্যাংড়া দুটো এখনো ধূর্ত খেলায় গ্রীষ্মের রুদ্র দুপুরকে ঘর্মাক্ত করছে।…কি জানি ড্রাইভার আর কোনো প্যাসেঞ্জারের কাছে

নতুন ভদ্র-জোচ্চোরের কাহিনী শোনাচ্ছে কি না। আসলে ওই লোকটা—না, আমি মোটেই না—ওরই ত অন্যায়। সামান্য ক'টা টাকা—নিশ্চয় ও জাদু ক'রে আমায় জোচ্চোর বানাবার জন্যেই দিয়ে গেছে। আবার যদি কোনোদিন বাড়ির ফ্রণ্টেজ দেখতে আসে, দিয়ে দেবো। দেবো কি? আগে আসুক। তখন দেখা যাবে।

মমতাকে আর বসিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। হৈ চৈ একটু হ'ল—একে তোমার শরীর খারাপ, তার ওপর পিত্তি পড়িয়ে—ডাক্তারে ওষুধে আমার খরচা বাড়ানো—এই সব সতীপনা—

—থামো! জানোই ত—গলা দিয়ে ভাত নামে না। তুমি রইলে পড়ে'—সংসারের জন্যেই ত। যাক কোঁদল রেখে দিয়ে মুখ-হাত ধোও—আমি ভাত বাড়তে যাচ্ছি।

মোচার ঘণ্ট আমার খুব প্রিয়। মোচার কষ লেগে মমতার হাত কালো হবে বলে, ওটা আনা বারণ। আমিই বারণ করেছি। আজও মোচাঘণ্ট। যা খিদে পেয়েছে! দ্বিতীয় বার ঘণ্ট চাইলাম। মমতা পাশেই বসেছে। বলল—কী লজ্জা! আর ত নেই।

—তাতে কি হয়েছে! খুব সুন্দর রান্না হয়েছে কিনা।

মমতা বলল—জানো এ ব্যাপারে সমীরদা রাম-হ্যাংলা ছিল। কতদিন আমার এঁটোটাই কেড়ে খেয়েছে। মাসিমা ব'লে সিধে রান্নাঘরে হামলা—। আহা সেই সমীরদা—হ্যাঁ গো, নেবে আমি এতটা মোচা খেতে পারব না। দিই—

মাথা নাড়লাম—না! আমি তোমার সমীরদা নই।

নিজের কানেই কথাটা বেসুরো ঠেকল। একবার আড়-চোখে ওকে দেখলাম, কোনো ভাবান্তর হ'ল নাকি? না।

মমতা বলল—আচ্ছা! ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে' ওকে মনে হয়? মানে, তোমার কিছু মনে হয় নি?

এক ঢোক জল খেয়ে জবাব দিলাম—হ্যাঁ! একটু ছিটেল্ মনে হয়েছিল! লোকটা দুনিয়ার সবাইকে সন্দেহ করে। কবে কে ওকে ঠকিয়েছে কেবল সেই সব গল্প!

লুফে নিল মমতা—সারা জীবনটা ত ওকে ঠকতেই হয়েছে। হার্টটা খুব বড় কি না।

আমি যে কেন বললাম জানি না। তবে বললাম, এটা ঠিক।—আজও ঠকতো, নেহাৎ আমি বলে—

কৌতূহলে মমতার চোখে ঝিলিক—কেন গো? কী হয়েছে!

—এমন কিছু না। তবে এমন অপদার্থ মানুষ, জীবনে শাইন করবে না কোনো দিন, করতে পারে না।

– ব্যাপারটা কী?

– আবার কী! ভাড়া হ'ল আট টাকা, দিলাম দশ টাকার নোট, আমায় ফেরৎ দিল আট টাকা!

– ও মা! দু' টাকা ফেরৎ দেবে ত!

– এই বলে কে!

– ভাগ্যে তোমার মতো প্যাসেঞ্জার ছিল, নইলে কি আর ওই টাকা ও ফেরৎ পেত!

আমি সায় দিলাম—সে আর বলতে!

—ও, এতক্ষণে বুঝলাম, তোমার অতো দেরি হচ্ছিল কেন! তা সমীরদাকে সমঝে দিয়েছ ত ভালো করে!

গর্বে বোধ হয় বুকখানা দশ হাত চাওড়া হ'ল—দিয়েছি!

মমতা এতেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না—ওর জন্যে দুঃখু হয়। তোমার কথাই ঠিক, সারা জীবন ঠকেই যাবে।

দীর্ঘশ্বাস না পড়াই উচিত ছিল। কিন্তু যখনই মনে হ'ল, অন্ততঃ একটি জায়গায় সমীরদা ঠকে নি, তখন আর দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারলাম না। মমতার দীর্ঘশ্বাসটাও আমার লক্ষ্য এড়ায় নি, সেই সঙ্গে ওর চুনীর মতো গাঢ় মন্তব্য—সব যেন খানু খানু হয়ে যাচ্ছে!

॥ আট ॥

আশু কাকা আমার আপন কাকা নয়, আসলে কেউ নয়। কিন্তু। সেটা নিজে ত ভাবতামই না, যদি কেউ ভাবাতে চাইত তাহলে মনে মনে খুব যন্ত্রণা অনুভব করতাম। কেন, তা জানি না। হয়ত আমাদের পরিবারে পর-পর ভাবার ব্যাপারটাই আমল পেত না বলে এরকম হ'ত। সন্ধের পর, বাইরের খোলা বারান্দার বুকে আতা গাছের ছায়াটা চাঁদের আলোয় হেলে-দুলে হাওয়ার খবর দিত, তখন সুশীলা-কাকী গলি-পথ দিয়ে টুক করে এসে জুটতো আর আমরা ছেঁকে ধরতাম 'কাকী একটা গপ্প বলো।' কাকীর গলাটা ভারি মিষ্টি, হয়ত বলার ধরনটাও—তাই বাচচারা ওকে খুব ভালবাসত। কাকীও ছেলে-মেয়ে পছন্দ করত। লুকিয়ে-চুকিয়ে এটা-ওটা এনে খাওয়াতো। কানে কানে সাবধানবাণী 'কত্তামাকে বলিস না যেন।' কত্তামা আমাদের ঠাকুমা, তাঁর আচার-বিচারের দাপটে বাড়ির সবাই তটস্থ। কিন্তু সুশীলার গলা পেলে তিনিও সাড়া দিতেন—'কে সুশীলা এলি? বস'—এবং এসে বসতেন, তবে ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

—সুশীলা—অ—সুশীলা—

আশু কাকা লণ্ঠন আর লাঠি হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়লেই সুশীলা কাকী ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ত। গল্পের রাজপুত্র তখন বাঘের মুখে থাকলেও উদ্ধার করার উপায় নেই। চেপে-ধরা আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতেই কাকী বলত—বাকীটা আবার রাম রাত্তির পোহালে শুনো সোনা। মানুষটা তেতে-পুড়ে এতটা পথ হেঁটে এসেছে—

কাশিমবাজার রাজবাড়ির পাইক রাসবিহারী দাস। কিন্তু ওই নামে কেউ তাকে ডাকে না, হয়ত ডাকলে আশু কাকার সাড়াও পাবে না। আসলে নিজেই ভুলে গিয়েছে। যারা অল্প-পরিচিত তাদের কাছে রাসা বোরেগী আর পাড়ার সবাই ডাকে আশু বোরেগী। বৈরাগ্যের পরিচয় যদি তুলসীর মালা হয়, আশু আলবাৎ বৈরাগী। না, আরও আছে, আশু খুব ভাল খোলন্দাজ, গলায় সুর না থাকলেও তালের দিক দিয়ে পয়লা নম্বর সেয়ানা। আশুর ডাক

*গলির সেই মানুষটা

পড়ে তাই বৈষ্ণবদের আখড়াতে, ধুলোটের নগরপরিক্রমায়। শুনেছি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র যখন ধুলোটে খালি পায়ে, খালি গায়ে শহরে হরিনামে বেরোতেন গুণী ভক্ত আশু কাকাও সে-দলে থাকত। এই রকম বায়নাতে অনেক সময়ে কাকা রাতে বাড়ি ফিরতে পারত না। কাকী তখন আমাদের বাড়ি মায়ের ঘরে মেঝেতে আস্তানা নিত, কাকী মায়ের ঘামাচি মেরে দিত। আঁচল বিছিয়ে রাতও কাটাত। নয়ত আমাদের সাধাসাধি করত ওর ঘরে থাকবার জন্যে। এতেই আমাদের ভাই-বোনের উৎসাহ বেশি। ফুরু ওর বেড়াল নন্দদুকে সঙ্গে নিয়ে যেত আর গল্পের মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ত। কাকীর একটিই শর্ত—'হু' দিতে হবে। হুঁ না-দিলে গল্প বন্ধ। যা-ই হোক, কাকী একা থাকতে পারত না।

মাঝে মাঝে কাকী বাপের বাড়ি যেত গরুর গাড়ি করে। গঙ্গার ওপারে পাড়াগাঁয়ে বাপের বাড়ি।...তখন গলিটা বড় শূন্য মনে হ'ত। আশু কাকাকে তখন দিনের বেলা বড় একটা দেখতাম না। রাতে মাঝে মাঝে প্রাচীরের ওপার থেকে হুঁকো টানার শব্দ আর দা-কাটা তামাকের কড়া গন্ধে টের পাওয়া যেত কাকা ঘরে ফিরেছে। কখনও বা ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করত সে—'বরুণ বাবাজী আছো নাকি?'

বরুণ বাবাজীর সঙ্গে যে কোন কাজের কথা আছে তা নয়, তবে ওই সুবাদে খোঁজ-খবর-নেওয়া আর সেটা বৌঠাকুর্যানের সঙ্গে। —'সুশীলা কবে আসবে' মায়ের প্রশ্ন। এবং প্রশ্নটা জরুরী, কেন না, সুশীলার জন্যে মা মিশনহোমের নীরদা দিদির কাছে দরবার করে কিছু সেলাই-ফোঁড়াই জোগাড় করে রেখেছে। অবসর সময়ে যাতে গরীব বৌটা দু পয়সা আয় করতে পারে সেদিকে মায়ের নজর। শুধু সুশীলা কেন, পাড়ার অনেক বিধবা সধবা কুমারী মেয়ে মায়ের এই নামহীন ইনস্টিটিউশনের অলিখিত সদস্য। গোরাবাজারের হোম থেকে প্রতি শনিবার দুপুরে ঘোড়ার গাড়ি এসে লাগে আমাদের বারবাড়ির দরজায়। কাঁধে সেফটিপিন-আঁটা ধবধবে শাড়ি পরা নীরদা দিদি এবং তাঁর সঙ্গে আরও দু-একজন টীচার গাড়ি থেকে নামেন। খুব সাদাসিধে বেশবাসও যে পরিচ্ছন্নতার ফলে অসাধারণ হতে পারে তা এঁদের না দেখলে ছেলেবেলায় ধারণাই হত না। না, তার চেয়ে বরং বলা ভাল যে, ওঁদের দেখে সেই যে ধারাণা হয়েছিল সাদাই হল শ্রেষ্ঠ রং, সে ধারণা কোন দিনই ঘুচল না। আমাদের মনে গেঁথে গিয়েছিল 'টীচার' আর কত্তামার 'খৃষ্টান' বস্তুত দুই-এ মিলে দাঁড়াল

আমাদের মনে গেঁথে—ফিটফাট মানে টীচার আর টীচার বুঝি খৃস্টান ছাড়া দুনিয়ায় নেই।

যেদিন ওঁরা এস্রাজ, বেহালা সঙ্গে আনতেন সেদিন আমরা সব কিছু ফেলে ভেতর-বাড়ির বারান্দা থেকে ছাদের সিঁড়িতে গেড়ে বসে থাকতাম। প্রথমে কাজ আর কাজের কথা। কাকে কি সেলাই বরাত দেওয়া হয়েছিল, খাতা দেখে মিলিয়ে 'বুঝ' নেওয়া চলত—হিসেব করে মোট মজুরির টাকা মায়ের হাতে দেওয়াব পর, নতুন কাজগুলো একে একে বুঝিয়ে দেওয়া হত। সাধারণ ঘরের মেয়েদের হাতের বেডকভারে এমব্রয়ডারি কাজ, ক্রুশে বোনা টেবল ক্লথ, ডয়লি, খঞ্চিপোশ, পুঁতির ঝালর দেওয়া কত রকমারি সূচিশিল্প এই বৈঠকে দেখতাম তা আজ ভাবলে অবাক লাগে। কিছুই ত বুঝতাম না, শুধু ভাল-লাগাতেই সব সমঝদারির শেষ। টীচাররাই কাপড়, সুতো, ছুঁচ, থিমবল, ফ্রেম সব সঙ্গে আনতেন। মায়ের কাজ ছিল ম্যাচিং সুতো আর তার পরিমাণ হিসেব করে গুছিয়ে নেওয়া। নীরদা দিদি সেলাই বেশ ভালই বুঝতেন তবে 'সাবিত্রীদি'র চয়েসের কাছে সর্বদাই নতি স্বীকার করতেন। মাকে উনি কখনো ওই নামে ডাকতেন, কখনো প্রিন্সিপ্যাল বলতেন।

কথা হচ্ছিল আশু বোরেগীর সম্পর্কে তা থেকে আমরা কোথায় চলে এলাম। আপাতদৃষ্টিতে যোগসূত্র না দেখা গেলেও ব্যাপারটা মোটেই বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যাবে না। যে কিশোরটি নীরদা দিদিদের সাপ্তাহিক কর্মকাণ্ড চাক্ষুষ করেছে এবং এস্রাজ, বেহালার সঙ্গে সুর মেলানো কণ্ঠে প্রার্থনা-সঙ্গীত শুনেছে তার দৃষ্টির বাইরে আমরা যাই কি করে? অথবা তার সেই অপরিসীম কৌতূহল আর অতল বিস্ময়-জড়ানো মনের দরিয়ায় ভাসমান কোন্ স্মৃতিকেই বা অবান্তর বলে বাদ দেওয়া চলে তা কে নির্ণয় করবে? অতএব বিশল্য-করণীর বিশেষত্ব না জানা থাকলে গন্ধমাদন পর্বতটা বয়ে আনা ছাড়া উপায়ই বা কী! ভরসা এই যে, পাঠকের মত এমন সহৃদয় আর সহিষ্ণু বিশ্ব সমাজে বিরল।

পাইক আশু বোরেগীকে বৈরাগ্য ব্যামোতে ধরে নি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ মিলল যেদিন কৌশল্যা কাকী সংসার করতে এল। প্রথমে অবশ্য বাইরের

লোকে কিছুই টের পায় নি। তবে আমার মায়ের অজানা ছিল না। সুশীলা কাকী অনেক আগেই খবর দিয়েছিল, আশু কাকা দইহাটার ওদিকে কোথায় এক মেছুনীর সঙ্গে কণ্ঠী-বদল করেছে। একেবারে ঘর করতে আসার আগে দু-চার দিন এ পাড়াতে 'মাছ লিবাগো মুটা মাছ কেটে দিবো. মাছ লিবা গো—।' হাঁক পেড়ে মাছ বেচে গিয়েছে কৌশল্যা। আমাদের বাড়িতে যেদিন মাছ দিয়ে গেল প্রথম, সেদিন মা বলেছিলেন- মানুষটার খুব মুখ মিষ্টি আর দামও শস্তা নিল। পচাধচাও নয়—হয়ত বাজারে আমদানী বেশি তাই পাড়ায় ঘুরে কাটাতে চায়। তখন কাটা মাছের দর ছিল খুব বেশি হলে চার আনা সের। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। না-ই বা হবে কেন, রসগোল্লা-ছানাবড়াও চার আনা, দাম চড়লে পাঁচ আনা। দুধ টাকায় ষোল সের তাও মাসকাবারে পেমেন্ট। আর চাল—। বাড়ি বাড়ি মাথায় করে বস্তা বোঝাই চাল এনে ঢেলে ওজন করে দিত তমেজ মিয়া 'রাম-এ রাম—দুই-এ দুই—' করে টাকায় ষোল সের রামসাল। রাম দিয়ে শুরু করার রীতিতে হিন্দু-মুসলমান কোন ফারাক ছিল না; ধর্ম তখন পথেঘাটে ঘটা করে জাহিরের বস্তু ছিল না, ওটা ঘরে যত্ন করে রেখে যে-যার নিজের কাজ-কারবারে বেরুতো। অন্তত সাধারণ মানুষেরা ত বটেই।

পরে যখন কৌশল্যাও 'কাকী' হয়ে এল তখন সুশীলা কাকীর জন্যে মায়ের কাছে দরবার করে কিছু লাভ হল না। আশু কাকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হরির দোহাই পেড়ে বলে 'তাঁর দয়া হলে সেরে উঠবে তখন আসবে বই কি, এখানে পড়ে থাকলে দেখবে কে!' সুশীলার কি অসুখ সেটা আশু কাকা বলে না।

এই অবস্থায় একদিন কৌশল্যা এল কাকার ঘরে—একেবারে ছেলে কোলে করে। ছেলেটা হামাগুড়ি দেয়, তার কোমরে রুপোর গোট। কালো কুচকুচে তেল-পিছল নিটোল অঙ্গে রুপোর গোটের জৌলুষ যেন অমাবস্যায় চাঁদের উদয়। ছেলেটা মায়ের রং পেয়েছে, বাপেরও বলা যায়। এমনিতে হতকুচ্ছিৎ নয় তবে নাকের তলা থেকে দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত কে যেন ধারালো ছুরি দিয়ে চিরে দিয়েছে—সোজা নয়, তেরছা ভাবে কাটা। ওর মা বলে—'শংকরা আমাদের গোপাল। বোরেগীর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না তা বুঝি ঠাকুরের সইল না।'

পাড়ার লোকে ব্যাপারটা সুনজরে দেখল না, কৌশল্যা সেটা জেনেই

এসেছিল। তাই মাছের ঝুড়ি বঁটি মাথায় করে, ছেলেটাকে কাঁখালে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি মাছ বেচতে শুরু করল। নিজেই সাফাই গায়—'বোরেগীর কষ্ট দেখে মরা মানুষেরও চোখ ফেটে জল আসে! আর সবই ত সেই ঠাকুর।' কখনো বলে—'এইবার সুশীলাকে আনতে হবে। ছেল্যা ত তারই সে ত বোরেগী বিহ-হ্যা করা ইস্তিরি! গণক ঠাকুর যাই বুলুন সুশিল্যা বাঁজা তাই—ছেল্যা দিয়া উয়ার কোলে আমি আপন ঝাড়া হাত-পা হতে পারলে বাঁচি।'

আশু কাকার কোন বিকার বৈলক্ষণ্য নেই। ছেলেটাকে একটু আদর করে বটে, তাছাড়া আর সবই গতানুগতিক। তবে একটা ব্যাপার আমরা ছোট হলেও টের পেলাম, কৌশল্যা কাকী গলাবাজি ক'রে আশু কাকার ওপর হুকুম চালায়। এবং তার হুকুমেই আশু কাকা একদিন তেলপাকানো লাঠিখানা নিয়ে ফতুয়া গায়ে চড়িয়ে সুশীলা কাকীকে আনতে গেল রুকুনপুরে। যাবার আগে মায়ের কাছে একটু কান্নাকাটি করল—'বৌঠাক্রুযান, সুশিল্যাকে ত আনতে যেছি। কাজটা ভাল হ'ছে কিনা ঠাকুরই জানেন। তবে আপনার কাছে ব্যাগ্যেতা বৌঠাকরুযান সতীনে-সতীনে ঝগড়া-কেজিয়া হ'লে আপনাকে জগধাত্তিরির মত আগলাতে হবে। হেই বৌঠাকরুযান আপনিই ভরসা—।'

মায়ের এক বিচিত্র হাসি আছে, যে হাসি সত্যি ভরসা দেয়। সেই অনন্য হাসি হেসে তিনি বলেছিলেন—'বোরেগী ঠাকুরপো এসো গিয়ে! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে—! তাছাড়া সুশীলার বড় সাধ ছিল ছেলের!'

শংকরা বড় হয়ে উঠল আমাদের চোখের সামনে। বয়সে ছোট হলেও ওর হাসিখুশি ভাকাবুকো চালচলনে আমাদের খেলার দলে দিব্যি খাপ খেয়ে যায়। বা'র-বাড়ির উঠোন আর বারান্দা জুড়ে ঢালাও কানামাছি, কুমীর-কুমীর, চোর-পুলিশ খেলায় বিকেলটা কেটে যায়।

শংকরা শংকরা কোন্-খানে
পদ্ম বিলের মাঝখানে
সেখানে শংকরা কী-ঈ করে?
—কাদা ঘেঁটে ঘেঁটে মাছ ধরে— ।...

এই ধুয়োটা সবাই সুর করে গায়। শংকরা নিজেও বাদ যায় না। তবে,

ওর গন্না-কাটা ঠোঁটের ওপর দিয়ে 'খংকরা কাদা ঘেঁকে ঘেঁকে' উচ্চারণ হয়। তাতে সবাই হাসে, সে হাসিতে শংকরাও যোগ দেয়। চোর-পুলিশ খেলায় সে যখন চোর হয় তখন গোটা পুলিশ-বাহিনী হিমসিম খেয়ে যায়, আতা গাছের ডালে ডালে কাঠবেড়ালীর মত স্বচ্ছন্দে চলাচল করে, কখনো বা পাঁচিল বেয়ে ওদের বাড়ির পিছনে জাম গাছে শংকরা বসে বসে ছড়া কাটে··· খংকরা খংকরা··· ।

সুশীলা ভালবাসে। 'ব্যাটাকে'—খুবই ভালবাসে। নাওয়ানো-খাওয়ানো সবই মা ছাড়া হয় না ব্যাটার। কিন্তু যত ঝামেলা বাধে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ নিয়ে। সুশীলা মনে-প্রাণে চায় ছেলে মানুষ হয়ে উঠুক। তার জন্যে চেষ্টারও শেষ ছিল না। মুস্কিল এই যে, মায়ের চেষ্টা আগ্রহ যত বাড়তে থাকে ছেলের তরফের অনিচ্ছা তার দ্বিগুণ মাত্রায় ধেয়ে চলে। সাতখানা বিদ্যাসাগরের ছবিওলা বই লুচি হয়ে খতম করেও অজগরের আক্রমণ পেরিয়ে আয়ে আমটি খাওয়া হল না। অবশেষে ছেলের নতুন জামা-কাপড় এল এবং তার ফলে একেবারে এক্‌কাগাড়ি ছুটে গিয়ে ওই ঔষধ, পর্যন্ত পেঁছিল। এদিকে কৌশল্যার মাছ-বেচা পুঁজিতে টান পড়ল। দুই মা এবার সম্মুখ যুদ্ধে নামল। কৌশল্যাকে শংকরা দেখতে পারে না, ছোট হয়ে সুশীলা কিনা পেটের ছেলেকে পর করে দিচ্ছে। বড়মা বাড়িতে এলেই ছেলে বেরিয়ে যায় কিংবা মা-এর আঁচল ধরে ঘুরতে থাকে। বড়মা ডাকলে কাছে আসে না। 'তোর গায়ে মেছুনীর গন্ধ!' ব্যস কৌশল্যার চোপা ছোটে—'আরে আমার পুরুত ঠাকুরের বাচ্চা। বলি তোর কোন্ ম্যয়ের পয়সায় এ্যাতে লবাবী হচ্চে শুনি? তোর মা কোন্ বাড়ি থেকে টাকা এনে বাবুগিরির কড়ি জোগায় রে?'

মোট কথা ছেলেকে নিয়ে বড়-মা আর মায়ের ঝগড়-ঝাঁটি আশু বোরেগীর সংসার পাড়ার মধ্যে মেছোহাটা বসিয়ে দিল। সুশীলার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, তাতে আরও জ্বলে যায় কৌশল্যা। বলে 'বোবার শত্তুর নাই ভেবেচ? মুখ বুজে আমার শিলনোড়া দিয়ে আমারই দাঁতের গোড়া ভাঙবা তুমি। ওরে হারামজাদী!' যুদ্ধ এক তরফাই চলে। বোরেগী বাড়িতে পা দিলে কৌশল্যার ঝাঁঝ আরও বাড়ে।

আশু নির্বিকার। মুখ বুজে শুনে যায়। তার আওয়াজের মধ্যে হুঁকো টানার শব্দ। বেশি বাড়াবাড়ি হলে মানুষটা গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলে—'দুই

মাগীর জ্বালায় কি ঘর তেগ করব আমি। সিডা কি ভাল হবে? বল কৌশল্যা তোর মনের ইচ্ছ্যা খোলসা করে। আমার কী, ঠাকুরের দয়ায় খোল বাজালে প্যাটের ভাতের ভাবনা ভাবতে হবে না।'

আশু কাকার বিবাগী হওয়ার সংকল্প, কৌশল্যার পেটের ছেলের কাছ থেকে অযাচিতভাবে আনুগত্য অনুরাগ আদায়ের চেষ্টা আর সুশীলার ছেলেকে মানুষের মত মানুষ গড়ে তোলার সাধ—প্রত্যেকটিই যেমন আন্তরিক এবং পরস্পর ওতপ্রোতভাবে অচ্ছেদ্য তেমনি চরিতার্থ না-হওয়ার মত আলেয়াও।

এইভাবেই চলছিল আশু বৈরাগীর সংসার।

অথচ মাঝের গলিটার গায়ে প্রাচীরের এ-পারে আমাদের বাগানে কাপাস গাছের পত্তন হয়েছে ফুলের কেয়ারি ঘুচিয়ে। বাইরের বৈঠকখানার দালানে এক-হাঁটু গর্ত করে একটা হাত-মাকুর তাঁত-গাড়া তৈরি হয়েছে এক দিকে, আর এক দিকে ফ্লাই শাটলের দুখানা তাঁত চলছে। বিপ্রদাস কাকা আর নরেনদা আসেন, তাঁদের কাছে দাদা, জ্যোতিদা তালিম নিয়ে নিজেরাই তাঁত চালান কখনো। আমাদের ছুটির দুপুর কাটে চরকা আর তকলিতে সুতো কাটার কাজে। এ বাড়ির আবহাওয়া পাল্টে গেছে বিলকুল। যেমন শংকরাকে নিয়ে আশু কাকার সংসারে নিত্য কুরুক্ষেত্র—আশু কাকার বাড়ির হাওয়া বদলে দিয়েছে। তেমনি আমাদের পরিবর্তন বাবা খুব সুনজরে দেখলেন না। উইকেণ্ডে কলকাতা থেকে বাড়ি এসে এই কাণ্ড দেখে দাদার কাছে কৈফিয়ৎ তলব—'হ্যাঁ রে এসব কি হচ্ছে?'

দাদা খুব সহজেই বুঝিয়ে দিলেন—'ন্যাশনাল স্কুল উঠে গেল। পুরনো কাঠের দামে তাঁত, চরকা আরও অনেক জিনিস খুব শস্তায় পেয়ে কিনে ফেললাম। আমি ওখানকার পুরনো ছাত্র বলেই পেয়েছি। আর কেউ হলে তিন-চার'শ লাগতো। টাকাও জোগাড় হয়ে গেল। হরিদাস ধার দিল। পঞ্চাশ টাকায় এত জিনিস পেয়েছি যে, কিছু কিছু বেচে দেনা শোধ করেও লাভ হয়েছে, আর এগুলো ত উপরি! বেশ ভাল কাজ হচ্ছে বাবা। গামছা, কাপড় বুনে তাঁতীদের মজুরী মিটিয়েও আমাদের লাভ থাকছে।'

বাবা আর কিছু বললেন না। দাদা যে আর লেখাপড়া করবেন না সেটা

বুঝে গুম মেরে রইলেন। বহরমপুরের হাওয়ায় স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় উঠেচে তা তিনি জানেন। তবু ব্যবসাপাতি করে দাদা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে দেখে হয়ত একটু সান্ত্বনা পেয়ে থাকবেন। গোটা সংসারের দায় একা কলকাতায় থেকে সামলাবার জন্য পা-বাড়াবার আগে শুধু বললেন—'ছোট ভাই-বোনগুলোর লেখাপড়ার দিকে নজর দিস, শুধু চরকা কাটা নিয়ে থাকলে ত চলবে না। পরকাল ঝরঝরে না হয় সবার।'

দাদার অবশ্য সেদিকেও নজর খুব কড়া। আমাদের রুটিনের বাইরে একচুল এধার ওধার হ'লে রক্ষে থাকত না। আড়ং ধোলাই!

সদরে ঘটা করে তাঁত-চরকা চলে তার আড়ালে আরও অনেক ব্যাপার আছে যা আমাদের জানার কোন উপায় নেই। দাদার বন্ধু জগা মামা, ফণীদা, বিশু মামা এমনি আরও সবাই আসেন। তখন বৈঠকখানা ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি চাইতে হয়—'ভেতরে যাবো?'

—'কেন? কি চাই!' কিম্বা 'একটু পরে আসিস।' জবাব মেলে। ওর মধ্যে যে বিরাট রহস্য রয়েছে তারই টানে ছুতোনাতা করে ওই ঘরে একবার ঘুরে আসাটাই বড় কাজ।

তখন কি-বা বুঝি! মিশনের নীরদা দিদিরের আসরে একদিন বুক ফুলিয়ে একটা জরুরী খবর পরিবেশন করলাম—'এবার ত ইস্কুলে পিকেটিং হবে।' তখন কে জানতো যে, মিশনারিদের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তা ছাড়া পিকেটিং ব্যাপারটা যে কি তাও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বড়রা বলাবলি করে, পিকেটিং হলে আর পড়াশুনো করতে হবে না। নীরদা দিদি চশমার ফাঁক দিয়ে এক নজর আমাকে দেখে ছবিওয়ালা একখানা বই দিয়ে বলেছিলেন—'বেশ ত ভালই হবে তখন এই বইখানা পড়ে ফেলো। কেমন!'

পিকেটিং হ'ল না আমাদের হার্ডিঞ্জ স্কুলে। তবে অন্য কোথাও নাকি হচ্ছে। সুনীল, চরণ, শিবু, গোলমরিচ, অমিয় সবাই গঙ্গার ধারে যায়,

লুকিয়ে বিড়ি খায়—সবাই খায় না, তবে যায়। দেখার মধ্যেও উত্তেজনা কম নেই। আমাকে প্রথম প্রথম ডাকতো, কিন্তু অত সাহস আমার নেই, তাছাড়া বিড়ি খাওয়া যে আদৌ দেখার মতো ব্যাপার সেটা মাথায় যায় নি, তার চেয়ে মারের ভয়টাই বড়। আরাধনবাবুর বেত। তারপর বাড়িতে দুরমুষও অনিবার্য—। সঙ্গে যাওয়া আর খাওয়াতে কোনো তফাৎ নেই, বেত্রাঘাতে চরণ আর অমিয়র হাত ফেটে রক্ত বেরিয়ে প্রমাণিত হল একদিন। দিদির ভাসুর-পো শিবু। আমাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শেখার উদ্দেশে তার বিধবা মা পাঠিয়েছেন, লুকিয়ে ধূমপানের অপরাধে দাদা শাস্তি বিধান করলেন—এক-নাগাড়ে চারঘণ্টা চরকায় সুতো কাটার। বড় হয়ে শুনেছি যে কোনও অপরাধ, এমন কি লুকিয়ে প্রেম-করার অপরাধেও দাদারা হয় চরকা নয় তকলি শাস্তি বিধান দিতেন এবং যাতে সেই সাজা ঠিকমত হাসিল হয় সেদিকেও প্রখর প্রহরা থাকল।

দাদাদের দলের হাতেই যেন পাড়ার লোকের সহবৎ শোধরানোর আদালত—ভয়ে হোক, বা যে-কারণেই হোক এটা মেনে নিয়েছিল সকলে।

কিন্তু আসল ক্ষমতার মালিকেরা যে এতে মোটেই স্বস্তি বোধ করছিলেন না, তার প্রমাণ এক শীতের শেষ-রাতে পাওয়া গেল। বাড়ির সামনের রাস্তা, পাশের গলি এবং যেখানে সম্ভব লাল পাগড়িতে ছেয়ে গেছে। ভারি বুটের শব্দে দাদার ঘুম ভেঙে গেল। জানলার ফুটো দিয়ে আশু কাকার বাড়ির দিকের গলিতে আয়োজন দেখে তিনি, পাশে ঘুমন্ত জ্যোতিদাকে খুঁচিয়ে তুলে ইশারায় বিপদ বুঝিয়ে দিলেন। জ্যোতিদার স্বাস্থ্য বেশ পালোয়ানী, কিন্তু পুলিশে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে বুঝে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'কি হবে?'

দাদা বালিশের তলা থেকে রিভলবার বার করে জ্যোতিদার হাতে দিয়ে বললেন—'বাগানের ভেতর দিয়ে, গর্তের জলাটা সাঁতরে পার হয়ে ছুতোর পাড়ায় পড়বি, তারপর জঙ্গলে জঙ্গলে লোকনাথ ভট্চাযের বাড়ি, বুঝলি।'

জ্যোতিদার হাত-পা অবশ। গুঁতো খেয়ে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

দাদার ধমক পড়ল—যা বলছি। এক মিনিট দেরি করলে সর্বনাশ।

—তুই কি করবি ?

—দেখতেই পাবি। তুই পার হয়ে যা মাল নিয়ে—

তারপর দাদা আর জ্যোতিদা পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে। জ্যোতিদা চলে যাবার পর, দাদা বাগানের দিকের পাঁচিল টপকে ভেতরের বাড়িতে গিয়ে মাকে ঘুম থেকে তুললেন—'মা, আমি কি পালাবো ?'

মা নিমেষে গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে শান্তভাবে জবাব দিলেন—'না বাবা, পালিয়ে কোথায় যাবি। ওদের রাজত্বে কি পালিয়ে বাঁচতে পারবি ? তার দরকার নেই। যেমন ছিলি বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। আমি এদিকে তোদের প্রেসের টাইপগুলো গলিয়ে ফেলি, নইলে ওগুলো নিয়েই ফ্যাসাদে পড়তে হবে।'

মায়ের কথায় দাদা নিশ্চিন্ত হয়ে বৈঠকখানায় চলে গেলেন।

তখনকার দিনে রাত দুপুরে বাড়ি ঘেরাও করলেও এখনকার মত পুলিশ চট করে ভোর হওয়ার আগে খানাতল্লাসি করত না। অন্তত আমাদের বাড়িতে করে নি।

পুলিশের দলের নেতৃত্বে এসেছিলেন বড় সাহেব নিজে এবং তিনি আমাদের এক দূর সম্পর্কের মামার শ্বশুর। যথাসময়ে তিনি ঢুকলেন এবং এবং দাদা তাঁর বডি সার্চ করে নিলেন—'দাদামশাই আপনি কিছু অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে এনে ফাঁসাবার তালে আছেন কি না সেটা আমায় দেখে নিতে দিন তারপর ঢুকবেন।'

দু-তরফেই সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলির লড়াই চলল। দাদামশাই প্রথমে ঘরে ঢুকেই একেবারে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন—বাঃ, ম্যাজিক! দাদু গো এখনো যে ছাপ রয়েছে! কিন্তু মাল কোথায় ? আর তোমার শয্যাসঙ্গিনীটিই বা কোথায় ?

—দাদুর কি নেশার ঘোর কাটে নি ? কি বাজে বকছেন ?

—তা বটে। দুটো বালিশে কি একাই শুচ্ছ ? বলি সেটি কোথায় ?

—রাতে যারা শরীর ভাড়া দেয় তাদের কি এক জায়গায় থাকলে চলে দাদু। অন্য কোথায় বেশ্যাগিরি করতে গিয়েছে।

বৈঠকখানায় হাঁটকে হাঁটকে কিছু পেলেন না। বারান্দায় বসে একটু জিরোচ্ছেন তিনি। লোকজন কাজ করছে। বোধহয় সাহেবের কথাবার্তায় তারা একটু ভদ্রভাবেই দেখছিল। এমন সময়ে ছোট ঘরের দরজা খুলে মা মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করলেন—হ্যাঁ রে বরুণ, কে এল এই ভোরে ? কার সঙ্গে কথা বলছিস ?

—দাদামশাই এসেছেন !

—ও মা তাই নাকি। এতক্ষণ বলিস নি। ছি-ছি ! বসুন তাহে মশাই। আমি আসছি।

দাদামশাই উঠে এলেন এবং মা তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন—আমি একটা বিশেষ কাজে এসেছি মা। তুমি বুদ্ধিমতী এর বেশি বলা দরকার হবে না।

—আপনার কাজ নিশ্চয় করবেন তাহে মশাই। তবে আমার কাজও ত আমাকে করতে হবে। একটু চা খেলেই আমি খুশি হবো।

—আজ থাক মা।

—না, না, আবার কবে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে, তার ঠিক কি। আপনারা ভেতর বাড়ি তল্লাসী করতে করতে উনুন ধরে যাবে তাহে মশাই।

পুলিশের বড়সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন, 'না মা, আমাদের ভেতর বাড়িতে যাবার দরকার হবে না। শালা আমার ওপর দিয়ে যায়। খুব ফাঁকি দিয়েছে মা। তা এত ভোরে উনুনে আঁচ ?'

—ঠাকুর সেবা আছে। ছেলে-মেয়েদের ত জলখাবারও কিছু করতে হয়।

আমাদের বাড়িতে কিছু পাওয়া গেল না কিন্তু মাল বেরুলো আশু কাকার ঘর থেকে। ভেতর বাড়ি সার্চ না করে আশু বোরেগীর বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়ে একটা টিনের সুটকেশ বোঝাই নিষিদ্ধ বই বার করে ফেলল। বই ত নয় এক সুটকেশ গোখরো সাপ—এর যে কোন একটিই যেন দুর্বল ইংরেজ সরকারের মত গোবেচারি মানুষটির প্রাণনাশ করার পক্ষে যথেষ্ট। অতএব বিদায় নেবার সময়ে পুলিশ সাহেব দাদামশাই বেশ হাসিখুশি।

আশু কাকাকে সুটকেশ সমেত থানায় ধরে' নিয়ে গেল। অবশ্য থানা পর্যন্ত টানাটানির দরকারই হত না। যদি এখানেই ভালয় ভালয় আশু কাকা কবুল করত সুটকেশের আসল মালিক বরুণ। তা না করাতেই ঝামেলা পোহাতে হল তাকে। থানার হাজতে যথাবিহিত মেথড প্রয়োগ করেও কোন লাভ হল না। আশু কাকাকে জেরা করে এইটুকু কবুল করাতে পেরেছিল পুলিশ—'আজ্ঞে আমি মুখ্যু মানুষ লেখাপড়া জানি না এডা সত্যি কথা। গলায় কণ্ঠি আছে, ভগবানের দয়ায় আমরা সবাই বেঁচে আছি। তবে ইডাও সত্যি সুটকেশটা যখুন আমার ঘরে পেয়েছেন তখন উয়াব মালিক আমি। উয়াতে কি লেখা আছে জানি না বাবু। তবে উয়ার জন্যে যা সাজা হয়, জেহেল-ফাঁসি যা আপনাদের বিবেচনায় বিচার হয় সেই সাজা বাহাল করুন। আমি মাথা পেতে তাই লিবো মেনে। ব্যস ফুরিয়ে গেল—'

কিন্তু অত সহজে ফুরোতে দিতে পুলিশ কেন রাজি হবে। তারা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দাদাকে টানতে চায়। অমনি জিভ কেটে আশু কাকা মাথা নাড়ে—ওরে বাপরে, অমন কথা মুখেও আনতে নাই। বরুণকে আমি সন্তানের চেয়ে বেশি ভালবাসি, দেবতার মত ভকতি করি। উয়ার তুল্য ছেল্যা ভুভারতে দেখি নাই। বুলছি ত বাবু মশাইরা আমার কথার নড়চড় করাতে পারবেন না। আমার ঘরের দুট্যা বৌ, এক ব্যাটা, খোল-কত্তাল সবই যেমুন আমার দায় তেমনি এই সুটকেশও আমার। বই পড়তে পাল্ল্যাম আর না-ই পাল্ল্যাম তাথে আপনার কি দরকার। ফাঁসি দিবেন ত তাই দ্যান ক্যানে। কেহু বাঁচবে না মশাই, সবাইকেই একদিন না একদিন মরতে হবে।—হরি হে পার করো।

আশু কাকা নির্যাতন, পীড়ন সবই হজম করল এবং হাজত থেকে এবং পরে জেলেও দিন কয়েক কাটিয়ে এসেছিল।

ফিরে হাসতে হাসতেই গল্প করেছিল—বুঝল্যা বাবাজী। তাজ্জব জায়গা বটে এই জেহেল। সরকার বাহাদুরের জেহেলে না যেলে ত কিছুই জানতে পারত্যাম না বাবা। তা জেহেলে উয়াদেরও কীর্ত্তন শুনাত্যাম। হাজার হোক শালোরা ত আসল পাতকী, কীর্ত্তন বুঝি প্যাটে সইল না তাই বললে—ওই বোষ্টমটাকে বিদ্যায় করো, লইলে ধম্মের রোগে নরক জাজিয়ে দিবে। বুঝল্যা!

অনেক কাল পরে আশু কাকা আবার হাঁক দিল—সুশুল্যা—তামুক সাজ।

আমরা চরকা থামিয়ে আশু কাকার জেলের গল্প শুনছিলাম। স্বদেশী করার জন্য জেলখাটা মানুষ জীবনে সেই প্রথম দেখলাম।

॥ নয় ॥

ঝোলা বাদুড়ের মতো সব আগে বাসের গা থেকে ক'জন খসে পড়ল। পা-দানী আর ভেতর থেকে ভলকে-ভলকে মানুষ উগরে দিচ্ছে ডবলডেকার এগারো নম্বর। পিল্‌-পিলিয়ে জনা পঁচিশ-ত্রিশ ভূমি স্পর্শ করার পর নীচের লোকগুলো যেন দল পাকিয়ে ব্যারিকেড করল—বাকী যারা নামার তাদের সঙ্গে লড়াই। মিনিট দুই-এর মধ্যে আরও খান-তিনেক বাস হাজির হয়ে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় একটি মাথার শীতের রাতের ধোঁয়া-ধুলো আর আলোর মধ্যে শ-খানেক নতুন মাথা দিয়ে ভিড়কে আরও জাঁকিয়ে তুলল। ট্যাক্সি-টেম্পো-ট্রাকের স্ব-স্ব শ্বাস-প্রশ্বাসের গর্জন, ভিখিরিদের করুণ আবেদন-নিবেদন, ধৈর্যচ্যুত যাত্রীদের আক্ষেপ-বিরক্তির সঙ্গে ফুটপাথের গায়ে সাজানো ফুলের দোকান থেকে ভেসে আসা রজনীগন্ধা, গোলাপ ইত্যাদির মিলিত সুবাসকে কোন্‌ পরিহাসরসিক চট্‌কে-চট্‌কে মাখচে। জিপসি-জিরেনিয়াম-অ্যাস্টর আর লেডিজ-লেস খুব খুশি—ওদের ত কোনো সৌরভ নেই তাই নির্লজ্জ রূপ দিয়েই ছন্দ রচনা।

ভিড় থেকে নিজেদের আলাদা করে নেওয়ার মানসিক দ্বীপে পেঁছে পায়জামা পাঞ্জাবি পরা ছোকরাটি তার সঙ্গীকে বলল—গুরু, এইভাবে আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে বেরুবো না। শা-ল্‌-লা, চামচাটা যা কিচেন জুড়েছিল, আমি ত ভয়েই কাঁটা – শাল্‌-লা এই বুঝি তোর কাছে ঝাড় খেয়ে যায়।

তার পিঠে চাপড় মেরে ঝাঁকড়া চুলঅলা দুলে-দুলে হাসে।—আরে বাচ্চু, ভেড়া স্রেফ ভেড়া! তুই যাচ্ছিস যা না, আমি বাসের ভাড়া দিই না-দিই সেটা ত পার্সোন্যাল অ্যাফেয়ার। দেখিচ এই বুড়োগুলোই যত ঝামেলা পাকায়।

—সে যা-ই বলো সমীর, ব্যাপারটা বেশ রিস্‌কি। যদি ওর তরফে দলভারি হ'ত চাই কি উল্টো ধোলাই দিতেও পারতো।

মুখখানা ওপর দিকে তুলে তাচ্ছিল্যের হাসিতে ভরা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সমীর মন্তব্য করে—আর বাদল তখন ঘোমটা দিয়ে কি করতো? সাপোর্টারের অভাবে মার খেতুম।

—যাঃ মেলা ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিস না। বাসের টিকিট নয় জাল হতে পারে তা বলে এই জার্নিটা ? সেটা ত রিয়্যাল—। বালীগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার তোমায় গাধাতে বয়ে আনলেও ত তার মজুরী আছে একটা—প্লাস টাইম্‌ফ্যাক্টর।

বাদলের দিকে সমীর ভস্মলোচন দৃষ্টির হেড্‌লাইট স্থির ভাবে ফোকাস করল। মিনিটখানেক দু'জনেই নির্বাক।

একখানা ট্যাক্সি হাঁক জুড়েছে—নাগের বাজার, নাগের বাজার।

বাদল আড়াআড়ির অস্বস্তি কাটাতে চায়, বলে—শালা, মিটারের দাম চড়িয়ে খুব ফ্যাচাং হয়েছে, এখন কেউ ট্যাক্সির ধার মাড়তে চায় না।

অপর তরফের কোনো সাড়া এল না।

—কী, দু-একটা টান পেসাদ দিবি ? নাকি একাই—

সিগারেট এগিয়ে দিয়ে সমীর গম্ভীরভাবে বলল—জার্নির কথাই যদি ধরো, তবে আমি এটাকে মোটেই মূল্য দিতে নারাজ। বিকেলে যেখান থেকে যাত্রা করেছিলাম, চার ঘণ্টা পরে সেখানেই ফিরলাম—এর মধ্যে কোনো ফারাক নেই। শালা বিমান চৌধুরী না দিলে কিছু আশাভরসা—এক ঘণ্টা বসিয়ে রেখে—

বাদলও এ ব্যাপারে একমত—পয়লা নম্বর বাস্তুঘুঘু। এই যে ভাই এক মিনিট প্লীজ একটু বসুন—আর দু' মিনিট ! এমন রেলা দিচ্ছিস যেন পকেট থেকে বার করে' অফিসার গ্রেডের চাকরির চিড়িয়া ধরিয়ে দেবে।

'ফুঃ-ফু' টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে সে মুখ বিকৃত করে।

সমীর এবার তর্জনী উঁচিয়ে মাস্টারী ভঙ্গিতে শুরু করল—নাউ দেন মাই বয়, ইউ সী ! দিস্ জার্নি লীড্‌স ইউ টু নো হোয়্যার ! অন্ধকার পূর্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনি। দেয়ারফোর এটা আদৌ কোনো সফর নয়। মোট বেকারের সংখ্যা আগেও যা ছিল এখনো—অতএব যেটা মোটেই গতি নয়, আর যারা তোমার দুর্গতির সুযোগ নিচ্ছে সেই সকল ধোঁকাবাজীর জন্যে, বাপের রোজগারের কড়ি ওড়ানোর রাইট তোমার থাকতে পারে না। সে মানুষটির সামর্থ্যই বা কতটুকু !

যদিও দুজনে সমবয়সী এবং ছোটবেলা থেকে একই সঙ্গে বড় হয়েছে তবু বাদল সময়ে-সময়ে ভয় করে। বস্তুত ভয়টা সমীরকে নয়, বাদলের পৈতৃক

অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো—এই অপরাধেই যেন সে নিজেকে অপরাধী ভেবে বসে। আজকের ব্যাপারটায় মোটেই তার সমর্থন ছিল না। কত লোকই ত তাদের লক্ষ্য করেছে। সবচেয়ে বিশ্রী লেগেছিল তখন—যখন লেডীজ সীটের মাথার রড ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থায় একটি মেয়ে তাদের পাশ থেকে প্রশ্ন করেছিল—'কোথায় যাবেন আপনারা? আমি বরং টিকিট কাটছি।' বাদল যেন শুনতেই পায় নি এমন ভাব দেখিয়ে কাশীর ওষুধের বিজ্ঞাপন পড়ছিল। সমীর দিয়েছিল জবাব 'নো থ্যাংকস! এটা ম্যাটার অব প্রিন্সিপল ম্যাডাম!' বলার ভঙ্গি মোটেই সবিনয় হয় নি। বাদলের কানে বেজেছিল—সে কথার রেশ যেন এখনো রয়ে গেছে। সমীরটা দিন দিন কেমন খিট্‌খিটে হয়ে যাচ্ছে।

বাদল বলল—চাকরি শালা ভাগ্যে নেই। কলকাতা না ছাড়লে আখেরে আমড়া।—তোর নয় মেসো আছে বম্বেতে। কিন্তু আমার নড়তে গেলে সেই নিমতলা কি কাশীমিত্তিরের ঘাট।

—তোর রকম দেখে মনে হচ্ছে, সেই যে চোখ-বাঁধা বলদের মতো···নাকি একটা গান আছে - আঙুলে তুড়ি দিয়ে এই বুঝি গাইতে শুরু করবি—সেইটা শোনাবি। না, না, গুরু এমন মিইয়ে পড়লে মরে যাবি। চাঙ্গে জী চাঙ্গে।

একটা দীর্ঘশ্বাস হারিয়ে গেল কোথায়। সমীর ম্লান হেসে উত্তর দিল—শালা বাঁশের মতো গলা, নইলে সে-চান্স বাগানো শক্ত ছিল না কিছু। তাহলেও ত পকেট মানি জোটানো যেত।

একটু চুপ থেকে আবার বলল—সবচেয়ে ট্র্যাজেডী কি জানিস, মুন্নী-যে-মুন্নী সেও চাকরি পেয়ে গেল। কথায় কথায় শুনিয়ে দেয়, ঘরে বসে বসে একের পর এক সিগ্রেট না ধ্বসিয়ে একটু চেষ্টা করলেও ত পারো দাদা। আরে চেষ্টা মানেই ত উমেদারী—তার খরচাই বা আসে কোথা থেকে।

ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চায় বাদল—আরে রাখো, প্রাইমারীর মাস্টারী আবার চাকরি। ক্লাস ফোর স্টাফের চেয়েও ওদের আয় কম। এ সব না ভেবে বরং আয় জয়েন্টলি একখানা লটারীর টিকিট কেনা যাক।

—এক লাফে লাখপতি? মন্দ নয়। তবে টাকাটা হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া তার চেয়ে ভালো।

—কেন—কেন ?

—ছাপানো টিকিটখানা যখন ভেংচী কেটে বলবে খট্-খট্ লব-ডঙ্কা তখন বিমান চৌধুরীর শুকনো 'প্লীজ আর এক মিনিট ভাই'-এর চেয়েও সেটা বিশ্রী লাগবে। জেনেশুনে নিজেকে ধাপ্পা দেওয়ার কোনো মানে হয় না।

—তবে এখানে বুদ্ধুর মতো আমরা দাঁড়িয়ে করছি কি। চল্ বাড়ি যাই।

বাদল পা বাড়ায় গর্জমান একখানা প্রাইভেট বাসের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে পিছন ফিরে সঙ্গীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাঁক দিল—কি রে কি হ'ল ?

কথা ছুঁড়ল সমীর—তাড়া থাকে ত তুই যা।

বাদল ফিরে এল।

সমীর বলল—হাঁড়িখেলার কোম্পানিতে জুটে গেলে কেমন হয় বাদল। গুরু বেশ আছে।

—দূর। তোর যতো উদ্ভট আইডিয়া। এরপর কোন্দিন বলবি জ্যান্ত সাপ-গিলে উগ্রে দিলে কেমন হয়। আরে, যার যা পোষায় তাই নিয়ে মাথা ঘামানোই ভালো। রাত কম হল না—

সমীর তার কথায় কান না দিয়ে ফুটপাথের ওপর ততক্ষণে টিউবলাইট ভাড়া দেওয়ার জন্যে বসে-থাকা লোকটার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে। জ্বলন্ত একটা লাইট খাড়া করা আর দু-পাশে এক গাদা শাদা-শাদা রড সাজানো, তার মধ্যে ওই লোকটা বসে বসে বিড়ি টানছে। ভাড়া দেয়, না, বিক্রি করে কে জানে।

পিছু পিছু সেও গেল। না, অকারণে শামুকের মতো মন্থর গতিতে সেখান থেকে সমীর আবার চলতে শুরু করেছে। বাদলের চোখের সামনেই হাফশার্ট গায়ে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা একটা লোক সমীরের হাত চেপে ধরল। এবার বাদলও স্পীড বাড়িয়ে দিল। তার নজর এখন গোঁপের দিকে, বদ্খদ্ বেতমিজ চেহারার লোকটার গোঁপের তলা থেকে থেমে থেমে কথা বেরোচ্ছে—ওসব কোনো কথা শুনছি না। আজ কিছুতেই ছাড়বো না।

কিন্তু সমীর !

সমীর কি আশ্চর্যরকম শান্ত। বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। এমন বি
আক্রান্ত হয়ে দোসরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ফিরেও চাইছে না।

বাদল থমকে দাঁড়াল, লোকটা কায়দা করবার আগেই যাতে মোক্ষম বাং
দেওয়া যায়।

—আজ দাদা আপনাকে একটা গোলাপের তোড়া নিতেই হবে। জো
ক'রেই দোবো, হ্যাঁ।

বাদল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না।

সমীর হাসছে—আর খদ্দের পেলেন না!

—খুব সস্তা, মাইরী আপনার গা ছুঁয়ে বলছি একটা নয়া লাভ রাখবো না
আপনাকে ত রজনী নিতে বলছি না। কেন? ওগুলো বাসি। যা দিই
কোনো কথা না বলে নিয়ে যান।

—কিন্তু—

—কিন্তু-ফিন্তু না। আজ আমার কথা রাখুন। মাইরি সন্ধ্যা থে
হাজারো জেল্লাদার শাড়ি আর সাজ, স্যুট-শালের বাহার দেখে দেখে চোখ প
গেল কিন্তু বিশ্বাস করুন, একটা মানুষও ফুলের দিকে ঘেঁষলে না!

বাদল এবার লক্ষ্য করে রেলিং-এর গায়ে সারি-সারি ফুলের দোকান
কতো রকমের ফুল—মালা, মুকুট, তোড়া। অর্থহীন এই বাহার। লোকটা
সঙ্গে সমীর শুধু-শুধু কথা বাড়িয়ে অযথা আশা জাগাতে চাইছে কেন
কেন হাত ছাড়িয়ে চলে আসছে না।

থাকতে না পেরে বন্ধুকে উদ্ধারের জন্য হাঁক দিল—কি হ'ল সমীর তুমি
যাবে না? কী রেলা করছো!

লোকটা তাকে আশ্বাস দিল—এক মিনিট সবুর করুন দাদা!

ব'লে সে ত্বরিতে কয়েক গজ দূরে দৌড়ে গিয়ে কাঠের টেবিল থেকে আঁ
বাঁধা একগুচ্ছ গোলাপ এনে সমীরের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—যা খুশি
আপনার দিন, তাই হাত পেতে নেবো।

সমীর বিব্রত হয়ে একবার লোকটার মুখের দিকে তাকায়। বাদলও [illegible]কিয়ে দেখে, এখন তার মনে হয় বয়সে তাদের চেয়ে বিশেষ বড় নয়।

—দিন, দিন, কোনো কিন্তু করবেন না। বউদিকে দেবেন, কতো খুশি হবেন তিনি। কতো পয়সাই ত কত দিকে যায়—

বাদল বলল—আপনি কি শাহানশা-বাদশা ঠাউরেছেন আমাদের?

—তা কেন ভাববো দাদা। হরিদাস পাল-কেও ত বাঁচতে পেটে খেতে হয়। অভাব কার নেই দাদা। তবে ওর মধ্যেও একটু রং চাই বই কি! রোজ-রোজ ত আবদার করবো না, করলেই বা শুনবেন কেন। আমরা মানুষ চিনি মশাই। দাদার চোখে আছে ফুলের নেশা—আপনি আর জ্ঞান দেবেন না দোহাই—

এবং বাদলের চোখের সামনে সমীর পকেটে হাত পুরে দিল।

তারপর আর কি বাকী থাকে। লোকটা ছিনিয়ে নিয়েছে সমীরকে।

বিরক্ত ও হতাশ বাদল সেখান থেকে ছিটকে দোকানে গিয়ে সিগারেট কিনল এবং ধরালো। দুনিয়া উল্টে দেওয়ার মতো এত বড় কান্ড চাক্ষুষ করার [illegible]কল সামলাতে হবে ত।

দার্শনিকের মতো উদাসভাবে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে গোটা ব্যাপারটা [illegible]জম করতে চেষ্টায় যখন ব্যাপৃত, তখন বাদল টের পায় এক সময়ে সমীর পছনে এসে দাঁড়াল। গোলাপের সুবাস খবর দিল সমীরের উপস্থিতির। [illegible]ড়া ক'রে লম্বা একটা টান দিয়ে বাদল নিজেকে ফুলের গন্ধের হাত থেকে [illegible]ক্ষার জন্য তামাকে-কাগজে-মেশানো তিক্ত চৌয়াটে ধোঁয়ার জাল ছড়িয়ে দিল। গোলাপের মধুর মদির গন্ধকে চাপা দিতে পারে একমাত্র পেট্রোল / ডিজেলের [illegible]ৎকট ধোঁয়ার বেড়াজাল, সিগারেটের ধোঁয়ার খ্যাপলা জালে কি সেই প্রতিক্রিয়া [illegible]ম্ভব নাকি!

তা ছাড়া সমীরও ব্যারিকেড সরাবার জন্য তৎপর। কাঁধে হাত রেখে লঘু [illegible]লে বলে—আরে ইয়ার থোড়া পরসাদ ত দেবে?

অপর তরফ বাক্যব্যয় বাদ দিয়ে গম্ভীর ভাবে ধূম্রশলাকাটি এগিয়ে দিল। [illegible]মীরও হাতে ধরা ফুলের তোড়াটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—এটা নে।

—না।

—আরে, দুটো গন্ধ একসঙ্গে পেটে ঢুকলে রক্ষে থাকবে না—একেবারে [illegible]থেন গ্যাস।

বাদল রুক্ষ স্বরে ফোড়ন কাটে—গ্যাস খেয়েই ত ওই ভুষিমাল গছে' গেলে, কাজেই গ্যাসের কুণ্ঠি কেটো না।

—কোন্ শালা গ্যাস খেয়েছে।

—থাক। বাহাদুরী ঢের দেখেচি। নইলে লোকটা তুড়ি মেরে 'জ্ঞান দেবেন না' বলার পরও তুই কি না গ্যাঁটের কড়ি খসিয়ে, কি না, এই রাবিশ-গুলো কিনতে পারতিস? উঃ—

সমীর সাধাসাধির সুরে বলে—গুরু তুমিও যদি খচে' বোম হয়ে যাও তবে মরে যাবো!

বাদল নিজেকে শক্ত করতে চায়—প্ল্যাটফর্ম লেকচার ঢের শোনা আছে। একবার বাস ভাড়া ফাঁকি দিবি, বলবি জাল টিকিট পয়সা দিয়ে কেনা মানেই সমাজ-বিরোধীদের আস্কারা দেওয়া। গলাবাজী করে আদর্শবাদের জিগির তুলবি। আচ্ছা, আর্গুমেণ্ট হিসেবে নয় মানা যায় যে, পরের রোজগারের পয়সা যতোটা পারা যায় বাঁচানোর মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল নোশন আছে। আবার সেই ছ্যাঁচড়ামির পয়সা দিয়ে যখন প্যানপেনে পুঁটুসুন্দরীর প্রেমিকের মতো গোলাপ কিনবি তখনও তোর ধামা ধরতে হবে? কেন, আমি কি তোর চামচা নাকি!

আহত সুরে সমীর বলল—কেন কিনলাম সেটা জিগ্যেস না করে যা ইচ্ছে ফতোয়া দিয়ে দিলি? এককাল ধরে শেষে তুই এই চিনলি বাদল?

কোথায় যেন ঘা পড়ল। তবে কি বেপর্দায় টান দিয়ে ফেলেছে? বাদল শুধরে নিতে চাইল—তুই ভেবে দ্যাখ, বেমক্কা বাজে খরচ কি না এটা?

—বাজে কিনা সেটাও কি বুঝি না?

বাদল অবাক হয়ে আর একবার বিভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে বন্ধুর মুখমণ্ডলে যুক্তির সংকেত সন্ধান করতে মুখ ফেরালো।

সমীর বলল—ধর, ফুলগুলো।

এবার আপত্তি করে না বাদল।

প্রশ্ন করে—হেঁয়ালী রেখে বল তো। আবার কোথাও ডিগবাজী খেয়ে বসেছিস নাকি!

—দূর-দূর! ন্যাড়ার বার বার বেলতলায় যেতে বারণ। লিপিকে দিয়ে

পুরো শিক্ষা হয়ে গেছে।

—তবে ?

—লোকটা কে ? চিনিস ওকে ?

—কে আবার, ওই ফুলওয়ালা—তবে বহুত খলিফা। নে ঢের হয়েছে, এবার বাড়ি যাবি ত ?

—যাবো বই কি ! তা ছাড়া আর কোন্ চুলো আছে।

সিগারেটে মাঝে মাঝে টান দিচ্ছে আর কী যেন মনে মনে ভাঁজছে সমীর। অন্যমনস্কভাবে বাদল গোলাপের একটা পাতা ছিঁড়ে নখ দিয়ে খুঁটতে থাকে।

এক সময়ে সে কথা শুরু করল—ওই লোকটার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয় সেদিন কিন্তু অন্যরকম ছিল।

সমীর এমন মিয়োনো সুরে কথা বলছে যেন সে অনেক দূরে চলে গেছে। বাদলের অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। সমীর ক্রমে লিপির প্রসঙ্গে পেঁছিবে ঠিক জানে বাদল। আর তারপর ওর চনমনে প্রাণচঞ্চল স্বভাবে ফিরে পেতে বেশ কয়েকটা দিন কেটে যাবে।

বাধা দেবার জন্যে—এই ধ্বংসের মুখ থেকে বন্ধুকে সরিয়ে আনার জন্যে কি উপায় বার করা যায় বাদল হাতড়ে বেড়ায়।

চোখ বুজে সমীর বলে চলেছে—বাদলার রাত। আমরা দুজনে সিনেমা থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটছি। লিপি আর আমি। পথটা খাঁ-খাঁ করছে। শুধু বাতিগুলো আর দু-একটা রিকশা। জল জমে বিধান সরণি থই থই। ট্রাম বন্ধ। ফড়েপুকুর দিয়ে সার্কুলার রোডে পড়বো। গলিতেও লোকজন নেই। হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক আমাদের সামনে পথ আগলে দাঁড়াল। 'খবরদার, কোন কথা নয়। একটু আওয়াজ করেছ কি—' বলে চকচকে একটা কানপুরীয়া চোখের সামনে চমকে দিল। 'জলদি দিয়ে দাও যা আছে, আর যেমন যাচ্ছিলে চলে যাও সোজা। নো ঝামেলা—'

রুদ্ধশ্বাসে বাদল বলল—তারপর ?

—লিপি ভয়ে শিঁটিয়ে আঁকড়ে ধরল আমায়। প্রথমে ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু ঘাবড়ে গেলে ত বাঁচা যায় না। বোঝো ফ্যাসাদ—

—কি করলি ? লড়ে গেলি।

—পাগল, আহাম্মকী হত না ?

—তাও ত বটে। স্যারেণ্ডার করা ছাড়া আমার মাথায় কিছু আসছে না।

সমীর বলল—স্যারেন্ডার। হুঁ। তারপর হীরো চুপসে কেঁচো হয়ে বাঁচতে পারে? পলকের মধ্যে একটা কিছু খেল্ দেখাতে না পারলে সরে যাওয়া ঢের ভালো। বুঝলি—বুদ্ধি খেলে গেল চটপট। বললাম, দাদা পকেট গড়ের মাঠ। সার্চ করে দ্যাখো।' লিপির কানের দিকে চেয়ে বলল—'খুলবে? না, টেনে ছিঁড়ে নেবো।' আমি বললাম—'দাদা, তোমার ত কোনো ক্ষতি করিনি। পালানোর উপায়ও নেই। সে চেষ্টাও করব না। একটা কথা শুনবে ছোট ভাই-এর?' অধীরভাবে লোকটা ধমকে উঠল—'সময় নেই। যা বলবে চটপট।'

আমি তখন তার হাতখানা ধরে লিপিকে বললাম, 'একটু দাঁড়াও ওঁর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।' তারপর একটু সরে গিয়ে তার কানে কানে বললাম—'ওকে অমি ভালোবাসি। বিয়ে করবো ঠিক করেছি। কিন্তু আজ যদি ইয়ারিং দুটো তুমি নিয়ে নাও ওর বাড়ির লোকে ধরে' নেবে আমিই ভক্কি দিয়ে নিয়ে নিয়েছি। ব্যস, কেস্ গুবলেট। মাঝখান থেকে দিল্‌জখ্‌মী হবে। সারা জীবনের মতো ওকে হারাব। ব্যস, সাফ কথা বলে দিলাম, এবার তুমি বুঝে দ্যাখো—গিল্টির ফনফনে একজোড়া ইয়ারিং নিয়ে তোমারও কিছু অভাব ঘুচবে না। মাঝখান থেকে দুটো লাইফ মার্ডার করে দেবে, বুঝেছো? ব্যাটাকে কথার প্যাঁচে প্যাঁচে অক্টোপাসের মতো অ্যায়সা কাবু করলুম যে, গোঁপে পাক দিয়ে যন্তর খাপে ঢুকিয়ে মেজাজসে বলল—'যাও ঠিক হ্যায়।' তখন কি জানতাম মিয়ারও মিরগী আছে।

— মিউচুয়াল হয়ে গেল? তাজ্জব কাণ্ড। এত সহজে?

হাসিতে দুলে উঠল সমীর—মিউচুয়্যাল বলে মিউচুয়্যাল? বললে, 'পথে যদি কোনো মস্তান ক্যাচ করে ত পাস-ওয়ার্ড নেত্তরদা', শুধু বলবে নেত্তরদা'র ভাইব্রাদার, ব্যস।'

—বলিস কি ডাকসাইটে গুন্ডা এ সেই নেত্তর? য্যাঃ—

সমীর জবাব দিল—বিশ্বাস না হয় গিয়ে নামটা শুধিয়ে এলেই ত হয়।' প্রসংগটা ওখানেই ইতি হল।

বাদল অকস্মাৎ ফুলগুলো নাকের কাছে তুলে উচ্ছ্বাসের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে—আহা রে—ফুল তুমি জানো না কিছুই এসব। আহা রে, বড় দেরীতে পেঁাছলে ডেড লেটার অফিসে। ঠিকানা থেকে বাসিন্দে উধাও।

তারপর বন্ধুকে আচমকা প্রশ্ন করে—তাহলে ফুলটুল সব ফালতু লোক-দেখানো ব্যাপার বল। আড়ালে কারবার গোলাপী রং-এর সেই খুন—!

সমীর মাথা নাড়ল -না রে, আমিও তোর মতো ওকে হঠাৎ এখানে ফুল বেচতে দেখে তা-ই ভেবেছিলাম। তারপর যখনই এদিক দিয়ে যাই দেখি। শেষে একদিন মওকায় পেয়ে জিগ্যেসও করেছিলাম। লিপির সঙ্গে কাটী পতাং হওয়ার পর থেকে এই লোকটার সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলতে কেন যেন ভালো লাগে। তাই মাঝে মাঝে আসি। আর তা থেকেই অনেক কথা জেনেছি ওর।

নিজেই বলেছে…ওসব ছেড়ে দিইচি। একটা দিল্-কা-দোস্ত চোখের সামনে গুলী খেয়ে খতম হল, দুজন জেলে পচছে। আর কতো বলব। যাকে সুখ দেবার আশায় এতো করলাম সে-ই বুকে চাকু মেরে ভেগে গেল। আরে আমি নাকি বদমাস, আমাকে দেখলে ওর ডর লাগে? বোঝো! আর শুনতে চেয়ো না ভাই। হাজার হোক মানুষ ত!…শুনতে চাইনি কোনো দিন কিন্তু এক-একদিন নিজে থেকেই গল-গল করে বলে কতো লোকরেই সর্বনাশ করছি, এই সব ভেবে দেখলুম—ও পথে বেঁচে সুখ নেই, খুনের নেশা খুব খারাপ নেশা—থাক্ গে ওসব কথা, তোমাদের কি ফুল চাই বলো—!

—বলিস কি? তাই বলে খুন ছেড়ে একেবারে ফুল?

—আরে আমিও ঠিক এই কথাই জিগ্যেস করেছিলাম।
—তা, কি জবাব দিল?

—মোক্ষম। এর চেয়ে ভালো নেশা আর নেই ব্রাদার! প্রেম করতে হলে ফুলের সঙ্গেই করা ভালো। এতে কোনো বেইমানি নেই। মানুষ ফুল দিয়ে সুখ পায় সবচেয়ে বেশি। ঠাকুর-দেবতা থেকে দুনিয়ার সব্বাই এতে বশ। আমার লাভের মধ্যে, ওই রঙ আর গন্ধ যেটুকু পাই—

—দস্তুর মতো কবি বনে গিয়েছে বল।
—যা খুশি বলতে পারো। আমি বলবো লোকটার হার্ট আছে। দেখা

হলেই লিপির কথা জিগ্যেস করে।

—তাই নাকি! আচ্ছা গেরো ত!

—তা কেন, বলি ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত।

—বাজে কথা বলতে যাস কেন?

—তা কি বলবো? খতিয়ে দেখলে গোটা জীবনটাই ত বাজে! তা বলে লিপির সম্পর্কে উটকো লোকের বাজে ধারণা হোক এ আমি কিছুতেই চাইব না।

বাদলের মুঠোর মধ্যে ফুলগুলো কী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছে? সে বলল—নে তোর জিনিস তুই নে ভাই। দিয়ে আয় পারিস ত আসল মালিককে!

—তোকেই দিলাম।

বিরক্ত রুক্ষ বাদল তেড়ে ওঠে—কি করবো? আমার কে আছে যে দেবো?

—যাকে খুশি—ইচ্ছে করলে ফেলেও দিতে পারিস। দোহাই আর জ্বালাস নে। চল এই বাসখানা ফাঁকা আছে উঠে পড়া যাক। লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতার মাশুল দিয়েছি ব্যস—।

বাদল আমতা-আমতা করে প্রস্তাব দেয়—আমার কাছে পয়সা আছে। ট্যাক্সি করবি?

খিঁচিয়ে উঠল সমীর—বাজে বকিস না। নে ওঠ।

বাদল বিড় বিড় করে ওঠে—লাও রেলা!

এবং খুব সাবধানেই গর্জমান যন্ত্রদানবের গর্ভে নিজেকে সমর্পণ করে—ফুলগুলোকে বাঁচাবার জন্যে অপটু সতর্কতা তাকে কেমন আড়ষ্ট ও আর্ত' করে ফেলেছে! কেবলই মনে হচ্ছে, বিষফোঁড়াটায় বুঝি কেউ আঘাত দিয়ে বসবে! আর রাগ হচ্ছে সমীরের ওপর—'ফেলেও দিতে পারিস'—তাই কি পারা যায়! মনের গড়নে সেই জাতের উপাদান থাকলে বাদল বিশ্বাসকে দু' বছর সরকারের আজব জায়গা জেলখানা আর হাজতে পৃথিবীর

পাঠশালার সেরা অভিজ্ঞতা লাভ করতে হতো না। এক ঝলকে সেই দুঃস্বপ্নের মতো ছবিটা যা মাঝে মাঝে বিমর্ষ করে দেয়—সেই ছবিটা ভেসে উঠল বাদলের চোখের সামনে। শ্রেণীশত্রুকে অকস্মাৎ তার নিজের মতো একটা মানুষ ভেবে বসেই সে যত বিভ্রাট বাধিয়ে ফেলেছিল। সেই ছবিটা বাদলের মনকে গিলে খেতে আসছিল এমন মুহূর্তে পিছনের দমকা বাতাসে গোলাপের সুবাসে আচম্বিতে বর্তমান দশা সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে তাকালো, আহা, কী সুন্দর পাপড়ি, কী আশ্চর্য কোমল পাতলা পাপড়িতে গাঢ় পোড়া পোড়া লাল রং।

কন্ডাক্টরের হাঁক 'কাঁটাকল—কাঁটাকল।'

নিজেকে সামলে নিয়ে সমীরকে জিগ্যেস করল—কত দাম নিয়েছে রে ?

জবাব এল—তোর তা দিয়ে কী দরকার ?

এরপর তাদের নামার পালা। এবং তখনই সমস্যাটা নতুন করে দেখা দেবে—বাড়িতে কী জবাব দেবে ? নাঃ আর পারা যায় না—যা হোক একটা বলা যাবে।

॥ দশ ॥

শনিবার বিকেলে রাঙামাসী আসেন। রাঙামাসী এবং শনিবার এ-দুটোকে আলাদা ক'রে এবাড়ির ছেলেমেয়েরা ভাবতে পারে না। বিকেল হ'তে না-হতে সাজ-সাজ রব ওঠে। অন্যদিনের কথা অন্যরকম, কিন্তু শনিবার সব্বাই পরিচ্ছন্ন বেশবাস পরে' বাড়িতে হাজির থাকবেই থাকবে।

আজ শনিবার। রাঙামাসী আসবেন। রাঙামাসীর পথের দিকে সকলেই চেয়ে রয়েছে কারণ বিকেল হয় হয় এখন। অজিতের চোখের সামনে লাট্টু বন্-বন্ ক'রে ঘুরছে। বংশী দেখছে একটা টেনিস্ বলের স্বপ্ন – তার বিশ্বাস, এই টেনিস বলের ওপর ঠিকমত মক্‌সো করতে পারলে সে কালে মেওয়ালাল কিম্বা গোষ্ঠ পাল হয়ে যাবে। ঝুম্‌কীর একখানা শাড়ীর বায়না রয়েছে – তাঁতীরা কি ঝুমকীর জন্যে শাড়ী তৈরী ক'রেছে? রাঙামাসী তাঁতীকে কত ক'রে বলেছেন তবু তাঁতীটা এমন দুষ্টু, একটা শাড়ী তৈরী করছে না ঝুম্‌কীর জন্যে। এবারেও যদি তাঁতীটা দুষ্টুমি ক'রে শাড়ী তৈরী করে না-দিয়ে থাকে, তাহলে তাঁতীর কপালে দুঃখু আছে। ঝুম্‌কী তার দারোগা-কাকাকে নালিশ ক'রে দেবে – তখন!

রাঙামাসীকে নিয়ে সাইকেল-রিক্সা এল। ছেলেমেয়েরা দুড়-দাড় ক'রে দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়ে জুল্ জুল্ ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আর এক-পাও এগোবার সাহস নেই কারও। রাঙামাসীর বারণ আছে, তিনি ব'লে দিয়েছেন – "আমি পছন্দ করি না।" রাঙামাসীর মুখের এই কথাটুকুই যথেষ্ট। তিনি কাউকে ধমক দেন না উঁচু গলায়। তাঁর কথার ওজনই আলাদা। এ বাড়ির সবাই জানে তা। তিনি যদি বলেন – "অজিত, তোমার লাট্টুটা বংশীর খুব পছন্দ হয়েছে।" তখনই অজিতকে হাসি মুখে ছোট ভাই বংশীর হাতে দানপত্র ক'রে দিতে হবে—হবেই হবে। কারণ, রাঙামাসী অকারণে কোনো কথা বলেন না। অবশ্য লাট্টুর মত প্রিয় জিনিসটি এইভাবে নিঃস্বত্ব দান করার প্রতিদানও আছে। রাঙামাসী পরের শনিবারই হয়ত লাট্টু ছাড়াও বাড়তি কিছু একটা জিনিস অজিতের জন্যে নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকবেন।

রাঙামাসীর শাসন মানেই ভালোবাসা। তাঁর কাছে অবাধ্যতা করার মত বোকামি কিছু হয় না – অজিত, বংশী, ঝুমকী সবাই খুব ভালোভাবেই তা জানে।

রাঙামাসী রিক্সা থেকে নেমেই খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে ছেলেমেয়েদের দেখে একটু যেন হাসলেন। তারপর ডাকলেন – "অজিত শোনো।" অতএব অজিত এগিয়ে গেল। অজিতের এই বিশেষ সৌভাগ্যে আর সকলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হ'লেও কিছু করতে পারে না, রাঙামাসী যখন যাকে ডাকেন তখন তাকেই ডাকেন, অন্য কেউ গেলে তিনি খুশি হন না।

অজিতের হাতে একটি কাপড়ের সুদৃশ্য থলে দিয়ে বললেন—"যাও মার হাতে দাও!"

রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রাঙামাসী খেজুর পাতায় বোনা একটি বড় ব্যাগ রিক্সার পা-দানী থেকে তুলে নিলেন। রিক্সাওয়ালা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বললে—"আমাকে দিন, ভেতরে দিয়ে আসছি।"

তিনি হেসে বললেন—"থাক!"

মিনিট পনেরোর মধ্যে বাড়ির মধ্যে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রাঙামাসীকেও কলকণ্ঠে খেলাধুলোয় ব্যস্ত দেখা যায়। রাঙামাসী অজিতকে লাট্টু ঘোরানোর কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছেন, – "তুমি একটু বাঁকা ক'রে লেত্তীটা ছাড়ো অজু। হ্যাঁ, এই দ্যাখো। আচ্ছা আজকে এই পর্যন্ত, এরপর হাত-লেত্তী শিখিয়ে দেবো।"

অজিতের চোখে অপরিসীম বিস্ময়—"তুমি বাঁটুলের মতো হাত-লেত্তী পারো। সত্যি?"

ওদিকে বংশীলাল শাড়ীর আঁচল ধ'রে টানছে—"শীগগির এস রাঙামাসী, আমি ইষ্টবেঙ্গল, তুমি মোহনবাগান হয়ে আমায় হারিয়ে দেবে চলো।"

রাঙামাসী হেসে বলেন – "ওরে বাবা, আমি তোমায় হারাতে পারব না।"

বলতে বলতেই ঝুমকীর দিকে তাঁর দৃষ্টি যায়। সে এক-কোণে পুতুলকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, ধমকানি শোনা যাচ্ছে—আঃ, 'কী হচ্ছে খোকন! কেবল-কেবল দুষ্টুমি – আর এইটুকু রয়েছে ঢুক করে খেয়ে নাও। নাও বলছি।" টুকটুকে দুটি প্লাস্টিকের পুতুল পেয়ে ঝুমকী আজকের মত শাড়ীর শোক ভুলেছে।

রান্নাঘর থেকে ছোটবোন মণিকার আহ্বান এল—"ও রাঙাদি, একবার এদিকে এসো !"

—"যাই।" ব'লে রাঙামাসী দৌড়লেন। এ বয়সে ও-রকম ভাবে মেয়েরা ছুটোছুটি করে না।

কলকাতা শহরের বাড়ি না-হলেও রান্নাঘরখানি বেশ ছোটই—তার মধ্যেই ভাঁড়ারের জিনিসপত্র। ফলে পাশাপাশি দু'জনে বসে কাজ করা যায় না। জ্যেষ্ঠার সশব্দ পদধ্বনিতে মণিকা বল্‌লে—"বাবা একটু আস্তে। এখনও তুমি চল্‌তে শিখ্‌লে না ?"

—"আচ্ছা হয়েছে। পাঁচটা দিন জেলখানায় বন্দী থাকি, এখানে এসেও যদি সাম্‌লে-সুম্‌লে থাকতে হয় তাহলেই হয়েছে। নেঃ, কি বল্‌ছিলি বল্‌ !"

—"এসব কি এনেছো—এগুলো ?"

—"আরে, আরে, তুই পটল চিন্‌লি নে ? দুদিন পরে তোর রাঙাদি যা তুল্‌বে এ হচ্ছে তাই—"

—"ষাট বালাই, দিন দিন তোমার কথার কি ভঙ্গিমে হচ্ছে, কথা শুন্‌লে গা রী-রী করে !" অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বসলে ছোট বোন—"পটল আর কে না-চেনে ? কিন্তু এত দাম দিয়ে এই অসময়ে এগুলো কেনবার কি দরকার ছিল শুনি !"

—"বেশ করেছি কিনেছি, তোর বাবার পয়সায় কিনেছি ?" ব'লে রাঙামাসী হাসলেন,—উচ্ছ্বসিত অবারিত হাসি।

—"থামো, আর বেশি বড়াই করতে হবে না। দুদিন সবুর করে কিন্‌লে পয়সা নষ্ট করা হ'ত না তাই সাত তাড়াতাড়ি বড়মানুষী দেখবার জন্যে—" কথাটা বলে ফেলেই মণিকা নিজের ওষ্ঠ দংশন করে নিজেকে সাম্‌লাবার চেষ্টা করল। হঠাৎ আর্দ্র স্বরে বল্‌লে—"অযথা অপচয় দেখ্‌লে কষ্ট হয় তাই বলা। নইলে তোমার রোজগারের পয়সা, তুমি কি করলে না-করলে তাতে কার কী আছে এক্তার !"

জবাব না দিয়ে রাঙামাসী ছেলেমেয়েদের খেলার মজলিসে চলে গেলেন—যাবার সময় কিন্তু লঘু চাপল্যের কোন প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল না তার পদশব্দে। তবে ছেলেমেয়েরা কলকণ্ঠে রাঙামাসীকে অভিনন্দন জানাল। ঝুমকী নালিশ করল—"ছোটদার বল লেগে খোকনের কপাল কেটে ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়ছে দ্যাখো না রাঙামাসী !"

রাঙামাসী বল্‌লেন—“তাই ত। এখন কি হবে ?”

পুতুলটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। একটু কাদা লেগে নতুন পুতুলের মুখের নীচেটা ময়লা দেখাচ্ছে। রাঙামাসী বল্‌লেন—‘আচ্ছা ঝুমুর, কপাল কেটে চৌচির হ’য়ে গেছে আর তুই হাঁ ক’রে বসে আছিস ? অসুখের সময় কি করতে হয় ?”

“ও-মা ডাক্তার ডাকতে বলিনি বুঝি দাদাকে ? তা দাদা আমার কথা শুন্‌লোই না, লাট্টু ঘোরাচ্ছে।”

“বংশী গেল কোথায় ?”

“ছোটদা তোমার বকুনীর ভয়ে, খাটের নীচে লুকিয়েছে।”

রাঙামাসী গম্ভীরভাবে ডাকলেন—“বংশী এক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এসো !”

মুহূর্তমধ্যে বংশীর আবির্ভাব হ’ল। তার মুখ শুক্‌নো, ভয় হয়েছে বল্‌টা বুঝি রাঙামাসী ঝুমকীকে দিয়ে দেবেন।

রাঙামাসী তার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লেন—“এগুলো কী ? খাটের তলায় ওই নোংরার মধ্যে যাবার কি দরকার ছিল ?”

মাটির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি বংশীলাল নিরুত্তর।

রাঙামাসী বল্‌লেন—“তোমার দোষে যদি কারো ক্ষতি হয় তাহলে কি তুমি পালিয়ে বাঁচবে ? না’ তার আগে এগিয়ে গিয়ে তার উপকার করবার চেষ্টা করবে ?”

প্রশ্নটা গুরুগম্ভীর। এর সদুত্তর বংশীর জানা নেই, মিট্‌মিট ক’রে রাঙামাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে আবার মাথা নীচু করল। রাঙামাসী বল্‌লেন—“কখ্‌খনো পালাবে না।”

—“তাহলে উপকার করব ?”

—“হ্যাঁ ! যাও ডাক্তারকে খবর দাও।” বলেই রাঙামাসী অজিতের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

বংশী দাদার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল। রাঙামাসী বললেন—“অজিত তুমি যেন ডাক্তার, ঝুম্‌কির পুতুলের কপাল কেটেছে বংশীর বলের চোট লেগে। এখন কি করা উচিত বলো তো ?”

অজিত বল্‌লে—“সেদিন গাড়ি চাপা পড়েছিল আমাদের ইস্কুলের একটা ছেলে, তাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল।”

—"না, আঘাত অতটা বেশি নয়। বল লেগেছে ত। এমনি ওষুধ দিলেই হবে।"

সন্ধ্যায় চায়ের আসর বস্‌ল।

মণিকার স্বামী হেমেনবাবু প্রৌঢ়। মণিকার তুলনায় তাঁর বয়সটা একটু বেশিই—কারণ তিরিশের অনেক পরেই তিনি বিয়ে করেছেন। তাহলেও হেমেনবাবু মণিকার রাঙাদিকে রাঙাদি ব'লেই ডাকেন। মণিকার বেশবাসে অগোছাল ভাব দেখে তার দিদি ধমক দিলেন—"আচ্ছা মণ্টি আজকেও তুই ধাংড়ীর মত থাক্‌বি ? না, তা হবে না, যা শাড়ী বদ্‌লে আয়। এটা আমার ভারী অস্বস্তি লাগে।"

—"আহা এতে অস্বস্তির কি আছে ! আমি যতই সাজি না কেন তোমার চেয়ে বুড়িই দেখাবে।'

হেমেনবাবু বল্‌লেন—"যাও না, রাঙাদি যখন বল্‌ছেন, না-হয় একদিন একটু ছিমছাম দেখি তোমায়।"

—"আজ রাঙাদি বল্‌ছেন তাই—নইলে উনি নিজে একদিন আমার দিকে চেয়ে দেখবার কি ফুরসৎ পান !"

—"আচ্ছা-আচ্ছা অমন ক'রে আর ঠোঁট ফোলাস্‌নি। যা সেই ইয়েটা পরে আয়।"

মণিকা চলে যেতেই হেমেনবাবু একটা চুরুট ধরালেন—"তারপর রাঙাদি কেমন আছো ?"

—"এখন ত ভালোই আছি। এ বাড়িতে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ কোন দিনই তো খারাপ থাকিনে।"

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে হেমেন বল্‌লেন—"তাহলে বিয়ে আর তুমি করলে না, সত্যিসত্যিই করলে না !"

উচ্ছল কণ্ঠে জবাব দিলেন রাঙাদি—"এখন আর আমায় নেবে কে ?"

—"যদি বলি যে বেশ ভালো পাত্র আছে আমার হাতে !" হেমেন খুব জোর দিয়ে বল্লেন।

—"কেন, সপ্তাহে দুটো দিন শান্তিতে থাকি এও আপনার সহ্য হচ্ছে না ?"

—"না, না, রাঙাদি। বাতাস দিয়ে মন ভরিয়ে নিজেকে ঠকানোর কোন মানে হয় না। জীবন ত বেলুন নয়।

—"আমি ত অভিযোগ করি নি—আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?
—"আমার কেন যেন মনে হয়—"
—'আপনার যা মনে হয় তার কোন মানেই হয় না। নিজেকে অত অসাধারণ না-ই মনে করলেন।"

মণিকা এল ফিরে। তার নূতন শাড়ি এবং রঙীন জামা দেখে হেমেনবাবু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন—"বাই জোভ্‌! বাই রাঙাদি! মাই মণিকা—"

মণিকার কান পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠ্‌ল, সে গুটিয়ে সুটিয়ে বসে বল্‌ল—"আঃ, কী হ'চ্ছে!"

রাঙাদিও হেসে উঠ্‌লেন হেমেনবাবুর বিস্ময়-বিস্ফারিত ভাব দেখে।

আবহাওয়া একটু একটু ক'রে সহজ হয়ে এল।

হেমেনবাবু চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন – "আমার এসব কথা বল্‌তে ইচ্ছে করে না, তবু আজ মনে হচ্ছে রাঙাদি রাগ করলেও আমাকে বল্‌তেই হবে। কোনো-কিছুরই বাড়াবাড়িটা ভালো নয়।"

মণিকাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিল—"হ্যাঁ, আমারও খুব বেশি ক'রে মনে হয়েছে। কিন্তু আমার কথা ত কথাই নয়, রাঙাদি হেসেই উড়িয়ে দ্যায়!"

রাঙাদি বল্‌লেন—"আসামী হাজির, শাস্তি দাও। তোমাদের সভ্য-জগত ত নারীকে সম্মান দিতে জানে না, কেবল সাজা দিতেই পারে। কী, গুলী চালাবার হুকুম হবে ?"

হেমেনবাবুর মুখের গাম্ভীর্য কিছুমাত্র কমে নি, তিনি বল্‌লেন – "আমরা গরীব, তুমি আমাদের ভালোবাসতে পারো, তুমি আমার ছেলেমেয়েদের স্নেহের উপহার দিতে পারো। কিন্তু সে উপহার যদি দান হয়, ভালোবাসা যদি করুণা হয় তবে সেটা যে বুকে বড় বাজ্‌বে রাঙাদি! আজ তুমি মণিকাকে যে শাড়ি-জামা দিয়েছ সেটা বড় বেশি দামী। আমার সামর্থ্য নেই—"

রাঙাদির হাত থেকে চায়ের পেয়ালা পড়ে গিয়ে সান্ধ্য আকাশে আচমকা আর্তনাদ তুল্‌ল।

রাঙাদির দুগ্ধশুভ্র শাড়ির ওপর চা পড়ে গিয়ে বিশ্রী দাগ হ'ল—তিনি সেটা ওঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে কুয়াতলায় চলে গেলেন।

মণিকা স্বামীকে চুপি চুপি বললে—"আহা বেচারীকে ওভাবে বলো না। সত্যিই আমাদের ও বড্ড ভালোবাসে গো। ও আর কোথাও যায় না। দাদার বাড়ির নামও মুখে আনে না, আর কাউকে খাতির করে না। জানো তো সবই—তবে আর কেন এমন ক'রে বলা ?"

"—হুঁ।" বলে হেমেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

বিস্মিত হয়ে মণিকা বললে—"ও মা! সে কি কথা গো, তুমি আবার এই সন্ধেবেলা কোথায় চললে? রাঙাদি এলো, আমি এখন রান্না-ঘরে থাকবো আর তুমি বেরিয়ে যাবে, সে হয় না।"

হেমেনবাবু বললেন—"আমার কাজ রয়েছে।"

এরকম কাজ হেমেনবাবুর প্রতি শনিবারই থাকে এবং মণিকাও জোর করেই আটকে রাখে স্বামীকে—এই নিয়মই চলে আসছে আজ পনেরো বছর ধরে।

রাঙাদি ফিরে এলেন, তাঁর মুখের স্মিত-হাস্য আবার ফিরে এসেছে, চেহারায় বিষণ্ণ মাধুর্য। রাঙাদির এই একটা মজার বৈশিষ্ট্য - আয়ত শান্ত চোখে তাঁর বিষাদের ঘন ছায়াচ্ছন্ন পল্লব, আর পাত্‌লা ঠোঁটের পাপড়িতে হাস্যবিন্দু।

গমনোদ্যত হেমেনবাবুর দিকে তাকিয়ে রাঙাদি জিজ্ঞাসা করলেন—"বেরুচ্ছেন বুঝি?"

মণিকা বাধা দিল—"থামো তো তুমি! কোথায় বেরুবে। ওসব হবে না। বসো, আজ তাড়াতাড়ি রান্না সেরে নিয়ে গল্প করব সবাই মিলে।"

হেমেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন—"আমায় একবার যেতেই হবে।"

রাঙাদি বললেন—"বেশ ত ঘুরেই আসুন।"

হেমেনবাবুর মনে হ'ল রাঙাদির কণ্ঠস্বরে বুঝি বা প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য মাখানো। রাঙাদির এই শান্ত আপাতনির্বিকার ভাবটুকু খুবই বিস্ময়কর। রাস্তায় নেমে পথ চলতে চলতে হেমেনবাবুর একটা কথা মনে পড়ে গেল—কলেজে যখন পড়তেন, তখনকার কথা। প্রদ্যোতের সঙ্গে বন্ধুত্বের বাঁধন এতই শক্ত এবং নিকট হয়েছিল যে প্রদ্যোতের টানে হেমেনকে প্রায়ই তাদের বাড়ি যেতে হ'ত। অবশেষে হস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হেমেনকে শাসিয়ে দিলেন—"এত বাজে আড্ডা দিলে ফেল করবে বাপু। আর হরদম দেরি ক'রে ফেরো,

থাকো কোথায় ?" অবশ্য প্রদ্যোত বাজে ছেলে নয়, এবং তার সঙ্গে বাজে আড্ডার প্রশ্ন ওঠে না—তার প্রমাণ পাওয়া গেল তখনই যখন ওরা দুই বন্ধু অনার্সের প্রথম দুটি আসন দখল ক'রে পরীক্ষায় পাস করল। সে যা-ই হোক, সুপারিন্টেন্ডেন্টের কথা নয়—রাঙাদির কথা হচ্ছে। পরীক্ষার খবর পেয়ে প্রদ্যোতদের বাড়ির সব্বাই খুব হৈ-চৈ করছে। মণিকা তখন খুব ছোট, ফ্রক পরা দশ বছরের মেয়ে সে, উৎসাহের আতিশয্যে বলেছিল—"আপনাকে আমি ট্যাঁপারী কিনে খাওয়াবো কাল।" আর রাঙাদি সেরকম কিছুই বলে নি। হেমেন যখন বললে—"কই রাঙাদি তুমি কিছু বলছ না যে?" তখন রাঙাদি উত্তর দিয়েছিল—"ভালো ছেলে যদি পরীক্ষায় খারাপ ফল করে তখনই ত কিছু বলবে লোকে!" রাঙাদির বয়স তখন ষোলো।

সবাই জানত হেমেন রাঙাদিকে ভালোবাসে। এমন কি হেমেন নিজেও সেকথা বিশ্বাস করত। ব্যাপারটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট ছিল। প্রদ্যোতের গুরুজনেরাও হেমেনকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন - তাঁরা সবাই বিশ্বাস করেছিলেন হেমেন একদিন জয়ন্তীকে বিয়ে করবে। ওরা সুখী হবে তাতে।...

পথের অন্ধকারে জোনাকিরা ঝোপে-ঝাড়ে মিটি-মিটি কোন্ ক্ষীণ আশার আলো দেখিয়ে বেড়াচ্ছে! আর ঝিঁ-ঝিঁদের নিরবচ্ছিন্ন ঐকতানে গাছেদের চোখে কি ঘুমের আমেজ লাগছে এই সাঁঝের সাত সকালে?

হেমেনবাবুর হঠাৎ এখনই কোথাও যাবার জায়গা নেই। তিনি বক্সীদের বাঁধানো পুকুর-ঘাটের রাণাতে বসে বসে ভাবছেন।...কেন এমন হ'ল?

জয়ন্তীর স্বভাবে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবার আভাষ কোনোদিন কেউ দেখতে পায় নি। জয়ন্তী হেমেনকে ভালোবাসে কি বাসে-না এ নিয়ে আর সকলে যতই ব্যস্ত হোক-না-কেন জয়ন্তী নিজে কোনোদিন মাথা ঘামিয়েছে বলে জানা যায় নি।

তাই যখন জয়ন্তী এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হ'ল তখন হেমেন খুবই বিস্মিত হ'ল। এতদিন ধরে সে প্রতীক্ষা করেছে—জয়ন্তী লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে একদিন হেমেনের কাছে ধরা দেবে। কিন্তু একী হ'ল?

হেমেন সরাসরি জয়ন্তীকে প্রশ্ন করল—"তোমার কি এই পড়াশুনো সারা-জীবন ধরেই চলবে?"

জয়ন্তী জবাব দিয়েছিল—"যদি চলেই, তাতে কি ক্ষতি—"

—"বিয়ে করবে না ?"

—"এখনও ভালো করে ভেবে দেখিনি—"

—"আর কবে ভাববে ? মণিকা বড় হ'ল—"

—"হ্যাঁ তা হয়েছে বড়, সে ত রোজই দেখতে পাই।"

—"তা হলে ? তার জন্যে অন্তত তোমার কিছু একটা করা প্রয়োজন।"

—"বড় যদি হয়ে থাকে তাহলে নিজের ব্যবস্থা ও ত নিজেই করতে পারে।".

—"আমি কি করব এখন ?"

—"আমাকে যদি কিছু তোমার বলবার থাকে বলো। তোমাকে উপদেশ দিতে পারি এমন বড় হয়েছি মনে করি না।"

হেমেন তখন কলেজের তরুণ অধ্যাপক। জীবন সম্বন্ধে তার অনেক বড় ধারণা—প্রেমিকার প্রণয় তার চোখে স্বর্গীয় রঙীন মদিরা। কিন্তু জয়ন্তীর কথায় সে হতাশ হয়ে যায়, তেমনি উত্তেজিত হয় আহত আত্মমর্যাদা-বোধে।

সে জয়ন্তীকে বলে—"তুমি স্পষ্ট করে একটা কথা বলবে ?"

শান্ত স্থির জলের মত তরল দৃষ্টিতে জয়ন্তী হেমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—"কি ?"

হেমেন বলে—"মণিকা আমাকে বিয়ে করতে চায় !"

জয়ন্তী বলে—"বেশ তো।"

—"তুমি ?"

—"আমি কি সেকথা বলেছি তোমায় কোনোদিন ?"

তারপর—!

হেমেন আহত অভিমানে পরমপৌরুষ-সহকারে মণিকার যৌবনকোরকিত মনের কাছে আত্মদান করেছে।...ঝিঁ-ঝিঁরা ডাকছে, জোনাকি জ্বলছে। বাতাসে হিমেল আর্দ্রতা। কোথায় যেন একটা ব্যাং-এর আর্তনাদ শোনা যায়। কী করুণ আকুতি—সাপের কবলে পড়েছে কোনো ব্যাং।

ভালো লাগছে না হেমেনের। একটা সিগারেট শেষ করে সে উঠে পড়ল।

বাড়ি ফিরে পরিচিত পরিবেশ। রাঙাদির হাস্যময় হাল্কা কথা, মণিকার

পদোচিত গৃহিণীপনা। প্রৌঢ় গৃহকর্তা হেমেনবাবুর বয়সোচিত হাবভাব—কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই।

* * *

সোমবার ভোরের গাড়িতে রাঙাদি চলে যান। সোমবার তাঁর কলেজের অধ্যাপনা শুরু হয়—চলে শনিবার পর্যন্ত। যাবার আগে চায়ের আয়োজন হয়—আজও হয়েছে।

রাঙাদি বল্লেন—"আমি বদ্লি হয়ে যাচ্ছি।"

খবরটা শুধু অপ্রত্যাশিতই নয় মর্মান্তিকও বটে।

অবশেষে হেমেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন—"কোথায় ?"

—"দিল্লীতে। ওখানে মাইনেপত্র খুবই ভালো।"

মণিকা বল্লে—"কত ? শুনিছি ওখানে খরচও খুব বেশি!"

—"তা বেশি বটে, কিন্তু একা মানুষের আর কীই বা এত খরচ! অনেকদিন থেকে আমার সেই বন্ধু লায়লা চিঠি লিখছে—"

সংবাদটা এতই মর্মান্তিক যে সকলেই অভিভূত হয়ে পড়েছে। কেউ বেশি কিছু বলতে পারল না। মনে মনে কতবার বল্লেও মুখফুটে কেউই যেন বল্তে পারে না, 'তুমি যেয়ো না।' এই কথাটা বল্বার অধিকার কি এদের কারও নেই? জয়ন্তীর তৃষিত দৃষ্টি, উৎকর্ণ মন যেন সেই কথাটা শুন্তে পাবার জন্য নিরন্তর প্রতীক্ষায় ছিল।

এই যাওয়া কি তবে অনেকদিন আগেই ঘটে গেছে?

বাইরে রিক্সাওয়ালার ঘন্টি বেজে উঠল—কর্কশ শব্দ।

যাবার সময় রাঙাদি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন নিজেকে শুনিয়েই বললেন—"এই ছবিখানা কিন্তু আমি নিয়ে গেলাম।" ব'লে হেমেন্দ্রের যুবাবয়সের এক এবং অদ্বিতীয় ছবিটি দেয়াল থেকে খুলে নিলেন। কবে যে ওই ছবি টাঙানো হয়েছিল আজ সেকথা কারও মনে নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য, ও ছবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কেউই সচেতন ছিল না। হেমেনের ডিগ্রী পাওয়ার পর কন্ভোকেশনের বিচিত্র পোশাক-পরা ওই ছবিখানির দিকে কতদিন কেউ তাকিয়েও দেখেনি—কতদিন? কতদিন কে জানে।

জয়ন্তী ছবিখানি খুলে নিয়ে ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিজের খেজুরপাতার বড় ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর ছেলেমেয়েদের আদর

করে বিদায় নিলেন। দিল্লী তিনি সত্যিই যাবেন। দিল্লী থেকে ফেরার সময়, কার জন্য কি কি আনবেন সে প্রতিশ্রুতিও সকলরবে দিতে লাগলেন প্রত্যেককে।

হেমেনের যৌবনের শেষ চিহ্নটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে গেল ওই ছবিটি। ওই ছবিখানার শূন্য স্থানটা আজ বড় বেশি চোখে পড়ছে। আশ্চর্য, যখন ছবিখানা ছিল তখন কেউ চেয়ে দেখেনি—কিন্তু আজ অন্তর্হিত হয়েই বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ছবিখানা।

ঘরের চার-দেওয়ালে ওই ফাঁকা চৌকো জায়গাটুকু কেমন ফর্সা। শূন্য চৌকো দাগের ওপর সবারই চোখ পড়ছে এখন। আর আশ্চর্য যে ছবিখানা নেই তাই দেখচে প্রত্যেকে।

॥ এগার ॥

নতুন কলমটা হাতে নিয়ে মনটা আজ ছেলে-মানুষের মতো খুশি। এটা দিয়ে পুজোর বাজারে 'মার কেল্লা' মার্কা একটা গল্প লিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে। গল্পের পাঁয়তারা কষতে কষতে মনে পড়ে গেল হিমাদ্রির মুখখানা। এ কলমটা আগে হিমাদ্রিরই ছিল। বেচারী হিমাদ্রি। কাল বিকেলে এল আমাদের আপিসে। খবরের কাগজের আপিস যেমন হয়। কথা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা তখন জমে উঠেছে। হিমাদ্রিকে দেখেই নিরুপম বলল—কি দাদা! বিয়ে থা করলেন?

নিরুপম একদা হিমাদ্রির 'মেয়ে দেখা' বিজনেসে পার্টনার ছিল। ওরা দু'জনে এ-ওর পরস্পরের সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিত। অমনি বিয়ের সম্পর্কের কথা উঠত। কথা ওঠা মানেই মেয়ে দেখার প্রশ্ন ওঠা। ওরা দু'জনে মিলে দেখতে যেত মেয়ে—সেদিন রাতে খাওয়া খরচাটা বেঁচে যেত। বিয়ের কথা বেশিদূর এগোতো না। হপ্তায় গোটা দুই-তিন পার্টি জুটত।...অবিশ্যি সে কারবার বেশিদিন চলে নি। নিরুপম চাকরি পেল, বিয়ে করল। কারবার লাটে উঠলো।...

হিমাদ্রি ঠোঁটের চুরুটটা কামড়ে বলল—নাঃ এখনো পাত্রী তেমন জুটল না।

—বলেন ত সম্বন্ধ দেখি।

—তা দেখতে পারেন। তবে কোনো মেয়ে কি রাজী হবে? আমার বর্তমান আস্তানায় একমাত্র আমিই থাকতে পারি, সেখানে আর কেউ—

—কেন, কেন? বর্তমান আস্তানা মানে। তুমি কি বাড়ি নিয়েছ?

—হ্যাঁ। এখন বেলঘরিয়াতে দিব্যি আছি। ঘরখানা স্রেফ শোবার জন্যে। জুতোটি খোলো, শুয়ে পড়ো। দাঁড়াতে গেলেই মাথা ঠুকে যাবে। একটু মোটা লোক হলে, পাশ ফেরবার সময় উঠে বসতে হবে। মাসিক ভাড়া এগারো টাকা।

নিরুপম দমে গেল—ও! তাহলে...

*বাতাসিয়া লুপ

—না, না, সেজন্যে অনুকম্পার বাজে খরচ করতে পারবেন না। বিয়ে না হলেও আমার ঘরে ফেমিনিন্ টাচ্ ছড়ানো।

—সেটা কি রকম?

—আসলে ওটা পূর্বাশ্রমে রান্নাঘর ছিল। এলা চড়িয়ে আমাকে শোবার ঘর হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। রান্নাঘরের নজীর হিসেবে একটা তাক রয়েছে। সেটার কালিমা এলার পালিশে চাপা পড়ে নি। এগারো টাকায় এর চেয়ে বেশি কেউ আশা করতে পারে?

নিরুপম উঠে পড়ল। নিরুপম চেনে হিমাদ্রিকে। হিমাদ্রির সুদিনে অনেক ট্যাক্সি চড়েছে, সিনেমা দেখেছে, রেস্তোরাঁয় রোস্ট কাটলেট উড়িয়েছে। তবে হিমাদ্রির টাকার জোয়ার অমাবস্যার বিদ্যুতের মতো। ফলে দুর্দিনেরা সংখ্যায় সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যের জনগণের অরণ্য। আর দুর্দিন হলে হিমাদ্রি দশ বিশ টাকা থেকে শুরু করে আট আনা, চার আনা পর্যন্ত নিয়েছে হাত পেতে। আমরাও নিরুপমের মতো হিমাদ্রিকে খুব রহস্যময় ব্যক্তি মনে করি, তার দরাজ হাতের কাটলেট, ট্যাক্সি আমাদের কপালেও পেঁছিয়। অবিশ্যি তার জন্য কিছু কিছু ট্যাক্সও দিতে হয়।

কিন্তু এসব কেন ভাবছি? আমি ত গল্প লিখব। নতুন কলমে নতুন গল্প (নূতন রীতিতে? না, না, অতখানি পাগলামীর প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো)। শহর নিয়ে অনেক ত লিখেছি, এবার গ্রাম নিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশে আমার বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখব না। একেবারে তাহিতি কিম্বা দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ে লিখব। বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক বিস্তৃতির রেকর্ড ভেঙে চৌচির করে দেবো।

কিন্তু কিছুই যে মগজে আসছে না। কলমটা আমাকে ভেংচি কেটে যেন চুরুট কামড়াচ্ছে। হতভাগা হিমাদ্রি। ঠকিয়েছে আমাকে। কিন্তু, কিন্তু ওরই বা কি দোষ, নিবটা নতুনের মতোই, খুব চমৎকার দেখতে, লেখাও সরে। তবে? তবে মুস্কিল হয়েছে, কলমের সঙ্গে হিমাদ্রির বিষণ্ণ হাসিমাখা মুখখানা হাজির থাকছে। তার গলার আওয়াজ কানে শুনতে পাচ্ছি। কাল ও যখন আমাকে বাইরে ডেকে এনে ওর বুক পকেটের দিকে চোখ ফেলে বলল—ভালো পেলিক্যান, দরকার আছে?

জবাব দেবার কথা খুঁজছি, ও বলল—কলমটা নিলে ঠকতে হবে না। গোটা ত্রিশ টাকার দরকার। অবিশ্যি তোমাকে পঁচিশ টাকায়ও দিতে পারি।

বাজারে চেষ্টা করলে পঞ্চাশ-ষাটও পাবো, লাইফটাইম ত। পাইওনিয়ার থেকে একশো পঁচাশীতে কিনেছি, দু মাসও হয় নি।

ওর কথাগুলো কানে বড় লাগল। ইচ্ছে হল, পঁচিশ টাকা এমনিই দিই, ধার। জানি, ওর হাতে টাকা এলে চাইলেই ফেরৎ পাবো। কিন্তু—কিন্তু কলমটা আজ না হোক কাল-পরশু ওর হাত-ছাড়া হবেই। টাকা ফুরোতে এই যা দেরি। হাসলাম। পকেট থেকে টাকা বার করে দিলাম ভারি মনে। কষ্টও হয়েছিল। আবার এতো শস্তায় একটা এত দামী কলমের মালিক হওয়ার আত্মপ্রসাদও যে হয় নি তা নয়।

কিন্তু হিমাদ্রির কথা ভাবলে ত পুজো সংখ্যার গল্প লেখা হবে না, তা সে কলমটা যত দামীই হোক না কেন ?

মহৎ কার্যে বহু বিঘ্ন। কলমের সঙ্গে মোকাবিলা শেষ হবার আগেই মৃদুলা এল এক ঝলক প্রভাতী হাসির আলো ছড়িয়ে।

—কি ব্যাপার! এমন অসময়ে ?

—এলাম তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে। তোমাদের স্বভাব বড় মন্দ।

—তা তো আমারও জানা আছে। কিন্তু সে খবর তুমি কুত্র পেলে ?

দমে গেল। বলল—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব বলে আপিস কামাই করে এসে পড়লাম। আর তুমি এড়িয়ে যেতে চাইছ ?

—বলো, বলো, তোমার বার্তা শুনি
তোমারি কুশলে কুশল মানি !

—মানো, না, ছাই। কাল তোমার আপিসে যাবার কথা, তা গেলাম না কেন—অ্যাকসিডেণ্টে হাসপাতালে পড়ে রইলাম, কি, কি হল কিছু জিগ্যেস করলে না তো ?

—জিগ্যেস করব কি জন্যে। তোমার খবর বলে দিতে পারি। এই ধরো পথের মধ্যে আমার বদলে আমার বন্ধুকে পেয়ে তার সঙ্গে খুব চা আর টা খেয়েছ ত।

—ওমা! তুমি জানলে কি করে ?

—তোমার হিমাদ্রিবাবুই বলেছেন।

—উনি বুঝি এসেছিলেন ?

—হিমাদ্রিবাবু তোমার বন্ধু। কিন্তু তোমরা ওঁর এত নিন্দে কেন করো বলতে পারো ?

—নিন্দে, কই না তো ?

—আমি যেন ঘাস খাই। ওঁকে দেখলেই কেমন অস্বস্তি হয় তোমাদের। কিন্তু যা-ই বলো মানুষটা বড় ভালো। আপিস থেকে ফিরছি উনি ধরে নিয়ে গেলেন, বললেন, তুমি খুব ব্যস্ত আছো। তা ভাবলাম, লোকজন থাকলে না যাওয়াই ভালো।

—কেন ?

—তুমি ত আর বেরুতে পারতে না। অথচ আমার দরকার ছিল একবার কলেজ স্ট্রীটে যাবার, বিয়ের প্রেজেন্টেশান কেনবার জন্যে। তা হিমাদ্রিবাবু নিজে থেকেই বললেন 'বলুন,—আপনার কোনো কাজে আসতে পারি কি ?' ব্যস, কাজ হল।

—আর, তারপর ?

—তারপর চা খেলাম আমরা, পয়সা আমিই দিচ্ছিলাম কিন্তু উনি এমন ধমক দিলেন 'খুকী' বলে যে, থেমে গেলাম। মানুষটা সত্যিই পরোপকারী। আপিসের চাকরিটা যাতে আমার পার্মানেণ্ট হয় সেজন্যে মিনিষ্ট্রিতে মুভ করবেন বললেন, ওঁর ত অনেক জানাশুনো।

মৃদুলার মুখ থেকে যা শুনছি, এগুলো সবই শুনেছি, হিমাদ্রির মুখে। তবে তার বলার ধরনে আর মৃদুলার বলার ভঙ্গীতে ফারাক আকাশ-পাতাল। না, না, মেয়েলী আর পুরুষালী ঢঙে যে তফাৎ স্বাভাবিক তা ছাড়াও বিস্তর তফাৎ।

মৃদুলা বলল—তুমি অমন কাঠ হয়ে ব'সে কেন ?

—কাঠ ! না আকাঠ বলো।

—যাকগে, এক কথায় হিমাদ্রিবাবু তোমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক।

—তা যা বলেছ। ট্যাক্সি করে বাড়ি পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে আসেন। আর

আমি হেঁটে ভিড়ের মধ্যে বাসে গলদঘর্ম হয়ে আধ-মরা লাশ নিয়ে বাড়ি পেঁছে মনে হয় যেন কৈলাসে এলুম, তাই না ?

—ট্যাক্সিতে কিন্তু তোমার মতো বেয়াদপী করেন নি।

—কিন্তু—

—কিন্তু কী। ওঁর সঙ্গে ট্যাক্সি করে গিয়েছি বলে রাগ করলে ? আহা আমি যেন ট্যাক্সির কথা বলেছি। উনিই বললেন যে, টালিগঞ্জে একটা ডিরেক্টর্স বোর্ডের মিটিং আছে, জরুরী। তা উনি ত ট্যাক্সি করেই যাবেন, আমাকে পথে ভবানীপুরে নামিয়ে দিলেন, এই ত ব্যাপার।

আমি অবাক হয়ে ওর কথা শুনি। না, অবাক হই নি। হিমাদ্রির পক্ষে সবই সম্ভব। ডিরেক্টর্স বোর্ডের মিটিংও তার মগজে গজাতে পারে, কোম্পানী, শেয়ার, বিল, পার্টি, হাজার হাজার টাকা প্রফিট—সবই সে ব'সে ব'সে চুরুটের ধোঁয়ায় আমদানি করে। পুরনো বন্ধু। এককালে অনেক টাকার কারবার করেছে তাও ঠিক—কিন্তু আজ ?

দীর্ঘশ্বাস পড়ল নিজের অনিচ্ছাতেই। আর সেই হলো ফ্যাসাদ।

মৃদুলা আমার হাঁচি-কাশিটুকু থেকে পড়তে পারে আমি কি ভাবছি। বলল—তুমি যেন কিছু একটা চেপে রাখছো।

—না, কিছু না। বাতাসিয়া লুপ।

—ট্যাক্সিতে চড়া যে এতটা অপরাধ হবে তা জানলে হেঁটেই বাড়ি যেতাম।

—আরে না, না, তা নয়। বলছি ত বাতাসিয়া লুপ।

—তার মানে ?

—নেহাতই না শুনে ছাড়বে না!

—থাক, যদি বলতে এতই আপত্তি থাকে।

—আপত্তি আমার তরফে কিছু নেই। তবে তোমার সেটা কেমন লাগবে সেটাই ভাবছি।

ঈষৎ বক্র ভঙ্গীতে জবাব দিল—তাহলে আমার কথা ভাবো!

—তুমি আমার কথা ছেড়ে হিমাদ্রির কথা ভাবতে থাকলেই কি আমিও তোমার জন্যে ভাবনা ছাড়ব!

আবার একটা নরম মুঠোর আদুরে কিল—এসব অসভ্যতার মানে কি ?

—মানে এই যে, হিমাদ্রি রাত আটটার সময় এসে বলল, 'আরো পাঁচটা টাকা চাই ভাই, এটা ডেট অব অনার, ফেরৎ দেবো।'

—আরো পাঁচ টাকা মানে ? আগেও নিয়েছেন।

—না সেটা ধার নয়, সেটা বিজ্‌নেস, এই যে কলমটা দেখছো—

মৃদুলার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল—ছি, ছি, ছি ! এমন জানলে কি ও'কে পয়সা খরচ করতে দিই ! আচ্ছা বাউণ্ডুলে—

ওর কথা থামিয়ে দিলাম—আমার কাছে কলমটি বেচে বেরিয়েই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

—আমি কি ছাই এসব জানি ?

মৃদুলাকে যেন পথে বসিয়ে দিল কে।

আমি বললাম—থাক, এরপর আর বাকীটা শুনতে চেয়ো না।

—বাকী আছে নাকি এর পরও ?

—আছে সামান্যই—

—বলো, বলো—

—তোমার আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে যে—ওদিকে হয়ত হিমাদ্রি আপিসে হাজির হবে—

—কেন ?

চটে গিয়ে বলল মৃদুলা।

—তার ধারণা—

থেমে গেলাম, বলা উচিত হবে না।

মৃদুলা বলল—তার কি ধারণা বলো—বলো না।

—তুমি তার প্রেমে পড়েছ। অন্ততঃ কাল রাতে এসে সেইরকমই রিপোর্ট করল।

—বেশ করেছি। তোমারও কি তা-ই ধারণা ? যদি তাই হয় আমাদের সম্পর্ক এখানেই খতম করে দাও।

—জানতাম।

জানতাম মৃদুলা একথা শুনলে ফেটে পড়বে। তবু কেন বললাম ?

নিজের অসংযমে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে।

মৃদুলা উঠে পড়ল—আচ্ছা আসি।

দরজার সামনে লাফিয়ে যেতে হল, নইলে ওকে রোখা যাবে না।

বললাম,—দাঁড়াও, দাঁড়াও। হিমাদ্রি যদি আপিসে গিয়ে তোমায় না পায় তাহ'লে বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়বে। এককালে তোমার বড় সাহেব ওর কোম্পানীতে চাকরি করতো—

—এ সব নিয়ে তামাশা ছাড়ো। আমাকে এখুনি যেতে হবে আপিসে, চুরুটটা টান মেরে ফেলে দিয়ে গালে-গালে চড়িয়ে বাঁদর-চড়া করবো। মৃদুলা ব্যানার্জি পলিটিক্স করে, অনেক বেয়াদপকে ঠেঙিয়েছে সে!

তা ও যা মেয়ে, পারে। আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। ওর হাত ধরে টেনে এনে চৌকির ওপর বসিয়ে দিলাম—এখনো বিড়ালের মতো ফোঁস ফোঁস করছে। পিঠে হাত বুলিয়ে গলায় এক-রাজ্যের মিনতি ঢেলে বলি,—দুলু, একটা কথা রাখবে?

এর আগে যে ছোকরা ওকে ভালোবাসতো সে 'মৃদু' বলতো, তাই আমি ওকে 'দুলু' বলি।

ও ভুরু কুঁচকে বলল,—কী!

—না, তা হলে রাখবে না! বেশ—

—কই, আমি সে কথা কখন বল্লাম।

—তোমার মুখখানাই ত বলছে।

—মুখখানা বুঝি খবরের কাগজ?

—না! টেলিপ্রিণ্টার। টক্-টক্-টক্—সর-র-র। একটা খবর হয়ে গেল।

—আচ্ছা হয়েছে। বলো কি কথা—

—কথা দাও যে, রাখবে।

—না,-না। অমন হ্যাংলার মতো করছ কেন। দিনে-দুপুরে যদি কেউ এসে পড়ে—

—না, না, চ্যাংড়ামি নয়। একটা জরুরী কথা—

—বেশ, দিচ্ছি, রাখবো।

—তুমি হিমাদ্রিকে এ নিয়ে কিছু বলতে পাবে না।

—তা কি ক'রে হয়। এভাবে সে যা-তা ভাববে, বলবে, আর আমি বরদাস্ত ক'রে যাবো, তা হয় না। কিছু না বললে যদি বাড়াবাড়ি করে—

—না, তা সে করবে না। সেদিক দিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই।

—না, নেই। তুমি ছাই বোঝো।

—আমি ঠিকই বুঝি। বেচারী আসলে জীবনে কিছু পায়নি তাই স্বপ্ন দেখে যেটুকু তৃপ্তি পায়, পেলে কি ক্ষতি।

কলমটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মুখ ভ্যাংচানো বন্ধ হয়ে গেছে। কলমটাকে বড়ই অসহায়, অবজ্ঞাত আর করুণ মনে হচ্ছে।

মৃদুলা আমার দিকে তাকালো। ওর দুচোখে আবেশের মেদুর আমন্ত্রণ। ইচ্ছে করছে ওকে দুহাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরে' পিষে ফেলি, মিশিয়ে ফেলি আমার বুকের মধ্যে। কিন্তু অসহায় আমি। কলমটা যেন হঠাৎ হিমাদ্রি হয়ে গেছে—তাকিয়ে দেখছে আমাদের দুজনকে।

পারলাম না।

গল্পও লিখতে পারলাম না, মৃদুলাকেও আদর করতে পারলাম না। কলমটা আমার এমন বাঞ্ছাপূরণের লগ্নে দুগ্রহ হয়ে টেবিলে রইল কেন? মৃদুলা বাতাসিয়া লুপের মতো হিমাদ্রিকে ঘুরে, নীচে নেমে আবার উঠে এলো আমার মনে।

আলো-আঁধারি। কনে দেখা এই আলোর বেলাতে মেয়েটি সুন্দরী কি না তা বোঝবার উপায় নেই, দায়ও নেই। তাই খবরের কাগজের অফিসে বক্স নম্বরের নির্দিষ্ট চিঠির বাক্সে লম্বা খামখানা নিক্ষেপ করে শূন্য-চিন্তা চোখ দিয়ে মেয়েটিকে দেখল অম্বর, আসলে ওকে দেখবে বলে সে তাকায়নি, তার দৃষ্টি কোন মেদবহুল রাজস্থানী ব্যক্তি, একখানা ঠ্যালাগাড়ি, মালবোঝাই ট্রাক কিম্বা স্তূপাকার আবর্জনায় উপছে পড়া ডাস্টবিন অথবা আকাশ-আড়াল করা ইমারতের উপর না প'ড়ে এক রমণী শরীরের ওপর ধাক্কা খেয়ে থামল। কেননা বাক্সের গহ্বরে দরখাস্ত জমা দেবার 'অদ্যাই শেষ রজনী'তে নিজের ভাগ্যকে এই নিয়ে সাতচল্লিশ বার জমা দিয়ে নিজেকে একটু আশার মাটিতে স্থাপনের চেষ্টা করতেই ব্যস্ত ছিল মনটা, তাই অম্বরের চোখ দুটি ছিল নির্লিপ্ত।

শেষ সিঁড়ি থেকে নামবার মুখে তাকে এত অন্যমনস্ক ও সহজ ভাবে নামতে দেখে মেয়েটি নিশ্চয় ভেবেছিল, লোকটি এই অফিসেরই কেউ। সেই প্রত্যয়েই প্রশ্ন করেছিল,—আচ্ছা দেখুন, বক্স নম্বরের চিঠি কোথায় ফেলতে হয় ?

এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়, অম্বরকে খুশিতে দাঁড় করাল। নিজের মনের ভাবনা হারিয়ে গেছে। সে বলল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকের বাক্সে ফেলবেন। ডান দিকের বাক্সে নয়।

জবাব পেয়ে ব্যস্তভাবে মেয়েটি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। অম্বর গেটের বাইরে বেরিয়ে কি যেন ভাবছিল। পানের দোকান থেকে সিগারেট কিনতে কিনতে খানিক সময় গেল। মেয়েটি ফিরে যাচ্ছে।

মিনতি ? হ্যাঁ, ও আরতির বোন মিনতি মিত্র ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বোনে বোনে এমন চেহারার মিল আর কথার ভঙ্গীতে অভিন্ন টান কোথাও দেখেনি অম্বর। মিনতি কি তাকে চিনতে পারেনি ? না কি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যেতে চাইল ? জমানা কি এতই বদলে গেল ! মিনতি সত্যি আবার চলে গেল। সিগারেটে গোটা দুই টান মেরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পায়ের

স্পীড একটু বাড়িয়ে দিল অম্বর এবং দেখল মিনতি চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর মোড়ে পেঁছে গেছে।

অফিস ছুটির পরের পথ, অনবরত হর্ণ আর লোকজনের মাথা—তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে মিনতির স্থির মূর্তিটা। মূর্তিটা স্থির, না, অম্বরের লক্ষ্যই সিনে ক্যামেরার লেন্সের মত ঘুরে ঘুরে ফোক্যাল অবজেক্টকে নিজের পিন পয়েন্টে রাখছে কিনা কে জানে।

এক সময়ে অম্বরের বিরক্তি বা বৈরাগ্য এল, থাক গে, যাক গে—! যদি কেউ পাশ কাটাতে চায় তাতেই বা কি। এমনিতেই তো দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছে। কত মাসই তো পার হয়ে এসেছে আরতি বা মিনতিকে না দেখে। কই, অম্বর তো মরে' যায়নি। এখন যেটার জন্যে মরতে বসেছে সেই চাকরিটা জুটে গেলেই অমন কত মিনতির বাপ-দাদা—!

মোড়ের মাথায় পেঁছবার আগে একটু বাধা। এখানে জনকয়েক পথবাসীর কাঁচ-কাঁচা নিজেদের বারান্দা বানিয়েছে চলার পথকে। এক জোড়া গাইও জাবর কাটছে চোখ বুজে। অম্বর স্থির করল, মিনতির বাঁ-পাশ দিয়ে সামনে পড়ে ডানদিকে বাঁক নেবে। যদি সেই সময়ে মুখখানা দেখা যায় আলবাৎ লক্ষ্য করবে।...তুমিও পথে হাঁটছ, আমিও—! চোখ বুজে কেউই চলছি না আমরা। অতএব—!

অম্বর আর একটু হলে প্রায় মিনতির ঘাড়েই ধাক্কা মেরে দিচ্ছিল। না, মোটেই নিজের দোষে নয়। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে স্থির মূর্তিটা সহসা উল্টো দিকে ঘুরল কি না। কাঁধের পাশ দিয়ে কালো লম্বা বেণীর শাখানদীর শীর্ণ ধারার মত ব্যাগের স্ট্র্যাপখানা দুলে উঠল অম্বরের হাতে প্রতিহত হয়ে।

খিল্ খিল্...সেই পুরনো হাসির ঢেউ,—আচ্ছা ছেলে তুমি অম্বরদা!

অম্বরের ভাবনার দুনিয়াটা কেমন ভূমিকম্পে উথল-পাতাল। আর কিছু নয়, না, সে কোন কিছুই ভাবতে পারছে না। বিস্ময়—কেন!

এমনিতে মিনতির চোখ দুটি আয়ত অতল গভীর। চাংওয়া-র দরজা থেকে উড়ে-আসা বাজনার সুরে মিশে তা যেন আরও মায়া রচনা করে অম্বরকে বলল,—আমায় ফেলে পালাবার মতলবে এইভাবে কেটে পড়বে তুমি তা কল্পনাই করতে পারিনি।

প্রথম সংলাপের পর থেকে ক'মিনিটই বা সময় সমুদ্রের খরচ হয়েছে। এর মধ্যে কত কাণ্ডই ঘটে গেল। তাহলে ভূত দেখার মত ভয়ে পালায় নি

মিনতি। সিগারেটের নোঙরটার আর দরকার নেই। অম্বর চুপ করে দেখছে মিনতিকে। না চুপি চুপি নয়, সোজাসুজি। সে এখন নিশ্চিন্ত। সে শুধু শুনবে। মিনতিই বলবে। কিন্তু একটা খটকা তবু থেকেই যায়—!

—সাতজন্মে তো বক্স নম্বরে চিঠি ফেলিনি। কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। তাই যখন জিজ্ঞেস করি, তোমাকেই যে জিজ্ঞেস করছি তা খেয়াল হয়নি। তাছাড়া এখানে তুমি আছ তা-ই কি ছাই জানতাম। কতদিন কোন খোঁজ খবর নেই তোমার!

অপর পক্ষ নির্বাক।

—অমন হাঁ করে কি দেখছ?

—তোমাকে।

—আহা! এখনো সেই-নাটুকেপনা।

মিনতির লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গীটুকু ঠিক আগের মতই আছে। স্বস্তি পেল অম্বর। অনেক কাল পরে বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরলে যেমনটি হয় এ যেন ঠিক তেমনি। চেনা-চেনা পথঘাট মনের পুরনো ছবির সঙ্গে মিলিয়ে খুঁজে পাওয়ার তৃপ্তি।

মিনতি বলে,—তুমি কত রোগা হয়ে গেছ অম্বরদা।

বিজ্ঞভ বে হাসে অম্বর,—তাই নাকি? হবে।

—খবরের কাগজের আপিসে খুব খাটুনি বুঝি?

মনে মনে হাসে অম্বর। ক্ষতি কি, না হয় এই মুহূর্তে জার্নালিস্ট হওয়া গেল। ভাবতেও মজা লাগে। রাজা-উজীর বানানোর এই বিরাট যন্ত্রের একটি নাট-বোল্টু হিসেবে নিজেকে দেখার মধ্যে রোমান্স আছে বই কি। বিশেষ করে এমন একটি মেয়ের কাছে, যাকে ঘিরে কিছু স্বপ্ন স্মৃতির ভাঁড়ারে সঞ্চিত। তার চোখে রাজপুত্রের পুজার ডালি যখন হাজির, তখন সাংবাদিক না হওয়া মানেই 'বেকার' সত্যের পাথরে তাকে আছড়ে ফেলে দেওয়া। অম্বর গম্ভীর ভাবে সিগারেটে টান দিতে দিতে ঘাড়খানা অনায়াসে কাৎ করল—হুঁ।

—আচ্ছা অম্বরদা—

—কী?

একটা ঢোক গিলে থেমে থেমে বলে মিনতি,—বক্স নম্বর দিয়ে যারা বিজ্ঞাপন করে, তাদের ঠিকানা ইচ্ছে করলেই তো তোমরা জানতে পারো।

কথাটা অম্বরকে কিঞ্চিৎ অসুবিধেতে ফেলল।

—হ্যাঁ, তা পারা যায় বৈকি। তবে, ওরকম করাটা অফিসের কেউই পছন্দ করে না, তাই—

মাথা নেড়ে কুণ্ঠিত স্বরে মিনতি চাপা দিতে চাইল,—না না, আমি তা করার কথা বলছি না। এমনি জানতে চাওয়া—

মিনতি কি বলতে চায়? অন্তত চাকরির ব্যাপারে ও যেহেতু অম্বরের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী, এই ভেবে সে ও-প্রসঙ্গটা এগোতে দিতে নারাজ, তাই অন্য কথায় নিয়ে যেতে চাইল—দেখেছ রাস্তায় কী ভিড়। এখন ট্রামে বাসে ওঠার চেষ্টা করাই বৃথা।

মিনতি জবাব দিল,—তা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি কেন আমরা?

অম্বর আশা করে, এর পরই মিনতি প্রস্তাব করবে—চল, কোথাও বসি, চা কি কফি—বা ওইরকমই কিছু। অন্তত আগে আগে আরতি হাজির থাকলে তা-ই হত।

কিন্তু তার বদলে শুনল—কোন্ দিকে যাবে? আমায় এখন সেই থার্টি বি'র টার্মিনাস অবধি হাঁটতে হবে।

আজকাল আশাভঙ্গে আর দমে না অম্বর। তাই সহজভাবেই সায় দিল,—চল, ওইদিকেই যাই। কিন্তু—

হাঁটছে ওরা পাশাপাশি।

—কিন্তু তোমরা তো ছিলে খিদিরপুরে—

—এখনো খিদিরপুরেই বাসা। আমি আপাতত আছি মেজদির বাড়ি।

—মেজদি মানে আরতি?

—হ্যাঁ।

চলতে চলতে অম্বর একটু পিছিয়ে পড়েছিল। গুটি দুই ছোকরা মাঝখান দিয়ে এগিয়ে-পিছিয়ে চলতে শুরু করেছে। মস্করা।

মিনতি সরে দাঁড়িয়ে তাদের যেতে দিয়ে পাশাপাশি হ'ল—মেজদি এখনো তোমার কথা খুব বলে।

—তাই নাকি? তা তুমি ওখানে কদ্দিন আছ?

—তা মাস তিনেক হল। মেয়েদের স্কুলে একটা কাজ করছি।

—কি কাজ?

অম্বরের প্রশ্নটা আসলে ঈর্ষাকে চাপা দেবার প্রচেষ্টাপ্রসূত।

—মাস্টারী। মেয়েদের স্কুলে তাছাড়া আর কি করার আছে।

মনে মনে অম্বর বেশ একটু বিরক্ত হয়, তবু বলে সে,—তা বেশ। তুমি খুব ফরচুনেট—

আর সে ভাবে, হয়তো মিনতি তার এই চাকরিটাও ছিনিয়ে নেবে। নইলে এইভাবে শেষ দিনে একই বাক্সে দরখাস্ত ফেলতে আসবে কেন? এ-ই হয়, আরতির তো আর কারুর গলায় মালা দেবার কথা নয়—অম্বর তখন স্টেট ব্যাংকের চাকরিটা পেয়েই গিয়েছিল প্রায়। মাঝখান থেকে ভেতরের গণ্ডগোলে প্যানেলটা বাতিল হল। ওদিকে—।

দুটি বোন অম্বরের ভাগ্যের আকাশে কি শনিগ্রহ? আবার এতকাল বাদে সাতাশ জন লোক নেবে বলে বিজ্ঞাপন দেখেও অম্বর তাড়াহুড়ো না করে শেষ দিনে দরখাস্ত ছাড়ল, যাতে ভিড়-ভাট্টা কাটিয়ে কর্তৃপক্ষের হাতে তার আবেদন পৌঁছায়, এদিকে মিনতিও পাকা খেলোয়াড়ের মত ঘোড়ার কিস্তীটি দিয়ে বসল সেম মেথডে। অথচ মিনতি একটা চাকরি করছে—। অম্বরের মত কন্‌ফার্মড বেকার তো নয়।

অবশ্য এও লাক্ ছাড়া কিছু নয়। রমেশ দেখ, একের পর এক ছাড়ছে আর জুটেও যাচ্ছে বড় থেকে আরও বড় চাকরি। যোগ্যতা—হুঁঃ। যারা পায় তাদের কিছুতেই আটকায় না। মিনতি স্কুলের যে চাকরিটা ছাড়বে সেটা অম্বর পাবে কি? অথচ দরখাস্তের বাক্সটা সে-ই মিনতিকে দেখিয়ে দিয়েছে। তার মানে হাতে ধরে নিজের ভাগ্যটাই খণ্ডন করেছে।

অম্বরের সঙ্গে একই রাস্তার আপ আর ডাউন দুটি পৃথক গাড়ির স্রোতের মত চলছিল মিনতিরও সমান্তরাল চিন্তা। অম্বর কি সত্যিই ওকে এড়িয়ে যেতে চাইছে? ভাল চাকরি পেয়েছে, খুব ভাল কথা। পুরনো অন্তরঙ্গতার সূত্র ধরে পাছে সে সংসার বাঁধার প্রস্তাব ক'রে বসে এরকম আশংকা না কি। কে জানে, এতদিনে বিয়ে-থাও করে থাকতে পারে অম্বর। জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু, না—থাক, অত গায়ে-পড়ে কি হবে। মিনতিরও ত আত্মসম্মান বলে কিছু থাকতে পারে। ছেলেদের মস্ত সুবিধে যে, সিঁথিতে সিঁদুরের স্ট্যাম্প থাকে না। চেপে গেলে বোঝবার কোন উপায় নেই।

চুপচাপ পাশাপাশি। এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে অম্বর বলল,—কোথাও বসে একটু চা খেলে কেমন হয়?

-মাসের শেষ। নইলে মিনতিই প্রস্তাব করত। বরাবরের মত অম্বরকে

খাওয়াতে ইচ্ছে করে বইকি। আরতি তখন মাস্টারী করত, মিনতি কলেজে পড়ত—অম্বর ঠিক জুটে যেত বিকেলে। তারপর তিনজনের চায়ের মজলিস ভবানীপুরের সেই কাফেতে। তিনজনের মধ্যে আরতিই রোজগার করে। অতএব খরচ আর কারুর করার অধিকার ছিল না। সামর্থ্যও নয়। কিন্তু শোভন আবরণে সেটা ঢাকা থাকত। চায়ের কাপ সামনে পেলে দুনিয়ার রাজনীতি ফোয়ারার মত তোড়ে চালিয়ে যেত অম্বর। এই রাজনীতির নেশাই তো তাকে শেষ পর্যন্ত পাড়াছাড়া করেছে। একদিন কোথায় যে হাওয়া হয়ে হারিয়ে গেল। আজ অজ্ঞাতবাসের খবরও হয়তো কিছু শোনা যাবে। অবিশ্যি এসব নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার হবে। জীবনে বর্তমান কালের মূল্য অতীত বা ভবিষ্যতের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

সাড়া দিল মিনতি,—ভালই হয়।

ধর্মতলার মসজিদ পেরিয়ে মধ্যবিত্ত গোছের রেস্তোরাঁয় ঢুকতে ঢুকতে মিনতি বলল,—স্রেফ চা কিন্তু—আমার ক্ষিদে নেই।

—আচ্ছা।

লম্বাটে সরু ঘরখানায় মোটে ভিড় নেই। কেমন যেন গা ছমছম করে। অম্বরকে রহস্যের নায়ক মনে হয় মিনতির।

জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে অম্বর বলে,—তুমি চাকরি করছ মিনু, তোমার কাছে কিন্তু খাওয়া পাওনা হয়।

—আহা ভারি তো চাকরি। একজনের বদলি। লীভ ভেকেন্সীতে কাজ করছি। স্কেল-টেল কিছু নয়। বরং তোমারই খাওয়ানো উচিত।

তবু মুখ ফুটে বলতে পারল না, মেজদির ছেলেপুলে হবে বলে ছুটি নিয়েছে, সেই জায়গাতে কাজ করছে। এ পর্যন্ত হয়তো বলা চলে, কিন্তু বাকিটা? মিনতি যে সর্বতোভাবেই মেজদির বদলিতে চাকরি করছে এবং এইভাবে আর বেঁচে থাকতে রুচি নেই—একথা অম্বরকে বলার একটি মাত্রই তাৎপর্য হয়, পক্ষান্তরে অম্বরকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়। মেজদির সাজানো ঘর তছনছ করতে কষ্ট হয়—অথচ জামাইবাবু সে-সব পরোয়া করে না।

ছিঃ! মিনতি নিজের আচরণকেও ধিক্কার দেয়। চোর!

এতদিন পরে দেখার প্রথম দিনে—না না অসম্ভব। তার চেয়ে বরং আজকের চিঠির উত্তর আসার অপেক্ষা করা যাক।

—আচ্ছা অম্বরদা, বক্স নম্বরে দরখাস্ত করলে উত্তর পেতে মোটামুটি কতদিন রি হয় ?

অম্বর এবার মনের পাল্লা একটু ফাঁক করল—তুমি তো তবু একটা চাকরি ছ। টেম্পোরারী হলেও বেকার নও। তার ওপর মেয়ে—। কিন্তু জার হাজার লাখ লাখ ছেলে ডাহা বেকার বসে আছে, তাদের কি দশা ভাবতে রো ? তোমাদের পার্মানেন্ট চাকরি সংসার করা।

মিনতি অবাক হল না। অম্বরের স্বভাবটাই এই রকমের। কথায় কথায় শ্ব, মানবসমাজ, পুরুষ ও রমণী এই ভাবে ব্যক্তির বিষয়কে পাইকারি হিসেবে নে নিয়ে গিয়ে বিরাট সমস্যার অকূল পাথারে পেঁছে দিয়ে বড় বড় বাক্যের হাজ ভাসিয়ে দেবে। তার দিকে তুমি বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাতে পারো, তাকাও তাতেই বা কী—সে নিজেকেই শোনায় যেন।

অম্বর কথার জের টানে,—ঘর সংসার তোমরা ভালবাস। দুদিন আগেই ক বা পরেই হোক রুজি রোজগারের, মানে চাকরি-বাকরির নেশা ছুটে য়—তখন 'ছেলেমেয়ে' 'উনি'—এই হয় পাকাপাকি চাকরি। অথচ—

দু-পেয়ালা ধূমায়িত চা পেঁছল। সেদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি পড়ে মিনতির। ক কুঁচকে বলল—মা গো, কী নোংরা, যেমন কাপ তেমনি প্লেট।

অম্বরের প্লেটে উপছে পড়া চা নিজের পীরিচে ঢালতে ঢালতে ও কল্পনা র, ওর চিঠি পেয়ে পাত্র নিজে উত্তর দিয়েছে। হয়তো এমনি কোন এক স্তোরাঁয় (না না, এ ধরনের নয়, যে বিদেশে থাকে, সে নিশ্চয় গ্রেট ইস্টার্ণ থবা নিদেন কোয়ালিটি বা ওই স্তরের রেস্তোরাঁয় সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব দেবে) মনা সামনি বসে কথাবার্তা কইবে। মিনতি কি সুশ্রী নয়। তবে ? মিনতি র দরখাস্তে সেই কথাই জানিয়েছে বিজ্ঞাপনদাতাকে।—'আপনার দেওয়া জ্ঞাপনে আছে, পাত্রী নিজে পত্রালাপ করুন তাই লিখছি। বিদেশে গিয়ে কতে রাজী আছি। আর রূপ সম্পর্কে কি লিখব, নিজেকে সবাই ভাল খে। বি. এ. পাশ করেছি। এরপর সবকিছু সাক্ষাতে আলোচনা হওয়াই ঞ্ছনীয়।'

—নাও, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে কাপ রাখতে পারো, প্লেটের চা আর জামা-পড়ে পড়বে না।

মিনতির চোখের তারায় ঘরোয়াপনার ইশারা।

অম্বর কথা চালাচ্ছিল সেই সঙ্গে মিনতিকে লক্ষ্য করছিল। বুকের মধ্যে

ধাক্কাধাক্কি—ভাল লাগা আর বাতিল করা নিয়ে। আরতিকে সরিয়ে দিয়ে মনটা মিনতিকেই যেন বহাল করতে চাইছে। সেই সঙ্গে, অনিশ্চিত চাকরিটা মিনতি কেড়ে নিচ্ছে—মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে তাকে তুমি নিশ্চয় মাথায় তুলে নৃত্য করবে না। অথচ তামাশা এই যে, মিনতি অম্বরকে যতই পছন্দ করুক—'বেকার' এই অপরাধেই আরতির মত সেও অন্যের গলায় মালা দেবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলের একটা চাকরিই বিবেচ্য।

চায়ে চুমুক দিয়ে ভাল লাগে মিনতির। আরামের নিশ্বাস ফেলে বলে,—সত্যি, খুব তেষ্টা পেয়েছিল অম্বরদা। গলাটা ভিজিয়ে এখন মনে হচ্ছে বাসে ভিড়ের ধকল সামলানো যাবে।

—তুমি কি পাকাপাকি ভাবে চাকরিই করবে?

—সত্যি কথা, অস্থায়ী কোন কিছুই আর ভাল লাগে না।

—স্থায়ী বেকার থাকার চেয়ে অন্তত অস্থায়ী হলেও যাহোক কিছু একটা হওয়া ঢের ভাল।

কথার পিঠে কথা হিসেবে মিনতি জবাব দেয়,—তা—অবিশ্যি ঠিক।

কিন্তু মন সায় দিল না, মিনতিকে যদি অস্থায়ী মাস্টারী না নিতে হত তাহলে মেজ জামাইবাবু স্ত্রীর ভূমিকাতেও অস্থায়ীভাবে ওকে পাওয়ার সুযোগ নিতে পারতেন না।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই মিনতি চঞ্চল হয়ে উঠল। স্কুল থেকে সোজা এ পাড়ায় চলে এসেছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখেছিল তিন দিন আগে। তারপর থেকেই লড়াই করেছে নিজের সঙ্গে। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলার কথা ভাবতেও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আজ একখানা চিঠি লিখেই স্থির করল, যা আছে ভাগ্যে হোক, বাক্সে ফেলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। তারপর থেকে ভূতগ্রস্তের মত চলেছে। এখন—। যেখানে ফিরতে (ইচ্ছে-অনিচ্ছের বাইরে আরও কিছু থাকে, তাকে ভয়ও বলা যায় অথচ সেই ভয় নিজেকে জড়িয়েও) ভাল লাগে না তবু সেখানে পৌঁছবার তাড়া ওকে খুব বিচলিত করল। কথার মাঝখানে ও বলল,—এবার ওঠা যাক।

—এর মধ্যেই?

—না। দাঁড়াও। তোমার ঠিকানাটা বল, লিখে নিই।

দুজনের বাক্যালাপে বাধা পড়ল, বেয়ারা বিল নিয়ে এল। বেয়ারার হাত থেকে বিলখানা নিয়ে উল্টো পিঠে নিজের ঠিকানা লিখতে লাগল অম্বর।

মিনতির দৃষ্টি তার দিকে এমনই নিবদ্ধ যেন ছবিখানা মনের নেগেটিভে তুলে নিচ্ছে সে। এরপর ডার্করুমে এনলার্জারে চড়িয়ে ব্রোমাইড পেপারের ওপর আলো ফেলে নিজের খুশিমত পজিটিভ বানিয়ে ফেলবে।

ওর হাতে কাগজখানা দিল। মিনতি হাত পেতে নিল। বলল—অম্বরদা, চায়ের বিলটা আমি দিই, কি বল!

মিনতির আশা ছিল অম্বর বাধা দেবে, বলবে, এখন আর সেদিন নেই। সামান্য দু'পেয়ালা চা…।…কিন্তু অম্বর ঠিক যেন আগের মতই স্বভাবসিদ্ধ উদারতায় নিজেকে বিস্ফারিত করে হাসল,—তোমার ইচ্ছেতে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। আচ্ছা—

অম্বর আড়চোখে লক্ষ্য করে, মিনতি টের পায়নি তো! সত্যি, অন্তত এইসব লৌকিকতা রক্ষার জন্যেও কোন একটা অস্থায়ী চাকরি পাওয়া উচিত।

মিনতির ব্যাগটা নামানো ছিল টেবিলের ওপর। সেটি তুলে নিয়ে মিনতি কেমন আত্মস্থ ভঙ্গীতে একটি দু টাকার নোট বার করে বেয়ারাকে দিয়ে দিল।

ওরা পথে নেমে এল।

অম্বর বলল—আমার ঠিকানা তো নিলে। তোমারটা দিলে না—

খিদিরপুরের ঠিকানাতেই চিঠি দিও। এমনিতে তো আর যাচ্ছ না! কেননা তাহলে এতদিনে নিশ্চয়—।

—পাড়ায় গেলে আস্ত ফিরতে পারব?

—কে বলেছে। মিছে ভয়। এখন তো পাড়ায় পুরনো অনেককেই দেখা যায়।

তারপরই মিনতি জিভ কাটল,—ওই যাঃ, কাগজখানা ফেলে এসেছি।

—কী কাগজ?

—তোমার ঠিকানা লেখা কাগজখানা। অবিশ্যি ওটা হারালেও যায়-আসে না, তোমার আপিসেই খোঁজ পাওয়া যাবে।

একটা একতলা বাস আর একটা ডবল ডেকার প্রচণ্ড আওয়াজে আর বেগে দৌড়াচ্ছে—অম্বর সেই দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। বাসগুলো চলে যাওয়ার পরও সে সেই দিকে একইভাবে চেয়ে থেকে বলল,—ওখানে খোঁজ ক'র না। ডিউটির কোন ঠিক নেই। তা ছাড়া পার্মানেণ্ট চাকরি আমারও নয়।

মিনতি ব্যস্ত হয়ে পড়ে—তবে একটু দাঁড়াও, আমি ঠিকানাটা নিয়ে আসি।

অম্বর হেসে উঠল—আচ্ছা ফ্যাসাদ। যার ঠিকানা সে তো পালায় নি।

—লিখে নিই দাঁড়াও—মিনতি ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বার করে।

অম্বরের মনে হয় কেবল ঠিকানাটাই যেন একমাত্র দরকারী। সে বাঁকা সুরে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করে,—এটা যেন খুব একটা জরুরী মনে হচ্ছে—। কি ব্যাপার—জানতে পারি কী?

—মানে, আমার পার্মামেণ্ট কিছু একটা হলে তা থেকে তোমায় বাদ দিতে চাই না। বুঝলে?

মিনতির মনে সংশয়, যদি সেই বিদেশবাসীর কোন জবাব না আসে—তখন তো—তাই অম্বরের—

অম্বর বিরসকণ্ঠে সাড়া দিল,—অঃ।

মিনতির নরম মুঠোর হ্যাঁচকা টানে অম্বর চমকে উঠল। একটা বিরাট লিমোসিন কার কার্জনের নামের সঙ্গে তৃণচিহ্নশূন্য ম্যাকাডামের কারপার্কে মসৃণ গতিতে এসে আর একটু হলে অম্বরের গায়ে ধাক্কা মারত। গাড়ির সেই ধাক্কা থেকে বাঁচল অম্বর। কিন্তু সে ভুল বুঝল। ভাবল গাড়িখানা তাকে চাপা দিত না। ওটা মিনতির ছল। তাই আরতির স্মৃতির সেপাইগুলো লাঠি হাতে তাড়া করেও তাকে আইনভঙ্গের দায় থেকে রক্ষা করতে পারল না। সামনে ময়দান, আলো-আঁধারের রহস্যে ডুবে যাক বেচারীরা—অম্বর দুদণ্ডের সুখ-সুধায় ডুববে। নিজেকে বাঁচাবার মত শক্তি তার কোথায়!

সিনে কণ্টিনেণ্টাল স্টুডিওর ডিরেকটরের অফিস ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অল্পবয়সী একটি মেয়ের সংগে খোশগল্প করছিল মধ্যবয়স্ক প্রোডাকশন ম্যানেজার চণ্ডী পোড়েল। কি একটা কথায় দুজনেই হাসছিল, ঠিক এমনি সময়ে ঘরের ভেতর থেকে বাজখাঁই গলায় আওয়াজ এল—চণ্ডী—চণ্ডী—

চণ্ডীর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে—সেরেছে রে।

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই মেয়েটির। ও নিজের মনে পরম উৎসাহে বলে—আরে শোনো, তারপর কি হল, বলি—

চণ্ডীদাস পা ঠুকে দাবড়ে বলে—থাম থাম, এখন তোর কথা শুনতে গেলে ডিরেকটর সাহেব আস্ত গিলবে।

ইতিমধ্যে ডিরেকটর সিংহরায় উচ্চকণ্ঠে ডেকেই চলেছেন।

অগত্যা চণ্ডী ইলেকট্রিক ট্রেনের বাঁশির মত অদ্ভুত স্বরে সাড়া দেয়—যাচ্ছি মেজদা—

যদিও সিংহরায়ের সঙ্গে পোড়েলের রক্তের ছিটেফোঁটা সম্পর্কও নেই, তবু পাড়া-সুবাদে পাতানো সম্পর্কটা জাহিরে পোড়েল বিশেষ গৌরব বোধ করে। ব্যস্তভাবে ডিরেকটরের ঘরে ঢোকার মুখে উল্টোদিক থেকে একটা নরম ধাক্কা খেয়ে মুখ তুলে চণ্ডী জিভ বার করে—সরি—বলল কিন্তু দুঃখের কোনো চিহ্ন সে-মুখে নেই।

—ঠিক আছে। দেখুন কাণ্ড, আমি আপনাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলুম। ইস্‌স্‌ লেগেছে ত ম্যানেজার সায়েব ?

মণিকা রায়ান। চণ্ডী একটু অবাক হল আশী হাজার টাকার স্টার তাকে ডাকতে যাচ্ছিল!

মুখ কাঁচুমাচু করে সে জবাব দিল—তাড়াহুড়োর মুখে কি কাণ্ড বলুন তো। লেগেছে ত আপনারই।

মণিকা রায়ান ক্ষুন্ন কণ্ঠে চণ্ডীর হাত ঝাঁকি দিয়ে অনুযোগ করে—প্লীজ চণ্ডীদা 'আপনি' বলে আমাকে মুছে ফেলবেন না। আপনি না থাকলে আজ

কেউ চিনতো না মণিকা রায়ানকে।

ওদিক থেকে রাঘব সিংহরায় মৃদু তিরস্কার করেন—আরে তোমাদের খেজুরে আলাপ পরে হবে—

মণিকা হেসে বলল—যান যান, উনি তাগাদা দিচ্ছেন।

—আর ব'ল না, এখন শুরু হল খিঁচুনি, সারা দিন চলবে।

খাটো গলায় কথা ফেলে দিয়ে চণ্ডী দৌড়বার ভঙ্গীতে কর্তার সামনে হাজির হল। দরজার দিকে দৃষ্টি রেখে ডিরেকটর বলেন—কি বলছিল ওই ছিনালটা?

—এই এমনি মামুলি ঢং।

চণ্ডী এ জগতে আজ প্রায় সতের বছর ঘোরাফেরা করছে। কোনো কারণে সিংহরায় যে মণিকার ওপর বিগড়েছে তা বুঝেই মন-রাখা কথায় এড়িয়ে যেতে চাইলে।

—ঢং ছাড়া আর কিস্যু নেই এটা তুমি-আমি বুঝলেও পাবলিক শালারা পাগল। জানো চণ্ডী, রায়ানের গরম কত? এক লাখ বিশ হাজার দর হেঁকেছে। তার অর্ধেকই ব্ল্যাক। বোঝা আস্পদ্দা—

চণ্ডী ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গীতে বলল—ভাগিয়ে দিন মেজদা—বড্ড বাড় বেড়েছে।

—যাক গে, সে পরে ভাবা যাবে। এখন যে জন্যে তোমায় ডাকা—কাজের কথা বলো, তোমার ওদিকে সব রেডি ত?

চণ্ডী সাফ গলায় জবাব দিল—আজ্ঞে সে ত অনেক আগেই বলে গেছি।

ডিরেকটর আকাশ থেকে পড়লেন—বাজে কথা। সকাল থেকে ত তোমার টিকি দেখিনি বাবা—

মাথা চুলকে চণ্ডী বলে—আজ্ঞে বাজে কথা না। ঘণ্টাখানেক আগে, তখন মণিকার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন। লিস্টি সামনে ধরলুম আর আপনি ধমকালেন,—দেখচ না বিজি আছি, পরে এস।

—ও তা হবে।

—আপনার খ্যাল নেই মেজদা।

সিংহরায় বিরক্ত—তা এদিকে সেটে নামার সময় হয়ে গেল সে খেয়াল আছে তোমার? রবিনই বা কোথায় গেল? আজ কি কাজ বন্ধ থাকবে না কি?

তোমার মালপত্তর রেডি করো, রবিকে পাঠিয়ে দাও, জলদি যাও—

—আমি সব রেডি করে বসে আছি, বললুম ত।

—রবি?

—সে একটু বেরিয়েছে। এই এসে পড়ল বলে—

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন কর্তা—বাঃ, ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার! অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেকটর কি মনিব নাকি, যখন খুশি এলেই হল? বলি সে আমার আণ্ডারে, না, আমি তার আণ্ডারে—এ্যাঁ! কোথায় গ্যাছেন তিনি?

প্রোডাকশন ম্যানেজার চণ্ডী কাচুমাচু, কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করে—মানে আমাদেরই কাজে রবিকে একবার নিউ মার্কেটে যেতে হয়েছে। এতক্ষণে ফিরে আসার কথা—

—মানে-টানে জানি না, সুটিং-এর ডেমারেজটা কে দেবে শুনি? ফ্লোর বুকিং কি মুফতে হয়? শস্তা? যত্তো সব—

সিংহরায় তর্জন-গর্জনের মধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন পিছনে দুটি হাত রেখে।

প্রোডাকশন ম্যানেজার কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। ঘরের আর একটি চেয়ারে আলট্রামডার্ন যে তরুণীটি বসে হাত-আয়নাতে মুখ দেখছিল সে-ও উঠে গিয়ে জানলাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

টেলিফোন বেজে উঠতে চণ্ডী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। এবার দমবন্ধ হয়ে আসা অবস্থাটা পাতলা হবে। মেয়েটি মুখ ঘোরালো। সিংহরায় হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে ইশারা করতে সে ফোন ধরল। কাল রিসীভ করেই কল্পিত কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল—মিস্টার চৌহান ফোন করছেন, দ্যাখো তো ডিরেকটর সাহেব আছেন কি না?

তারপর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করে অপর পক্ষকে আশ্বাস দিল—হ্যালো! মিস্টার চৌহান, আপনি একটু ধরুন প্লীজ—খবর নিতে পাঠিয়েছি—

চণ্ডী সরে একপাশে যেতে মেয়েটি আবার এসে ফোনটা তুলে নিল এবং

নির্দেশমত শুরু করল—হ্যাল্লো-ও—মিস্টার চওহ্যান, দেখুন ডিরেকটর সায়েব বড্ড বিজি আছেন। উনি বিকেলের পর ফ্রী থাকবেন তখন বরং আপনি রিং করবেন। কেমন? বুঝলেন না সেটে এখন কাজ চলছে—হ্যাঁ—হ্যাঁ! অ্যাঁ, আচ্ছা বলব! নমস্কার।

সিংহরায় চেয়ারে প্রত্যাবর্তন ক'রে সিগারেট ঠোঁটে গুঁজতেই মেয়েটি তাতে অগ্নি-সংযোগ করে দিল।

তিনি মুখ তুলতেই সদ্য ঘরে ঢোকা সিকদার হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—স্যর—

লম্বা টান দিয়ে রাঘব সিংহরায় গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করেন—বলুন স্যর।

—মানে, বিশ্বাস করুন স্পটলেস আপেল হগমার্কেটে একটিও পাইনি তাই অগত্যা বড়বাজারে—

সিংহরায় আবার আস্ফালন করেন—আপেল ছাড়া যখন কুমার সায়েব মেক-আপ নেয় না জানো, তখন কেন আগে থেকে ব্যবস্থা করা হয় না। কেন?

—আজ্ঞে আপেল ত এসেছিল কিন্তু উনি তার গায়ে দাগ দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অনেক করে বলা হল,—আপনি মেক-আপ নিতে থাকুন, ইদিকে আমরা ভালো মাল এনে দিচ্ছি। কিন্তু—

—ওঃ, হরিবল্! অব্‌নক্‌সাস—এরা নিজেদের কী মনে করে—এ্যাঁ—আজ আপেলের গায়ে দাগ দেখলে ফেলে দেয়—সবাব যখন লোকের কাছে ভিক্ষে করত অন্ধ বাপের হাত ধ'রে তখনকার কথা মনে পড়ে চণ্ডী!

এসব কথা জবাব দেওয়ার জন্য নয় চণ্ডী তা জানে। সে চুপ। একবার রিস্টওয়াচের দিকে নজর দিয়েই তিনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—চণ্ডী!

—মেজদা—।

—তোমার লিস্টি কই?

—এই যে!

প্রোডাকশন ম্যানেজার পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বার করল, খুলে দেখে সেখানে রেখে আবার হাতড়াতে লাগল। সিংহরায় ধৈর্যহারা হয়ে বললেন—বুঝিচি কিস্যু করনি। যাকগে—আমি সেটে যাব না। সবাইকে বাড়ি চ'লে যেতে বল—

ততক্ষণে মহামূল্য কাগজটি গুপ্তধনের মত মুঠোয় ধরে চণ্ডী বিজয়ীর মত হাসল—এই যে, যাবে কোথায়! এই দেখুন মেজদা।

—থাক আর দাঁত বার করতে হবে না। পড়ো—শুনি।

চণ্ডী কাগজখানা মেলে ধ'রে বানান করে পড়ার মত হোঁচট খেতে থাকে—মাজা-ভাঙ্গা ঠুনকো বুড়ি চারটে, মাঝবয়িসী মেয়েমানুষ গোটা পনের-ষোলো, পোয়াতী একটা, পোঁটা-পড়া ছেলে পাঁচটা, পেট ডিগডিগে দু-একটা, বেরষো একটা, পুরুত একটা—কেত্তনের দল—

—ব্যস, ব্যস, লেখা ত সব ঠিক আছে। এবার আসল মালগুলো দেখতে হবে। তোমার ত গুণে ঘাট নেই, সেটে নেমে ভরাডুবি না হয়। শানু আমার দরকারী জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাও ত সোনা।

ঐ মেয়েটি আয়নাওয়ালা ব্যাগ বন্ধ করে ডিরেকটরের কাগজ ও ব্যাগ নিয়ে এদিক-ওদিক চোখ বুলোতে লাগল।

প্রোডাকশন ম্যানেজার চণ্ডী পোড়েল-এর সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেকটর রবীন সিকদারের যুগলবন্দী প্রতিবাদ ধ্বনিত হল—বিশ্বাস না হয় নিজে পরখ করে নেবেন। আর যা-ই বদনাম দিন ছবিকে ভালো করার জন্যে জান লুটিয়ে দিই এটা হক কথা মেজদা—কি, তুমি কি বলো শানু?

মেয়েটি হাসতে হাসতে ডিরেকটরের কাছ ঘেঁষে চলতে লাগল।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

সিংহরায় ভুরু কুঁচকে বললেন—দ্যাখো ত, বলে দাও পরে রিং করতে।

রবীন ফোন ধরেই ব্যস্তভাবে বলে—ধরুন—

—কে?

—মালভানি সায়েব।

স্বয়ং প্রোডিউসার! সিংহরায় হাত বাড়িয়ে দিলেন—আরে হ্যাঁ, আমি ত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি। ফোনের আওয়াজে ফিরতে হল। হ্যাঁ, সব রেডি। কাজ শুরু হতে পাঁচ মিনিট।

ফোন নামিয়ে প্রোডিউসারের বাপান্ত করেন তিনি—শালা টাকা দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে। এমনি হয় না রুখু তাগাদা!

ক্যান্টিনের বারান্দায় সেদিনের এক্‌স্ট্রাদের ভিড়।

ডিরেকটরকে সদলবলে আসতে দেখে সবাই চনমনিয়ে নিজেদের যথাসম্ভব গুছিয়ে নিতে লাগল। চণ্ডী ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এসে ওদের বলল—নে, নে,

এবার সব রেডি হয়ে নে, সায়েব আসছে—

চলতে চলতে ডিরেকটর মাঝপথে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই সুযোগ রবীন সিকদারও চণ্ডীর কাছে পৌঁছে গেল।

—ও: চণ্ডীদা সায়েব ত সপ্তমে চড়ে আছে হে, ব্যাপার কী?

—তুই থাম ত রবি, সায়েবকে নতুন দেখছিস নাকি। নরম মাটিতে যত দাপট। আবার মালভানীর কাছে কেঁচোটি। তাছাড়া আজ মণিকা এসে কেস গড়বর করে দিয়েছে।

—কি রকম?

—পরে বলব।

সিংহরায় জমায়েত এক্‌স্‌ট্রাদের দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন—আচ্ছা, পোয়াতী, বুড়ি, মেয়েমানুষ ক'টা—হ্যাঁ, চলে যাবে। ইয়ে পোঁটা-পড়া ছেলে কই হে চণ্ডী?

চণ্ডী ডাকে—পাঁচুর মা—।

দুটো বাচ্চার হাত ধরে ও একটিকে কোলে নিয়ে ঘোমটা-টানা একটি বৌ এগিয়ে আসছিল। সিংহরায় হাত তুলে থামিয়ে দিলেন—হয়েচে, হয়েচে। কিন্তু নাকে পোঁটা কই? সব যে শুকনো খটখটে! চণ্ডী—

চণ্ডী রিবাউণ্ড করে পেঁচোর মায়ের দিকে—এই যে বললে সেদিন সব কটা সর্দিতে হাঁসফাঁস করছে? ঘিয়ের মত গড়াচ্ছে, আমিও ত দেকিচি। এ্যাঁ।

ঘোমটার আড়ল বাড়ল, পেঁচোর মা কাতরভাবে জানাল—পোড়ারমুখো ডাক্তার কী ওষুধ দিলে যে সব কটারই সর্দি সেরে গেলো ম্যানাজারবাবু।

—ওসব জানি না, ক্যামেরার সামনে সর্দি চাই। নইলে যে এফেক্ট আনার জন্যে এত কাণ্ড সেটাই পণ্ড হবে। উঃ...

হুকুম দিয়ে সিংহরায় অন্য আইটেমের পরীক্ষা শুরু করলেন।

পেঁচোর মা চণ্ডীর পা ধরতে যায়—কী হবে ম্যানাজারবাবু।

আশ্বাস দিল চণ্ডী—ভাবিস না, সব ঠিক করে দেবো। রসগোল্লার রস আর একটু ময়দা দিয়ে ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। তবে, কিছু খরচা কাটা যাবে।

বেরষো, পুরুত, পোয়াতি, সব কিছু কড়া নজরে এগজামিন করে হাতের ইশারা করে ডিরেকটর সাহেব স্টুডিওর দিকে এগিয়ে যান। চণ্ডীও অনুরূপ গাম্ভীর্য নিয়ে অর্ডার দিল—চলো চলো, সব জলদি করো।

সবাই ত্বরিতে চলতে শুরু করল। দুজন ঠুনকো বুড়ি উপু হয়ে বসে রইল বারান্দায়। চণ্ডী তাগাদা দিল—কি গো, তোমরা এখনো উঠতে পারলে না?

একজন মেঝে থেকে লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—কমনে যেতি হবে?

আর একজন তখনও আগের মত স্থানু বসে বসে চিৎকার করে—অ সোহাগী—সোহাগী। আ ম'ল, কোমরটা একটু চুঁচে দিবি ত? দ্যাখ দিনি।...

—তোমার আবার কি হল?

—আরে বাবা চৌরঙ্গী বাত। ওই সোহাগী টেনে না আনলি—ওঃ—তা হ্যাঁ বাবা, আবার কোথায় টেনে নে যাবে?

সোহাগী এসে মুখ-ঝামটা দিল—হ্যাঁ, আমিই টানলুম বটে। ট্যাকার নোভ, সিনেমাতে ছবি উঠোনোর নোভ বুড়ির। এ্যাখন বসে বসে চুঁচে দিই আর উদিকে সব বেশি বেশি ছবি উঠে যাক বুধোর মা পেঁচোর মার। নে, নে, ঠাক্‌মা—একটু মনের জোর কর।

বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে বলে—তা হ্যাঁ বাবা ম্যানাজার মশাই এটুন চা দেবা?

—আ গ্যালো যা, এখন চা দাও, তার হ্যানো করো।

—আগ করো নি বুড়োহাবরা মানুষ। মাগনা লয়, ওই যে পাঁচ ট্যাকা দেবার কতা আছে, তা থেকে কেটি নেবা চায়ের দাম।

চণ্ডী খিঁচিয়ে উঠল—পাঁচ টাকা তোকে কে বলেছে শুনি?

—ক্যানো সোহাগী যে বললো?

সোহাগী খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে—ন্যাও বুড়ির কতা শোনো। আমি বননু পাঁচ টাকা সদরে তা থেকে খরচ-খরচা হাজা শুকো দু ট্যাকা কেটি নেবে কুম্পানি, তুমি হাতে পাবা নগদ তিন ট্যাকা। তাই ত বননু—

বুড়ি বলে—আচ্ছা বেশ তা তিন ট্যাকা পাবো এই বললি ত হয়। তার হাজা-শুকো হ্যানো-ত্যানো আমার কি ছাই মনে থাকে!

চণ্ডী অধীরভাবে গজয়ে ওঠে—আচ্ছা ফ্যাসাদ ত। এই বুড়ি, শোন, লোককে বলবি পাঁচ টাকা, বুঝলি? ওটা হল রেট, তবে হাতে পাবি তিন টাকা। এটা ত সবাই জানে।

—আর খেতি দেবা না?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। টিফিনের সময়ে খাবার পাবি, সেটার জন্যে খরচা লাগবে না। এখন ওঠ, দোহাই তোর—

—চা।

সোহাগী বুড়ির কোমর মালিশ করতে করতে ধমকায়—তবে থাক পড়ে তুই, মুই চননু। উদিকে কাজ অইল পড়ে, উনি বসে বসে বায়না গাইতেছেন। বলি যাবি ?

দেখা গেল শানু দৌড়তে দৌড়তে দূর থেকে ডাকছে—রবিদা—শিগগির আসুন, ডিরেকটর আপনাকে খুঁজছেন।

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেকটর অর্থাৎ রোগা লিকলিকে গাল-বসা লোকটা প্যাণ্টের বেল্ট সামলাতে সামলাতে ছুটল—কী ? কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে ?

—আরে হ্যাঁ, এখনই হবে, লাইট রেডি করা হয়ে গেছে। ওদিকে কুমার সায়েবের আবার ভীষণ ইয়ে—

চণ্ডীও বুড়িদের নিয়ে ফ্লোরের দিকে চলেছে।

…শহরের আধুনিক হাউসিং ফ্ল্যাট : কোন বাড়িতে শ্রাদ্ধ হচ্ছে, সেখানে যত মডার্ন মানুষের জমায়েত, অতিথিদের গতায়াতে সরগরম। আর একেবারে তার গায়েই পুরনো বস্তীতে বিয়ে হচ্ছে। সেটে আজ এই পাশাপাশি কনট্রাস্ট দেখানোর ছবি তোলা হচ্ছে।

॥ দুই ॥

কাঁচা-পাকা গোঁফ, পাকা আমের মত গোলালো লাল মুখ, লম্বা চেহারা নিয়ে প্রোডিউসার মালভানি সায়েব ঠোঁটে চুরুট গুঁজে অকারণ-ব্যস্ততায় ফ্লোরের এধারে-ওধারে ঘুরছিলেন। একবার শানুর সঙ্গে দুটো কথা বললেন, তারপর ডিরেকটরকে কি যেন বলে শানুর কাঁধে হাত রেখে পিছনের একটা আঁধার-মত জায়গায় ওকে নিয়ে চলে গেলেন।

একটা শটের পর হিরো একটু জিরেন পেতেই তার স্তাবকদল ঘিরে ধরল—হৈ হৈ করে উঠল—গুরু কী একখানা হীট দিলে মাইরি। কিছু অ্যাক্টিং করছো—হ্যাঁ—

কয়েক ঘণ্টা শুটিং-এর পর টিফিনের ঘণ্টা বাজতে যে যার নিজের মত এধার-ওধারে চলে গেল। পড়ে রইল বস্তী ঝেঁটিয়ে আনা কাচ্চা-বাচ্চা আর এক্সট্রার দল। অবশ্য যাদের এক্সট্রার কাজে পুরনো অভিজ্ঞতা আছে তারা

আর পর্দায় চান্স পেয়ে খ্যাতি কেনার উচ্চাভিলাষী এমন ধরনের কলেজী বেকার ছোকরারা নিজেদের গাঁটের পয়সা দিয়ে ক্যান্টিনে টিফিন করতে চলে গেল। কেননা, সরকারীভাবে টিফিন বাবদ দেড় টাকা বরাদ্দ ধরা থাকলেও আসলে বারো আনার বেশি ক্যান্টিন থেকে খাবার একসট্রাদের দেওয়া হয় না। অর্থাৎ বারো আনা যায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেকটর বা ওইরকম মধ্যবর্তীদের পকেটে। তাও কখন জুটবে ঠিক নেই। এটা অলিখিত নিয়ম। অলিখিত নিয়মটাই আড়ালে থেকে গোটা শিল্পকে বাঁধাধরা ছকের শেকলে আটকে রেখেছে। গড়বর করলে রুপোলী পর্দার মায়ালোক থেকে বিদায় নিতে হবে। পর্দায় বড় বড় বাহারী হরফে লেখা নামের সঙ্গে টেকনিশিয়ানদের বাস্তব অস্তিত্বও কঠিন পরিহাস। ডিরেকটরদের টিকি বাঁধা থাকে প্রোডিউসারের টাকার শেকল দিয়ে। কিছুটা বা বড় বড় স্টারদের কাছেও। আর সবার ওপর বসে টিকির মত খবরদারী করছেন জনা-কয়েক ডিস্ট্রিবিউটর। তাঁরা কথায় কথায় 'কমার্স'' 'বকস অফিস' এইসব বুলি আউড়ে থাকেন। কমার্শিয়াল সাকসেসের দিকে নজর রেখেই ছবির জগৎ। সেখানে বাজারটাই বড়। বাস্তব জীবন, আদর্শ সূক্ষ্ম শিল্প সৃষ্টি বা উচচাঙ্গের রসোত্তীর্ণতার দিকে নজর দেওয়ার গরজ বাতিল। প্রেস্টিজ ছবি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা নতুন দিকে পদক্ষেপের কথা যাঁরা চিন্তা করেন এমন ডিরেকটরদের সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউটর গোষ্ঠীর সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়, কেন না ওসব খেয়ালখুশিকে আমল দিতে গেলে নাকি পথে বসতে হবে। এইসব ডিরেকটর যদি-বা প্রোডিউসার পান, হাউস পাবার সম্ভাবনা তাঁদের নেই। কে পড়ে পড়ে লোকসান দেবে এই বাজারে। 'মানুষের আত্মীয়' ছবির ডিরেকটর রাঘব সিংহরায়ের সিনেমা জগতে প্রোগ্রেসিভ মনোভাবাপন্ন বলে অল্পবিস্তর খ্যাতি আছে। আবার কমার্শিয়াল বাজারেও তাঁর ছবি মার খায়নি বড় একটা। মালভানি পিকচার্সেরও পয়সার অভাব নেই, তার চেয়ে বড় কথা দিলু। মালভানি সায়েব ছবির বাংলা, হিন্দী দুটো ভার্সনই করছেন এবং নিজের আইডিয়া দিয়ে গল্প লিখিয়েছেন। মূল কাহিনীর আসল কাজ এখনও শুরু হয়নি। এখন কেবল 'সাইড শটস' নেওয়া হচ্ছে। মালভানি নিজেকে পাইওনিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলা ছবির বাছাই-করা স্টারদের কাজে লাগাচ্ছেন। যদিও বেশি জায়গা জুড়ে রাখবেন না— নামগুলো ছোঁয়ানো, কেবল ছবির বাজার-দর বাড়ানোর জন্যই তাদের দরকার।

এ ছবির আসল নায়ক একটি বাঁদর। সত্যিকার বাঁদর। তার ভূমিকা বিরাট। বাড়ির সব ঘরোয়া কাজই সে করে। যেমন কলিং বেল বাজলে সে দরজা খুলে দেয়। খাবার টেবিলে চা-কফি সার্ভ করে। মনিবের ইশারায় খবরের কাগজ হাজির করে। মনিবের সুখ-দুঃখ অনুযায়ী তার সুখ, দুঃখ ও আনন্দের প্রকাশ। আরও অনেক গুণেই সে মানুষের মত—মানুষ নয়, অথচ যেন মানুষ। এ-কাহিনীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে এমন বাঁদর কলকাতা থেকে শুরু করে বাংলা বিহারের সবগুলি বাঁদরের পট্টি, বেদের দল, সার্কাস পার্টি আঁতি পাঁতি খুঁজে মেলেনি। সব কটি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কয়েকটির সন্ধান মিলেছে তবে সর্বগুণসম্পন্ন চরিত্র একটিও তাদের মধ্যে নেই। কেউ কান্নার ভঙ্গি করতে পারে, কেউ হয়ত ট্রে নিয়ে টেবিলের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে কিন্তু রাখতে গেলে কাপ, পট উল্টে ফ্যালে, কারুর কলিং বেল শুনে লাফ দিয়ে দরজা পর্যন্ত যাওয়াটা ঘটে, কিন্তু দরজা খুলে দেওয়া তার দ্বারা হয় না। ট্রেনিং দিতে গেলে সে হয়ত দাঁত খিঁচিয়ে মারতে হাত তোলে। সমস্যাটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। গোটা পাঁচেক বাঁদরকে আপাতত স্টুডিওতে রেখে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে স্পেশ্যাল কোচ রেখে। পয়লা নম্বর মানবিক গুণসম্পন্ন একজন না পেলে অবশেষে ক্যামেরার সুপার ইমপোজিশন, মণ্টাজ, লং-শট ইত্যাদি কায়দায় প্যাঁচে ফেলে ছবিকে দাঁড় করানো হবে। কিন্তু সেটা অগত্যা। বোম্বে, মাদ্রাজেও এক দুই করে বিশ দফা গুণ-তালিকা দিয়ে বিভিন্ন ঘাঁটিতে জরুরি চিঠি দেওয়া হয়েছে।

টিফিনের পর আর সবাই যখন ফ্লোরের কাজে ব্যস্ত তখন শানুকে সঙ্গে নিয়ে মালভানি সাহেব বাঁদরদের ক্যাম্পে হাজির হলেন। তাঁদের দেখে স্পেশ্যাল ট্রেনার মুনেশ্বর হাঁকডাক জুড়ে দিল—লাল্লু—বিম্‌লি—কম্‌লি—

গাছের ডালে বোধ হয় লাল্লুর দল একটু জিরোচ্ছিল। ডাক শুনে নেমে এল। মুনেশ্বর ইশারা করতে লাল্লু বেশ মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে মালভানির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল এবং মালভানির সঙ্গে হ্যান্ড শেক করল। বিমলি হাত তুলে নমস্কার করল। কমলি পিছন ফিরে বসে রইল। তার কাছে গিয়ে মুনেশ্বর আদরের সুরে বলে—কি রে তোর আবার কি হল ? এ্যাঁ ?

কম্‌লি ভ্রুক্ষেপ করল না। মুনেশ্বর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে সাধাসাধি করতে থাকে। কিন্তু কম্‌লি নট-নড়ন-চড়ন। ওদিকে লাল্লুও

ানবের পিছু পিছু গিয়ে জামা ধরে টানাটানি করতে থাকে। মনেশ্বর তাকে ধমক দেয়—ব্যাটা তুমি তখন ওকে মেরেছ, এখন বোঝো ?

বানর-বানরীকে পাশাপাশি বসিয়ে দিয়ে মনেশ্বর হুকুমের চড়া গলায় বলে—জলদি ফ্যায়সলা কর বেটা।

শানুর বড় মজা লেগেছে। ওদের কাছাকাছি এগিয়ে গেল—কি হয়েছে ওদের ? এত রাগ কেন কমলার, ও তো আমাকে দেখলেই কাছে আসে—

—আর কি হবে আবার! জেলাসি।—জেলাসি দিদিমণি! দেখুন না রোজ এই ঝামেলা—বিমলির বাচ্ছা হয়ে ইস্তক কাজিয়া লেগেই আছে।

বলতে বলতে মনেশ্বর হাসছিল। তার ভাবভঙ্গী থেকে মনে হবে এই ঝামেলায় সে বেশ খুশি আছে।

বানর পরিবার-পরিজন নিয়ে সবাই যখন মশগুল, সেই সময়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার ব্যস্তসমস্ত ভাবে এসে জানাল—ম্যাড্রাসের ট্রাঙ্ককল বুক করা হয়েছে। স্যার আপনি একটু খেয়াল করবেন।

মালভানি তাকালেন—হয়েছে ?

—হ্যাঁ স্যার।

—ঠিক আছে। তা লাইন পেতে খুব দেরি হবে ? খোঁজ নিয়েছ ? পি প করেছ ত ?

—আজ্ঞে স্যার পি পি করা হয়েছে স্বামীনাথনের নামে।

শানুর কাঁধে হাত রেখে মালভানি চলতে শুরু করলেন। চণ্ডীও পিছু পিছু হাঁটছিল।

মনেশ্বর চণ্ডীর সঙ্গে কিছুদূর এসে এক জায়গায় তার হাত ধরে দাঁড়াল—আরে চণ্ডীবাবু একটু সবুর করুন, একটা সিগ্রেট ত খাইয়ে যান।

সিগারেট খাওয়াটা যে অছিলা সেটা একটু পরেই প্রকাশ পেল। মনেশ্বরের আসল কথাটা হল, মাদ্রাজের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা তার মনঃপূত নয়। কেননা 'মানুষের আত্মীয়' ছবির জন্যে সে যখন এইভাবে জান লুটিয়ে দিয়ে খাটছে তখন বেকার ভিনদেশীদের দরজায় ভিখিরির মত ধর্ণা দিয়ে বেকার বাংলার প্রেস্টিজকে খাটো করা কেন ? এখানকার বাঁদর বিদ্যায়-বুদ্ধিতে কোন দিক দিয়ে কম যায় না মনেশ্বর সেটা দেখিয়ে দেবে।

চণ্ডী পোড়েলেরও সেটাই মত। মনেশ্বরের স্বার্থের সঙ্গে তার নিজেরটাও

জড়িত। বাইরে থেকে উটকো বাঁদর এলে চণ্ডীর ভাগে টান পড়বে। তখন গোটা ব্যাপারটাই ওপর-মহলের কব্জায় চলে যাবে। এখন এইসব বাঁদর দেখা-শুনো আর ভরণপোষণ বাবদ যা বরাদ্দ আছে তার হিস্যা মোটামুটি ভালোই। কিন্তু কর্তাদের মতিগতি সুবিধের নয়। সেটা চণ্ডী বেশ ভালো করে বোঝালো মুনেশ্বরকে। শেষে বলল—দেখা যাক কদ্দুর কি করতে পারি তোমার জন্যে। তবে ভাই—

—সে জন্যে আপনি ভাববেন না। ভালো যদি হয় ত আপনার দিকও আমি দেখব, কসুর হবে না কিছু।

মাদ্রাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রোডিউসার খুব খুশি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রীতিমত বিজয়ীর ভঙ্গীতে তিনি ফ্লোরে পেঁছে ডিরকটর সিংহরায়কে সগর্বে জানিয়ে বলেন—মিশন সাকসেসফুল রায়বাবু।

একটা শট্‌কে মাঝপথে কাট ফরমাস দিয়ে সিংহরায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন—কি, কী মিশন মিঃ মালভানি?

—আরে আপনার হিরো পাওয়া গিয়েছে। এইমাত্তর ম্যাড্রাস থেকে স্বামী-নাথন জানালেন, এক্‌জ্যাকট স্পেসিফিকেশনের চ্যাম্পিয়ন হিরো পাওয়া যাবে। লেকিন চার্জটা একটু বেশি পড়ে যাচ্ছে।

—কতো?

—ওরা টোট্যাল কন্ট্রাকটে রাজি নয়।

—তবে?

—পার ডে এক হাজার টাকা, এছাড়া যাতায়াত প্লেন ভাড়া। আরও একটা কথা আছে, মিনিমাম বিশ দিনের চার্জ লাগবে।

সিংহরায় আকাশ থেকে পড়লেন—টু-উ মাচ ফর এ মাংকি। বরং এদিকে মুনেশ্বরের টীমকে কাজে লাগাব, স্টোরি একটু পাল্টে নিয়ে—

মালভানি গম্ভীরভাবে চুরুটে টান দিয়ে মিনিট খানেক পরে আস্তে আস্তে বলেন—ডোন্ট বি আনকাইন্ড রায়বাবু। হিরো ইজ হিরো। আপনার স্কিল্ড-আর্টিস্ট হিসেবে মান্‌কি যদি একসেল করে—থিওরিটাও—

—তার মানে?

—মানে ত সোজা। আপনার একটা হিরো, কি হিরোইনকে কত দিতে হয়? লাখের ধাক্‌কা—এ্যাঁ। কমন স্টোরি, কমন প্যাচ, এই নিয়ে পড়ে আছে আমাদের স্ক্রিন—নাথিং নিউ। এ্যাঃ—

—ত—হ্যাঁ। ওর কমে ফার্স্ট র‍্যাঙ্কের স্টার মেলে না।

—এক হাজার পার ডে চাইছে। অবিশ্যি একটু চাপ দিলে ওটা কমবে কিছুটা। কিন্তু ধরুন যদি তিরিশ দিনের জন্যেও হিরো, মানে মানুকিকে এনগেজ করতে হয় তাহলেও আদার ইনসিডেন্টাল খরচ আরও বিশ হাজার ধরলে ফিফটি থাউজ্যাণ্ডের মধ্যে আপনি একটা ইউনিক হিরোকে কাজে লাগিয়ে পাবলিকের কাছে সামথিং গ্রেট প্রেজেণ্ট করছেন।

সিংহরায় সিগারেট ধরালেন। মালভানি প্রোডিউসার হয়ে এইভাবে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে।

চণ্ডী পোড়েলের মুখখানা চুপসে যাওয়া বেলুনের মত দেখায়—চোখ দুটো বুজে এসেছে, যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। আসলে সে গভীর একটা মতলব মগজে বুনতে চেষ্টা করছিল তাই বাইরের সুইচগুলো অফ করে দিয়েছে।

কয়েকটা টান দিয়ে রাঘব বললে—ঠিক আছে, তাহলে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে আমাদের। অবিশ্যি এতে একটা ঝামেলা ঢুকে যায়—প্রেজেণ্ট টীমকে ট্রেন আপ ক'রে কী দাঁড়াত তা বলা শক্ত। আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। জানেন সাউথ ইণ্ডিয়া থেকে শিশিরবাবু তিনশ টাকা দিয়ে চাণক্যের টিকি আনিয়েছিলেন। অবিশ্যি সাজেসনটা ছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের।

—আরে আমি ত সেই ভেবেই—এ্যাঁ। এই দেখুন ফিনিশড ফার্স্ট র‍্যাঙ্কের অ্যাকটর পেয়ে যাচ্ছেন আপনি—এ্যাঁ। আর স্টোরিও। এ্যাঁ—সায়েণ্টিফিক ইভলিউশনকে স্ক্রিনে এস্টাবলিশ করার দিকেই নজর আপনার—এ্যাঁ। আমি প্রোডিউসার হয়ে আপনার সুবিধেটা যদি না দেখতে পারি ত কমন মানি-হাণ্টারদের সঙ্গে ফারাকটা কোথায়।

মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে প্রোডাকশন ম্যানেজারের। সে বাইরে বেরিয়ে ব্রেনে হাওয়া লাগাবার জন্য পা বাড়াতেই একগাট্টা মেয়ে সোহাগী পথ আগলে দাঁড়াল—মেনাজারবাবু, আমাদের টিপিনির কি হ'ল? বুড়িরা ধমকাচ্ছে, বাচ্ছাগুলান খিদ্যার চোটে কাঁদতিছে।

খিঁচিয়ে উঠল পোড়েল—তোদের জ্বালায় কাজ করবারও উপায় নেই! উঃ—

সোহাগীও ছেড়ে কথা কইল না—বিকাল হ'য়ে গ্যালো, সারাটা দিন সবাই

উপোসী অইছে। কাজ ত আমাদের কখ্নন চ্নকেব্নকে গেইছে। ইবার বিদেয় করলি ত হয়।

—ওঃ খ্নব যে ফটর-ফটর কচ্চিস। কাজ হয়ে গিয়েছে, বটে? পাঁচটা বাজ্নক আগে।

—বেশ টিপিনটাও দিবা না নাকিন। বাব্নরা সব খায়ে-দায়ে হাই তুলতেছে, প্যাট কি কেবল তুমাদেরই, মোরা বানের জলে ভেসে এইচি নাকি গ— !

সোহাগী আরও কিছ্ন বলতে যাচ্ছিল এবং ওর গলার স্বর বেশ চড়া। কর্তারা কাছাকাছি রয়েছেন, এই নিয়ে পাছে তাঁরা কিছ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করলে ফ্যাসাদ হয় এই আশঙ্কাতেই চণ্ডী গলা সপ্তমে চড়িয়ে হাঁক দিল—পঞ্চাননতলা থেকে যারা এসেছ আর যারা এখনো টিফিন করোনি তারা সব একসঙ্গে চলে এস ক্যান্টিনে—দেরি করবে না—একদম। এরপর কিন্তু আর পাবে না।

তার কথার ধরনে মনে হল, সে অনেক বার তাগাদা দিয়েছে কিন্তু এদের গাফিলতিতেই এতক্ষণ খাওয়া হয়নি

সোহাগী হল্লা জ্নড়ে দিল,—অ ঠাক্‌মা অ পাঁচুর মা, রমা পিসি, মান্ন, চ-চ মেনাজারবাব্ন ডাকতেছে। টিপিন খাবি আয়।

পাঁচুর মায়ের অ্যান্ডা-গন্ডা জ্নটিয়ে নিতে একট্ন সময় লাগে। ওর আগে, আগে ব্নড়িরা বেরিয়ে যায়। হঠাৎ ব্নধোর দিকে নজর পড়তে রমা বলল— কি রে তোর মা কই?

ব্নধো জবাব দিল—মা কাঁদতেছে পড়ে-পড়ে।

কথাটা পাঁচুর মার কানে যেতে ও পিছিয়ে গিয়ে তাগাদা দিল—কি রে তুই খাবি নি?

ব্নধোর মা নাকি স্নরে বলে—তুর আর কি। মায়ে পোয়ে তোরা ন' ট্যাকা কামাই করবি। আমার—উঃ মোচড় মারতেছে। উঠতি গেলি বড্ড যন্তন্না হচ্চে, তুরা যা, আমার ভাগেরটা ব্নধোর হাত দে পেটিয়ে দিস।

পেঁচোর মা উব্ন হয়ে পাশে বসে পড়ল। দরদমাখা কণ্ঠে তিরস্কার শ্নর্ন করল—তেখ্নন বম্ন ভরা পেট নে নদর-গদর করতি করতি যাবি, যদি বিইয়ে বসিস, তখ্নন—

উৎকণ্ঠায় কাঁপা হাতে ব্নধোর মায়ের পেটে হাত ব্নলিয়ে দিতে দিতে পেঁচোর মা দিশেহারা হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল। ওর বড়

ছেলেটা স্টুডিওর দরজা থেকে চিৎকার পাড়ছে। অগত্যা উঠে পড়ে বলল—ভাবিস নি বুন, ভগমানকে ডাক। মুই ঝট করে ঘুরে আসি।

ক্যান্টিনের বারান্দায় চণ্ডীকে পেয়ে পেঁচোর মা শিরা-ওঠা হাত চেপে ধরে মিনতি করুণ কণ্ঠে বলে—মেনাজারবাবু গো! আপনি ধরম বাপ—

চণ্ডী এসব কথায় আমল দিতে নারাজ, শুকনো গলায় কৈফিয়ৎ তলব করে—তা কি বলতে চাস? তোর পাওনা থেকে পেঁচোর চার্জ ত? না, না, তোর জন্যে দাঁড়িয়ে বেইজ্জত হইচি সায়েবের কাছে।

—না গো বাবু। উসব লয়। আমাদের সেই পোয়াতিডা—

—কী? কই সে—

—আরে সেই কথাই ত বলতিছি। উঠতি পারতেছে না। বড্ড যন্তন্না—

চণ্ডী ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁঝালো মেজাজে বলল—সে কী সর্বনাশ! শেষে ফেলোরেই প্রসব করে বসবে নাকি? কেলেঙ্কারির একশেষ হবে যে! চ-চ কোথায় দেখি—

সোহাগীর ঠাকুমা ধমক দিল—রাখো তো, টিপিন দাও ব'স। বুদোর মায়ের পেট ঘেঁটেঘুঁটে মুই দেখিচি। উডা পালট-ব্যথা, তার ওপর তামান দিন খেতি পায়নি। কারুর দে বরং উওর খাবারডা এখুনি পেটিয়ে দাও মেনাজার-বাবু। পেটের শত্তুর উওরে ছিঁড়ি খাচছে। পোয়াতীরি দানাপানি দিলি আগুনে জল পড়বে—ইডা বোঝো না, কিসির নেকাপড়া শিকিচ গো—

—তাই দিচ্ছি বাবা, এ্যাই ভানু—উঃ তোদের নিয়ে—

দক্ষিণ ভারত থেকে হিরো আসছে—'মানুষের আত্মীয়' ছবির নায়ক মানিক-কুমার। কথাটা মুখে মুখে চাউর হয়ে গেল। নতুন প্ল্যান প্রোগ্রামও সঙ্গে সঙ্গে ছকে ফেলা হল। ও-তরফ থেকে চিঠিও এসেছে। কলকাতা থেকে একজনকে পাঠাতে হবে, তার কাজ লোক্যাল ইন্সপেকশন করে ফিরে মানিকের জন্যে বসবাসের অনুকূল পরিবেশ তৈরির ব্যবস্থাপনা। মালভানির ইচ্ছে স্বয়ং ডিরেকটরকেই পাঠানো। সিংহরায় অবশ্য বললেন—দরকার হলে যাব।

কিন্তু এদিকে সেটের কাজ কামাই হবে। আপনিই ঘুরে আসুন না।

মালভানি ফুঁ দিয়ে হাওয়ায় হাত ছড়ালেন—প্লেনে যাবেন প্লেনে আসবেন, ওখানে একটা দিন, বড়জোর দু-দিন। তাতে কিছুই আটকাবে না। কাজ যা করবো আমরা—পারফেকট! আপনার কাজ কি আমাকে দিয়ে হয় রায়বাবু!

চণ্ডী মওকা খুঁজছিল। ফাঁক পেয়ে সায় দিল—মেজদাকেই পাঠানো ভালো, উনি সব খুঁটিয়ে দেখতে পারবেন। ব্যাপারটা ত সোজা নয়, যাকে বলে, এর ওপরই মানুষের রিভউলিউশনের মরণ-বাঁচন।

সিংহরায় হেসে উঠলেন উচ্চগ্রামে—রিভলিউশন নয় হে ইভলিউশন চণ্ডীদাস!

—ওই হল। তা সে যা-ই হোক। এখন নতুন প্রবলেম হয়ে পড়েছে মুনেশ্বরের পার্টিকে নিয়ে।

মালভানি এবং সিংহরায় যুগপৎ প্রশ্ন করেন—কেন সে কি বলতে চায়?

—সে বলছে। এখনই কি সে চলে যাবে? আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠেকিয়ে রেখেচি। কেন না, কখন দরকার পড়ে বলা ত যায় না।

সিংহরায় জবাব দিলেন—অত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। আমি ঘুরে আসি তারপর—

মাথা চুলকে চণ্ডী বলে—আমিও সেই কথাই বলিছি। ও বেঁকে বসেছে। বলে, ওর সব আশায় ছাই পড়তে চলেছে। ওর বাঁদরগুলোও খুব একসপার্ট, অথচ যদি এরপর ওদের রাখা হয় তখন ত একস্ট্রাদের রেটের বেশি দেওয়া হবে না, এখানেই গোলমাল—

—কেন, গোলমালটা কিসের। হিরো যখন পারফেকট পাচ্ছি আমরা—

সিংহরায় চক্রান্তের গন্ধ পেয়ে কঠিন হয়েছেন।

চণ্ডীও সায় দিল—আমিও সেই কথাই বলিছি। তবে একটা কথা মনে হয়েচে, যদি অভয় দেন—

মালভানি একটু ব্যগ্র—কী বলোই না চণ্ডীবাবু।

চণ্ডীর বক্তব্য, হিরোর পার্ট করে মানিক একটু নিজের জাতভাইদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চাইল, কি হয়ত একটু বা প্রেম-ট্রেম—তখন স্ট্যাণ্ড বাই হিসেবে এরা কাজে আসবে। তার মানে সাইড রোলের রেটও যদি মঞ্জুর করা হয়—

সিংহরায় হাসলেন—কথাটা মন্দ বলনি।

কর্তাদের মজলিস থেকে বেরিয়ে এল চণ্ডী। তার সঙ্গে রবি সিকদারও।

বাইরে এসে রবি বলল—মাইরি চণ্ডীদা, পায়ে ধুলো দাও গুরু।

—দ্যাখো রবি এই করে শালা সতের বচ্ছর কাটল। এটুকু না পারলে আর হল কি।

রবি হাসতে হাসতে আবদারের সুরে হাত পেতে বলল—গুরু একখানা সিগ্রেট ছাড়ো—

সিগারেট ধরিয়ে টান দিয়ে চণ্ডী আফশোস করে—শালা মানিকের রোলটা পেলে আর এই ছ্যাঁচড়ামো করতে হত না। সেরেফ একখানা লেজের কি মহিমা বল্ রবি—

সোহাগীর দল কোথায় যেন ওৎ পেতে বসে ছিল। চণ্ডীর গলা পেয়ে ওরা ঘিরে ধরল—এই যে মেনাজারবাবু আমাদের মজুরীটা—

—হচ্ছে—হচ্ছে—তোদেরই যত তাড়া। মজুরী বলচিস কেন, বল—চার্জ।

সারা দিনের পর ওরা মাথাপিছু তিন টাকা হিসেবে পাওনা পেয়ে বিদায় নিল

চণ্ডী উদারতার প্রাপ্য হিসেবে দাবির ভঙ্গীতে বলল—কি রে, সব খুশি ত ?

সে কথার জবাব আসবার আগেই একটা ছেলে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল —ওরে বাবারে, মাগো—ওমা—মরে গেলাম—

—কি হল, কিরে বিপিন—

—বিপিনের গলা না ?

—সাপে কাটল ?

আওয়াজ লক্ষ্য করে সবাই সেদিকে ধেয়ে গেল।

ব্যাপার কিছুই নয় মুনেশ্বরের ট্রেনিংপ্রাপ্ত বানরী 'কমলা' বিপিন নামক একগুঁয়ে কিশোরের গলা ধরে ঝুলছে। ছেলেটা যত ছাড়াবার চেষ্টা করছে বানরী ততোই শক্ত করে আঁকড়ে ধরছে।

মুনেশ্বর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল।

ভিড় জমে যেতে সে আস্তে ডাকল—কমলি—আয়—

কমলা মাটিতে লাফ দিয়ে নামল। তার আগে বিপিনকে আদরের কামড় বসিয়ে দিতে ভোলেনি।

বিপিন ছাড়া পেয়ে বাঁচল কিন্তু কামড়ের জ্বালায় আবার চেঁচিয়ে উঠল।

জমায়েৎ জনতা এবার মারমুখো হয়ে উঠেছে—এ কী অন্যায়, ছেলেটাকে পিষে মেরে ফেলতো যে। শালা বাঁদরামির জায়গা পেয়েছে। ধর তো

বাঁদরওয়ালাকে—শালা বাঁদরওয়ালা—

চণ্ডী কষে ধমক দিল—খবরদার। ওদের গায়ে যেন আঁচড় না লাগে।

বিপিন ক্ষেপে গিয়ে বলে—ক্যানো ওরা পীর নাকি। কাম্ড়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে—

—পীর না পীর। জানিস ওদের এক-একজনের চার্জ তোদের সবার মিলে যা হয় তার দশগুণ বেশি—

মুনেশ্বর আশ্বাস দেয়—তোকে কম্লি কার্টোনি চুমা খাইয়েছে। আশ্নাই—পেয়ার করেছে রে।

॥ চৌদ্দ ॥

মেজাজে বোশেখের-দুপুর নিয়ে নিত্যানন্দ বাড়ি ফিরল তখন এপাড়ার সব শামশুম্—রাত বারোটায় কে আর জেগে বসে থাকবে নিত্যানন্দর একান্ত বশম্বদ চাকর ভীম ছাড়া। না, কেউ জেগে নেই। ভারি কাবুলি-জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দে ভুলো কুকুরটা কান-ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। নিত্যানন্দকে দেখে সে বার কয়েক লেজ নেড়ে একটু দূরে সরে গিয়ে আরাম ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল।

অন্য দিনও নিত্যানন্দ সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ঢোকে না,—এটাই হ'ল তার বাড়ি ফেরার সময়। অন্য দিনের মতোই বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছিল।

ভীম বলল—বাবু, খাবার দিই ?

—না! আগে বৌদিকে ডাক—

ব'লে জুতো ছাড়তে ছাড়তে কি ভেবে নিজেই হাঁক দিল—বৌদি, ও বৌদি!

গলায় যেন বজ্রের গর্জন। চোখ রগ্‌ড়ে বৌদি উঠে এলেন—কি হয়েছে! রাত দুপুরে চেঁচামেচি করছ কেন ?

ব্যস! নিত্যানন্দ দেয়ালে একটা ঘুষি মেরে হুংকার ছাড়ল—কি! কি হতে বাকী আছে! তোমাদের আর কি বলো, নাক-ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছো।

—আমাদের মানুষের শরীর ত!

—থামো, মানুষের শরীরটার ওপর মগজটা আছে তোমার? বলি সেটার কথা মনে পড়ে? মগজটা একটু খাটালেই টের পাবে যে, মিথ্যে চেঁচামেচি করছি নে!

নিত্যানন্দকে বৌদি আজ নতুন দেখছেন না। কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন তিনি এই দেবরটিকে—যার খেয়াল-খুশির ঠিক-ঠিকানার বালাই নেই কস্মিন্‌ কালে। সত্যানন্দ মারা যাবার পর অবিশ্যি বছর দুই একটু গোছগাছ ক'রে সংসার চালাবার চেষ্টা করেছিল নিত্যানন্দ, কিন্তু তারপর থেকে আবার পুরনো বাউন্ডুলে ধাতটা পুরোদস্তুর ফিরিয়ে এনেছে। তাই, আজ

হঠাৎ বৌদিকে মগজ খাটানোর কথা বলতে তিনিও জবাব দিলেন—রাত দুপুরে আর হল্লা ক'র না, বাপু। খেয়ে-দেয়ে ঘুমোও।

—আজ একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে আমি জলগ্রহণ করব না। ডাকো তো বুঁচিকে। শীগ্‌গির তোলো—

—ও মা!

—যা বলি শোনো। জলদি—

তার কথা বলার ধরনে অধীর আদেশের ঔদ্ধত্য। বৌদি কিছু করবার আগেই নিত্যানন্দ বুঁচির চুলের মুঠি ধ'রে সোজা দাঁড় করিয়ে বল্‌ল—খবরদার।

টানা-টানা চোখের পাতা ঘুমের ভারে যেন বুজে আসছে, তবু আচম্‌কা কাকার ধমক খেয়ে বেচারী বুঁচির পাত্‌লা ঠোঁট ফুলে ওঠে। কোনো কথা বলে না। কি বলবে। কি হয়েছে? কেন এই খবরদারী?

এবার বৌদি ধমক দিলেন নিত্যানন্দকে—কি হয়েছে বলো তো?

—হবে আবার কি? তোমার মেয়ে গোপনে কোনো ইয়ংম্যানের সঙ্গে প্রেম করছে কি না খবর রাখো?

বৌদি যেন এতক্ষণে নিত্যানন্দের উষ্মার কারণ খুঁজে পেয়ে বাঁচলেন। মেয়ের সামনে এগিয়ে এসে বললেন—শেষে তোর মনে এই ছিল?

ভীম এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছোটো বাবুর কাণ্ডকারখানা দেখছে।

বুঁচির ঘুম এতক্ষণে ছুটে গেছে। ওর গৌরী গালে লালের ছোপ ফুটে উঠেছে। ফিক্ ক'রে হেসে ও বলল—ধ্যাৎ! কাকামণির যতো উদ্‌ঘুটে কথা। আমি কোন্ দুঃখে প্রেম করতে যাবো? যতো সব খ্যাংরাকাঠিতে আলু বসানো চেহারা!

—খবরদার!

নিত্যানন্দ আর এক দফা গর্জন করল।

বুঁচি বল্‌ল—আঃ, চুল ছাড়ো, লাগে না বুঝি আমার!

—ঠিক বল্‌ছিস, তুই কোনো ছেলেকে লুকিয়ে ভালোবাসিস না?

—আমার বয়েই গেছে।

—অফ্‌কোর্স, ভালোবাসাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লুকিয়ে ভালোবাসো আমি বরদাস্ত করব না। হ্যাঁ, ভালোবাসো তো এখনো স্পষ্ট বলে দাও। নইলে ফ্যাসাদ—।

বৌদি ফিস্‌ফিসে গলায় বললেন—ঘরের কেলেঙ্কারি আর চাউর করতে হবে না ঠাকুরপো। একটু আস্তে কথা বলো। যদি কেউ শোনে—

ভীম বল্‌ল—বাবু!

—কি? ও! দে, দে শীগ্‌গির খেতে দে।

ব'লে নিত্যানন্দ বাথ্‌রুমে চলে গেল।

বুঁচির মা মেয়ের পেটের কথা বার করবার চেষ্টায় লাগলেন—কি হয়েছে বল্‌ হারাম্‌জাদী!

—কি আবার হবে!

—আমাব মাথা খাস্‌ মরা মুখ দেখিস যদি সত্যি কথা না বলিস!

মায়ের গা ছুঁয়ে বুঁচি বলল—আমি কিছু জানি নে। কিছু না মা—

—তবে যে নিতাই অমন ক'রে বলছে?

—কাকার কথা ছেড়ে দাও। কোথা থেকে কি শুনে এসেছে কে জানে!

—তুই ঠিক বলছিস যে ও-পাড়ার পেণ্টু কি চাঁদু কারুর সঙ্গে—

—আচ্ছা মা, আমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি ঘটে একেবারে নেই। তাছাড়া, যাদের এবেলা-ওবেলা হাঁড়ি হেঁসেল আর কলেজের পড়া নিয়ে লড়াই করতেই দম ফাটে তাদের ফালতু টাইম কোথায়? যত্তো আজগুবি ইয়ে—

বাথরুম থেকে নিত্যানন্দ বেরুলো অন্য মানুষ হয়ে।

বৌদি তাকে বললেন—কি হয়েছে ঠিক করে বল তো ঠাকুরপো।

সামান্য একটু হাসির ঝিলিক খেলে গেল নিত্যানন্দের পানের ছোপ-ধরা দাঁতে। সে বলল—দাঁড়াও, খিদের সময় জ্বালিয়ো না।

বুঁচি ঠাঁই ক'রে দিল, ভীমকে সরিয়ে বৌদি নিত্যানন্দর খাবার থালা এগিয়ে দিয়ে হাত পাখা নিয়ে বসলেন।

রুটি চিবোতে চিবোতে নিত্যানন্দ বলল—হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ! আজকাল যা হালচাল তাতে আগে থেকে সাবধান না হলে শেষরক্ষে হওয়া ভারি মুশ্কিল। বুঝলে বৌদি, দিনকাল বড় ব্যাড্‌!

কিন্তু আলোচনার খাত অন্য দিকে বয়ে গেল; নিত্যানন্দের মুখে একটা হাজা-পটল পড়াতে, সে ডাকল—এই রাস্কেল।

এ ধরনের বাছাই বিশেষণের লক্ষ্য আর কেউ হতে পারে না ভীম তা জানে। সে এগিয়ে এল—বাবু।

—তোমার চাকরি চলে যাবে। হাঁ। হাজা পটল, পচা মাছ এইসব খুব

চালাচ্ছ আজকাল। বলি, মেরে হাড়গোড় 'দ' ক'রে ছাড়ব। রাস্কেল, বাঁদর, উল্লুকে-পাট্‌ঠে। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে—

ভীম মাথা চুলকে একটু ভালোমানুষী সুরে বলে—বাজারে এরচে' ভালো পটল ছিলো নি, বাবু।

—আবার কথার ওপর কথা—।

বৌদি চিম্‌টি-কাটা চালে ফোড়ন দিলেন—তা দরেও পাঁচ টাকা। ও-বাড়ির রামেশ্বর দেখলাম চার টাকা কিলো পটল এনেছে—এ্যাত্তো বড় বড় পটল, গায়ে জলের ছিটেফোঁটা নেই।

—কি যে বলেন মা! এই রামেশ্বরটা পয়লা নম্বরের চোর, ওজনে মারে। ওকে আর আমি জানি নে, ওর নামই ত হ'লো গে আধসের-তিন পো'! আধ সের এনে তিন পো বলে। মুখুয্যেদের বাড়ি থেকে ওর চাকরী গেল কেন?

বুঁচি বলল—আচ্ছা ভীম দা' তুমি এক কাজ করলেই ত পারো!

—কি?

—কাকামণির কাছ থেকে সুদ নিলেই পারো, এ রকম পচা-হাজা জিনিস এনে পয়সা মারবার দরকার হয় না তাহলে।

জিভ্‌ কেটে ভীম দু-হাত কানে ঠেকিয়ে বলে—ছি-ছি, অমন কথা কানে শুনলিও পাপ। বাবু আমাদের দেবতুল্য মনিষ্যি, নইলে সেবার রায়েটে এই ভীমে ব্যাটাকে জানে বাঁচাতি হতো নি।

—আহা সেজন্যে ত তুমি এখানে চাকরিই করছ। কিন্তু তোমার টাকা আর কাউকে ধার দিলে একটা সুদ পেতে ত!

ভীম এবার ধমক দিল—থামো তুমি। ছেলেমানুষের সব কথায় কথা কওয়া ভালো না। আমি এ বাড়িতে চাকরি করি কি সেবা করি সিডা আমার বিচারেই থাক।

নিত্যানন্দও অস্বস্তি বোধ করছিল। প্রসঙ্গটা তার কাছে খুব রুচিকর হবার কথাও নয়। কেন না, ভীম এ বাড়িতে চাকরের কাজ করে বটে, এবং সেজন্যে তার একটা মাস-মাইনেও বরাদ্দ আছে ঠিকই, তবে তার মধ্যে একটা 'কিন্তু' রয়েছে। ভীম আপিসে দশটা-পাঁচটা চাকরী করে এবং সে মাসের পয়লা তারিখে নিত্যানন্দকে নিয়মিত ভাবে পুরো বেতনটাই ধার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। ফলে, ভীম যেমন চাকর তেমনি মহাজনও বটে। একটু একটু ক'রে নিত্যানন্দর দেনাটা কয়েক হাজার হয়েছে। বুঁচি অতো

কথা জানে না। বৌদি যদিচ অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারেন তবু সঠিক অংকটা তাঁরও জানা নেই। আর জানলেই বা তিনি কি করতে পারেন। বুঁচিটা পাস করলে যদি, যদি কেন, চাকরী বুঁচিকে নিতেই হবে। নিত্যানন্দ নিজেকে যেদিন থেকে পুরোদস্তুর শিল্পী ব'লে ঘোষণা করেছে সেদিন থেকে অর্থকরী আঁকার কাজও ছেড়েছে। না, আঁকা ছাড়ে নি, বরং বাড়িয়েছে বলা যায়—তবে ওই সিনেমার আর্ট ডিরেক্টরের কাজ কিম্বা বিজ্ঞাপনওয়ালাদের ফরমায়েসী কাজ সে আদৌ করতে চায় না। ভাগ্যে তার দু-চার জন নাছোড়বান্দা পুরনো বন্ধু মাঝে মাঝে ঘাড়ের ওপর সওয়ার হয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে মোটা টাকা পকেটে গুঁজে দিয়ে যায় তাই এখনো বুঁচির কলেজের মাইনে দেওয়া বা কাপড়-জামা কেনার পথ একেবারে ঘুচে যায়নি। নিত্যানন্দ শিল্পী একথা বাড়িওয়ালা, মুদি সবাই জানে—এবং জানে ব'লে হয়তো মামলা রুজু করেনি এখনো। না, শুধুমাত্র শিল্পী হ'লে হয়তো তাকে এতটা সমীহ করার দরকার হ'ত না—নিত্যানন্দর আছে বিরাট একটি ভক্তগোষ্ঠী। এই ভক্তেরা অন্ধ। অন্ধ আর অন্ধ-ভক্তে কিছুটা ফারাক স্বীকার করতেই হয়। অন্ধ ভক্তেরা চোখে দ্যাখে, অন্যের অন্যায় বড় ক'রে দ্যাখে, গুরুকে তারা অভ্রান্ত দেখতে অভ্যস্ত এবং দুনিয়ার আর সকলকেও এই পন্থায় পথিক রূপে না দেখলে যথোচিত প্রতিবিধানে তৎপর হয়ে থাকে। তদুপরি নিত্যানন্দের সাকরেদরা তাজা ইয়ুথ। অতএব সবাই এদের তোয়াজ করে।

কিন্তু নিত্যানন্দ এসবের মধ্যে যেতে চায় না। সে এখন নিজেকে শিল্পের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চায়। কেন না, আজকাল জীবনের আর কোথাও সে তেমন তৃপ্তির স্বাদ পায় না। পুরনো অনেক কিছুই এখনো অভ্যেস হিসেবে বজায় রয়েছে বটে—কিন্তু তার মধ্যে স্বাদের 'জোশ' নেই। ভীমের পাওনা টাকার অংকটা হাজা-পটলের বিস্বাদকে ভুলিয়ে দিয়েছে। দাঁত চেপে নিত্যানন্দ খাওয়া ভুলে আজকের রাতের ঘটনাগুলো ভাবতে শুরু ক'রেছে। ভীম থেকে শুরু ক'রে কন্দর্পলালবাবু পর্যন্ত সবাই মিলে এই দুনিয়াটা কেমন যেন মিছিলের পুতুল হ'য়ে উঠেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরা সবাই ত পুতুল—মানুষ এদের মধ্যে কতটুকু।

তাকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখে বৌদি বললেন—ঠাকুর পো! আমার কাছে ত তুমি কোনোদিন কিছু লুকোও না। কি হয়েছে, এত কি

ভাবছ বলো দেখি—

যেন কোনো একটা তামাশার কথা বলেছেন বৌদি। হো-হো ক'রে হেসে জবাব দিল নিত্যানন্দ—ভাবছি? আমার ভাবনার কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরে গেলেও হদিস পাবে না বৌদি। জানো, আজ এমন একটা কাজ আমি করিয়েছি, বা নিজেও করেছি বলতে পারো,—যার সঙ্গে আমার নিজেরই মতের ঘোরতর বিরোধ। আর সেই জন্যেই তোমাদের ওপর এতটা হামলা—রিয়্যাকশন।

—কি? কি এমন কাজ করলে? খুন-জখম, না লুট-পাট?

—না বৌদি তার চেয়েও বোধহয় বড়-অন্যায়। কিন্তু তার আগে এতটা এগিয়ে গড়িয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা যে, যখন টের পেলাম তখন আর ফেরা চলে না।

খাওয়া পড়ে রইল, নিত্যানন্দ শুরু করল—তুমি ত রামবাবুকে চেনো। আমার অনেক কালের পুরনো বন্ধু—

—কোন্ রামবাবু, সিনেমার ডিরেক্টর? না বেহালার সেই পণ্ডিত—।

—বেহালার রাম গো, জ্ঞানী-গুণী, বেশ উঁচুমনের মানুষটি।

—হ্যাঁ, তার আবার কি হ'লো?

—না, তার কিছু হয়নি। সে আমাকে এসে ধরলো, একটা বিয়ের ব্যাপারে আমার সাহায্য একান্ত দরকার। লেখাপড়া জানা সাবালক মেয়ে, বুঝলে, সেই মেয়েটি একজনকে ভালোবাসে। এদিকে তার বাড়ির গার্জেনরা তাকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ অন্য এক জায়গায় বিয়ের ঠিক করে ফেলেছে। বিয়ের তারিখ পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছে। এদিকে মেয়েটি যাকে ভালোবাসে সে আবার রামবাবুর খুব অনুগত, ছেলেটি ভালো চাকরি করে কলেজে। সমূহ বিপদ দেখে ছেলেটি এসে রামের কাছে কেঁদে পড়েছে 'দাদা বাঁচান।'...রামের কাছে সব শুনে আমি শুধু জিগ্যেস করলাম, মেয়ের কি মত? ও বলল, মত আবার কি, আসলে ব্যাপারটা মতামতের বাইরে চলে গিয়েছে। কেন না, তিন মাস আগেই ওদের বিয়ে চুকে গেছে। ব্যাপার হ'ল, মেয়েটি তার বাড়ির গার্জেনদের এতই ভয় করে যে, মুখ-ফুটে আসল কথাটা জানাতে সাহস করছে না।

—ও মা আমার কি হবে। বিয়েই যখন করেছিস তুই, তখন আর ভয়টা কিসের? লুকো-চাপার কি আছে। নাও, নাও খেয়ে নাও দেখি—

বৌদি আবার পাখা চালাতে শুরু করলেন। পাশের কোন্ বাড়িতে একটা বাজল 'টং' ক'রে।

নিত্যানন্দ রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরে বলল—কাপুরুষ। আজকালকার ছেলেমেয়ে সব শালাই কাপুরুষ। নইলে অমৃতময়ও ত মেয়ের বাপের কাছে সটান গিয়ে সত্যি কথাটা বলতে পারতো। পুরুষ মানুষ হয়ে বলে কিনা—নাকি, ওদের বাড়িতে দরওয়ান, বন্দুক, কুকুর সব আছে। আরে গাধার ডিম, তোর শ্বশুরবাড়ি, তুই ঘাবড়ালে চলবে কেন? যাক গে, যা হয়েছে শোনো বলি, রামের কথায় আমি হৈ চৈ পার্টির বাছাই জনা-পাঁচেককে তলব করলাম। কাজটা ত এমন-কিছু শক্ত নয়। শুধু ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা হাজির করানো। সেটা অবিশ্যি মেয়ের কাছে রয়েছে। তা আমরা গিয়ে পড়ে আসল খবরটা ফাঁস করার পর, মেয়ের বাপ-খুড়ো যতোই লাফালাফি করুক, আইনের দিক দিয়ে কিচ্ছুটি করতে পারবে না। খুব মেজাজ নিয়ে ত আমরা হাজির সেই আলমবাজারে। বাড়িখানা মস্ত, ম্যারাপ পড়েছে, সানাই বসেছে, খাঁটি ঘিয়ের ভিয়েন—গন্ধে চারদিক মাতোয়ারা। দেখলে কে বলবে যে, বিয়ে আজ নয়, কাল। গায়ে-হলুদের দিনেই এত ঘটা! মনে মনে ভাবলাম ছোকরা অমৃতময়ের কপাল ভালো। খুব জোর গেঁথেছে। আমার ইচ্ছে, বিয়েটা কালই হোক কেবল উট্‌কো বরের বদলে অমৃতময় বসুক, শুভদৃষ্টি ঝালাক্। বাড়িতে ঢুকে কন্দর্পলাল বাবুর ভারিক্কি চেহারা আর চওড়া গোঁফ দেখে ইচ্ছে করছিল চট্‌পট্ একটা স্কেচ ক'রে নিই। কিন্তু তখন ত আমি সমাজসেবী। বেশ রসিয়ে বললাম, তা আয়োজন আপনার প্রশংসার দাবি রাখে।......ভদ্রলোক হাসলেন, একটু দম্ভ-দাপুটে বিনয় ফুটিয়ে বললেন—'সবই আপনাদের দয়া। মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'-

'আজ্ঞে বরের বাড়ি থেকে।'

অমনি ঘটা শুরু হল অভ্যর্থনার।

উনি বললেন—'তা ইন্দ্রকুমার বাবাজী আজই এসে পৌঁছে গেছেন? ওঁর ত দিল্লী থেকে আগামীকাল সকালে পৌঁছুবার কথা।'

আস্তে আস্তে আসল কথায় এসে পড়লাম। ভদ্রলোক সব শুনে 'ফিট'

হয়ে গেলেন। বাড়িশুদ্ধ সবাই এসে জড়ো হ'ল। কান্নাকাটি পড়ে গেল। বিয়েবাড়িটা তিন মিনিটে শ্রাদ্ধবাড়ির মতো কান্নার ঢেউ-এ ভাসতে লাগল। আমি নন্দকে পাঠালাম ডাক্তারের কাছে। ও বাড়িতে সবাই কান্নায় মুষড়ে পড়েছে, এদিকে কন্দর্পলাল ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তাঁর দিকে তাকাবার কথা কারুর মনেই নেই। মহা ফ্যাসাদ! জানো বৌদি, এমন জানলে কোন্ শালা সমাজ-উদ্ধার করতে যেত।

—তারপর কি হ'ল? মেয়ে কি বলল?

—আর বলো না। মেয়ে ত শুনলাম মুখে সুপুরি দিয়ে বসে আছে। তাকে নাকি কথা বলতে নেই।

—বাঃ!

—ইচ্ছে করছিল ওর রাঙা গাল দুটো আচ্ছাসে চড় মেরে ভারমিলিয়ন-রেড্ ছুটিয়ে দিই। বুঝুক একবার।

নন্দ আনল ডাক্তার। বিন্দু আনল গরম দুধ। আমরাই ও বাড়ির লোক হয়ে গেছি ততক্ষণে। জ্ঞান ফিরতে আমি কন্দর্পবাবুর কাছে মাপ চাইতে না-চাইতে তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ভদ্রলোকের ওই মেয়েই একমাত্র সন্তান, স্ত্রীও বেঁচে নেই। আমি পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু বিন্দু কানে কানে মন্তর দিল—'নিত্যদা! কালকের ব্যাপারটার পাকাপাকি কথা কয়ে নিন্। আর মেয়ের কাছ থেকে সার্টিফিকেটটা—।'

...এদিকে ভয় করছে, যদি আবার জ্ঞান ফিরে কন্দর্পলাল আমাকে দেখে মূর্চ্ছা যান। আর টেঁসে গেলে ত হাতকড়া পড়বে। একটু তফাতে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। উল্টো ঝামেলা, কোথায় হাঁক-ডাক ধমক-ধামক দেবো—না, চোরের দশা দাঁড়িয়ে গেল। এদিকে সরে এসে একজন মহিলাকে দেখে জিগ্যেস করলাম—'মানসী কোথায়?' তিনি একটা ঘর দেখিয়ে দিলেন। ঢুকে দেখি পুতুলটা ড্যাব্-ড্যাব্ ক'রে দেখছে আমাকে। বললাম, 'আমরা অমৃতময়ের দাদা। তোমার ম্যারেজ সার্টিফিকেটখানা বার করো। ওঠো, অমন হাঁ ক'রে বসে থাকার টাইম নেই। জল্দি।'

ড্যাব্-ড্যাব্ ত ড্যাব-ড্যাব—ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে বসেই রইল। ইডিয়ট্। এদিকে এসে পড়েছে হেমবাবু। ওর দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি। তিনি আমাকে দেখেও দেখলেন না। যেন মানুষই নই। তবু বুঝলাম যে, ইনি

প্র্যাক্‌টিক্যাল লোক। মানসীর পিঠে হাত বুলিয়ে বেশ মিষ্টি সুরে বললেন—'মানু। যা হয়েছে, সত্যি বলো। বিয়ে তুমি করেছো?"

'হুঁ।'

'তুমি অমৃতময়কে বিয়ে করেছ?'

'হুঁ।'

'ম্যারেজ সার্টিফিকেট তোমার কাছে রয়েছে?'

মেয়ে তখন গালের সুপুরির ফাঁক দিয়ে বলল—'দ্যাখাবো?'

গম্ভীর হয়ে হেমবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'একটু বাইরে চলুন নিতাইবাবু!'

কন্দর্প সামনে উঠে হন্‌হন্‌ পায়চারী করছিলেন, আমাকে দেখেই বললেন—ছেলে পক্ষ যদি আমাদের নামে মামলা করে তাহলে আমি কিন্তু তাদের হয়ে সাক্ষী দেবো। জালিয়াৎ, জোচ্চোর সব।

হেমবাবু হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন—মাথা গরম করে ত কোনো লাভ নেই। সিচুয়েশন যা দেখছি তাতে ইন্দ্রকুমারের এখানে বিয়ে না হয়ে ভালোই হয়েছে। ওই মেয়ে, দিব্যি ভালো মানুষ। মশাই, দেখলে মনে হয় ফুলো-ফুলো গালের ভেতরে পর্যন্ত মাখন মাখানো, তার পেটে-পেটে এত? যাক গে, নিতাই বাবু, এখন আমাদের কি করা উচিত বলুন—

আমার প্রস্তাব শুনে সবাই মাথা নাড়ল—না, না সে আমরা হতে দেবো না। আমরা সবাই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যদি কিছু করতে হয় আপনারা করতে প্যারেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকা কি উচিত, আপনি মনে করেন?

—অনেক ক'রে বোঝালাম, ছেলেমানুষ একটা ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু সে কথা কে শোনে। ওঁদের পক্ষেও যুক্তি আছে, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ নাকি লুকিয়ে করা হয় নি, বরপক্ষের লোকেরা এসে পাকা দেখে গেছে। আরো যা যা হবার সবই সদরে হয়েছে। বাপের ওপর এতটুকু দরদ থাকলে কোনো মেয়ে এভাবে সবকিছু গিলে চেপে বসে থাকতে পারে না।

—কথাগুলো ভেবে দেখবার মতো, বুঝলে বৌদি। তাই আমার

মনে ভাবনা ঢুকে গেছে, বুচিটাও দেখতে ভালো, বুচি কলেজেও পড়ছে, তা হলে নির্ঘাৎ তলে তলে প্রেম করছে, একদিন আমাদের ও এমনি ক'রে ফাঁসাতে পারে।

বৌদি হেসে বললেন—পাগল আর কাকে বলে? আমাদের কি আছে যে ফাঁসাবে। তা এখন কি অবস্থা দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত?

আহার পর্ব সমাধা করতে ব্যস্ত নিত্যানন্দ। শেষকালে এক গ্লাস জল খেয়ে উঠে পড়ল। বলল—দাঁড়াল এই যে, আমাকে কাল সকালেই হেমবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রর মামাবাড়ি ছুটতে হবে। বেচারী বিয়ের জন্যে ছুটি নিয়ে দিল্লী থেকে এসে যখন এইসব শুনবে তখন তার মনের অবস্থা কি দাঁড়াবে ভাবো তো। এমন জানলে কোন ইডিয়েট এর মধ্যে নাক গলাতে যেত।

বিছানায় শুয়ে নিত্যানন্দ কিছুতেই ঘুমোতে পারে না। এপাশ-ওপাশ করে আর কন্দর্পবাবুর গোঁফজোড়া চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কিম্বা মানসীর ড্যাব্-ড্যাব ফ্যাল-ফ্যাল চাহনী। আচ্ছা মানসী কেন এমন মুখচুরি ক'রে বসে রইল? আগে থেকে জানিয়ে দিলে ত পারতো। ভয়? না।...ভয় নয়ই বা কেন। আজ থেকে চার বছর আগে যখন মহিমা নিত্যানন্দর কাছে সব কিছু উজাড় ক'রে দিয়েছিল, যখন ওরা বিয়ে করবে স্থির করেছিল তখন—। নিত্যানন্দ বলেছিল মহিমাকে, ওরা মা-বাবাকে জানানোর কথা। মহিমা বলি-বলি ক'রে একমাস ধরে সময় নিয়েও বলতে পারে নি, এমন কি নিত্যানন্দ যখন নিজে গিয়ে তাঁদের কাছে জানাতে চাইল তখনও বলল—"আজ নয়। আমি তোমায় বলব কবে জানাতে হবে।' সেই কবে-টাও কখনো এগোয় না। মহিমাও বলেছিল 'আগে বিয়ে ক'রে পরে খবরটা ব্রেক করা অনেক বেশি সেফ্।' নিত্যানন্দ মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছিল—'আমার কাছে সেফ্টির চেয়ে ট্রুথ-এর মূল্য অনেক বেশি মহিমা।'

মহিমা এখন কোথায় কে জানে! মহিমাই কি নাম আর চেহারা পাল্টে মানসী হয়ে দেখা দিয়েছে?

মনে মনে একখানা নতুন ছবির পরিকল্পনা মাথার মধ্যে পোকার মতো কামড় দিচ্ছে—পুতুল, পুতুল। বিরাট একটা পুতুলের মিছিল। তাতে

রয়েছেন গোঁফওয়ালা কন্দর্প, ড্যাবডেবে চোখে মানসী, অমৃতময় অসহায় চুলের বিস্তারে, বিন্দু, নন্দ, ডাক্তার, ভীম, বৌদি, আর? আর কে থাকবে? কেন, মহিমা। হ্যাঁ মহিমাকেও আঁকতে হবে। কিন্তু মহিমার মুখখানা যে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকারে অনেক খুঁজেও ব্যর্থ নিত্যানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলল বার কয়েক। না, তবু মনে পড়ল না। এই বিচিত্র মানসিক হতাশায় নিত্যানন্দর নিজেকেও পুতুল মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, সেও পুতুল বই কি, সবাই—সব, পুতুল।

॥ পনের ॥

ইডেন গার্ডেনের ঝোপের আড়াল থেকে একটু জোরে গুলতি ছুঁড়লে অ্যাসেম্বলি হাউস টপকে টাউন হলের উঁচু বাড়িটার মোটা গথিক থামের বাহারী কার্নিশের প্রশস্ত আস্তানার সুখী পায়রাগুলি মরুক বা না মরুক, ডানা ঝটপট করে প্রাণটুকু বাঁচাবার তাগিদে বকম-বকম উড়ন্ত আর্তিতে আফিমে বুঁদ নিরিবিলি বাতাসকে উত্যক্ত-বিরক্ত করবে। কল্পনাটা ঠিক দানা বাঁধতে পারেনি সেদিন। আমার ললাটে দিনটা অশুভই বলতে হবে। কেননা, পৌর আদালতের পরোয়ানা পেয়ে দুরু দুরু বুকে, চওড়া সিঁড়ি ভেঙে উঁচুতে ওঠার সময়ে জীবনের ওপর, মানে, নিজের ওপর আস্থা কমে যাচ্ছিল।

ঠিক এই অসতর্ক অবস্থায় শার্ট-ধুতি পরা এক ছোকরা একগাল হেসে অভিনন্দন জানাল। যাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে তিনি রবীন্দ্রনাথ বা যিনি অভিবাদন করলেন তিনি শরৎচন্দ্র নন। আসামীকে দালাল, মানে শিকারকে শিকারীতে ধরল। কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের ভাড়া, কর ইত্যাদির বাকী বকেয়া আদায়ের জন্যে এখানকার আদালতে 'হুজুর' 'ধর্মাবতার' সমাসীন। অতএব উকিলবাবুরা কালো কোট গায়ে ঠাটে বসেন ওৎ পেতে—দালাল তোমাকে মিষ্টি কথায় কব্জা করে আনুক, তারপর—।

আমি শ্রীহরিদাস পাল এসব শুনে শুনেই সেয়ানা হয়েছি। তাই গোড়াতেই নিজেকে হুঁশিয়ার করেছি। তবু অসহায়—কেননা, পেশাদার আসামী নই। ফিল্ডে নেমে দিশেহারা। কোথায় কি করতে হবে কে জানে।

'ম্যাও' করলেন উকিলবাবু। তাঁর হাসি-মুখ গম্ভীর হল—সর্বনাশ! লাইসেন্সের টাকা দ্যান নি? জানেন এর জন্যে পাওনার তিন গুণ জরিমানা হবে। পঞ্চাশ টাকার লাইসেন্স—এখন দেড়শ টাকা গাটগচ্চা গুণতে হবে যে!

—কেন?···পিলে চমকে উঠল টাকার অঙ্ক শুনে।

কাক্কেশ্বরের মতো ফিকিয়ে হাসলেন—আইন! মশাই—আইন।

পকেটখানা বড়ই গরীব। তাছাড়া, এটা ভয়-দেখানো বলেই সন্দেহ আমার। তাই ঝাঁঝালো মেজাজেই জবাব দিই—আইন-টাইন রাখুন, বলুন আপনি কত নেবেন ?

কালো-কোট কানে খাটো তবে ধূর্ত চোখে আমার মুখের রেখা পড়ে' ফেলে তড়পে উঠলেন—কি বললেন ? আইনস্টাইন—। হাসালেন মশাই। ও সব হাইকোর্টের বড়লোক ব্যারিস্টার। বারওয়েল, মায়ার্স, আইনস্টাইন সব মিয়ার নামই জানি। পঁচিশ বছরেও সায়েবের পা-চাটা অভ্যেস ঘুচলো না ! এই গোলামীর জন্যেই দেশটা জাহান্নামে গেছে। যাক গে, কি করবেন বলুন।

মরিয়ার আবার কিসের ডর। বললাম—নিজেই দাঁড়াবো মশাই ! দেউলে ফেকলুর মোক্তার লাগে না।

আসলে এদের সবটাই চালাকি। এখানে টাইপিস্টকে একটি টাকা দিলেই বাঁধা-গতের বয়ান টাইপ করে দেয় ; পাঁচ দশ কি বড়জোর ত্রিশ টাকা ফাইন দিলেই খালাস। কোন্ পাটোয়ায় যেন লিখেছে এ সব কথা। হঠাৎ মনে পড়ল—খোঁচা খেলে প্রাণের তাগিদে বুদ্ধি আমার খুলে যায়।

উকিলের খপ্পর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে টাইপিস্টকে খুঁজছি।

আবার সেই ছোকরা দালালটি। —কি হল দাদা ?

তাকে তুচ্ছ তুড়িতে উড়িয়ে দিই—পিঁপড়ের পাছা টিপলে ঘি বেরোয় নাকি।

—তার মানে ?

—মানে কিসসু না। পিটিশন করব, এখন টাইপিস্টকে পেলেই আমার চলবে। এ সব কেসে উকিল লাগে না মশাই। আমার জানতে বাকী নেই।

ছোকরা বোধহয় পিশাচসিদ্ধ। একগাল হেসে সান্ত্বনা দিল—টাইপিস্টও লাগে না।

—তার মানে ?…চমকে উঠলাম।

ছোকরা আমাকে বাজিয়ে দ্যাখে—মানে, আপনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেন ত বলুন, আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

ছোকরা পথে এসেছে। জবাব দিলাম—তা না-পারব কেন—গরীব মানুষ এটা তো ঠিক, আর বোবাও নই ! বলব, কারবারটা চলছে না, তাই টাকা দিতে পারিনি—।

—ব্যস, ব্যস। এই হলেই চলবে। গুছিয়ে বলতে পারবেন ত? দেখুন। তা সাতটি টাকা দিয়ে ফেলুন—পেশকার-বাবুকে পাঁচ টাকা দিয়ে আমি ব্যবস্থা করব যে, ফাস্টেই আপনার ডাক হবে আর ফাইনও মাফ হয়ে যাবে। আর দাদা আমাদের দু টাকা।

আঁতকে ওঠা উচিত। নইলে দর নামানো যায় না। বললাম,—আপনি হাসালেন মশাই। বড় বড় টেন্ডারেই ঠিকাদারের কাছ থেকে ইঞ্জিনিয়ার সায়েবরা দু তিন পার্সেণ্টের বেশি ঘুষ চাইতে লজ্জা পায়। যা দস্তুর তা-ই পাবেন, আমার স্পষ্ট কথা। তিনটি টাকা দেবো, তা দিয়ে দোল-দুর্গোৎসবই করুন বা পেশকার-মুহুরিকেই দিন সে আমি দেখতে যাবো না। রাজী?

—রাজী। অগত্যা।

এবং মনে হল, এক্সপার্ট লড়িয়ের মোকাবিলায় দালালটি মহাখুশি। মনে পড়ল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এইখানেই রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তীতে শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে মানপত্র পাঠকালে বলেছিলেন, 'কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই…' যদিও কথাটা কেতাবেই পড়েছি তবু হলফ করে বলছি, দালালের চোখে যেন সেই বিস্ময়ই দেখলাম। সেই টাউন হলের আজ এই হাল! যাক গে, ওসব ভেবে লাভ নেই, মহাজনের পিছু পিছু বিচার-শালার আমদরবারে হাজির হওয়া গেল। চেয়ারে চেয়ারে পাঁচফোড়নের মতো কিছু লোক বসে আছে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। স্টেজের উপরে পেশকার-টেশকারবাবুরা দুই দিক অলংকৃত করে দরখাস্তের পাঁজা সাজাচ্ছেন। তার মধ্যে এই অধমও জমা হল। শকুনের চঞ্চুর মতো নাক নেড়ে শিড়িঙ্গে আরদালী ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে বাঁশির সুরে হাঁক দিচ্ছে—'আস্তে—আস্তে। এটা আদালত—! গোল করবেন না।'

এগারোটায় ধর্মাধিকরণের কাজ শুরু হয়। এখন সাড়ে এগারো। দরখাস্ত আর লোক দুই-ই বাড়ছে। মুখ বুজে বসে থাকলেও মনটা বেয়াড়া ভাবে চক্কর খাচ্ছিল।

আবার রবীন্দ্রনাথ হাজির। মহাকবির শান্ত, গম্ভীর মূর্তিটি যেন তাঁর পিছনের দিকে ফিরে দেখছেন। উনিশ শতকের গোড়াতে হিন্দু কলেজের ন্যাটিভ ছেলেরা চোস্ত ইংরিজি শেখার ইনাম, প্রাইজ নিতে আসতেন এই টাউন হলে—খোদ গভর্নর জেনারেল নিজে হাতে দিতেন সেই পুরস্কার! ধন্য

ধন্য পড়ত কালা-আদমীদের কৃতিত্বে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের পরে এবং সেনেট হলের ইমারত তৈরির আগে এখানেই সেনেটের বড় বড় অধিবেশন হয়েছে। আর এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছেন যাঁরা তাঁদের বিলিতি অর্কেস্ট্রা কোম্পানীর বাজনা শুনতে হ'ত—দুপুরে সায়েব-সুবোদের খানাপিনা আর নাচের সময়। আরে পরীক্ষা ত হচ্ছে একতলার হলে—হোক না। দোতলার নাচ গান বাজনার আসর ত আর ন্যাটিভদের জন্যে বন্ধ থাকতে পারে না।··· ওই যে উকিলবাবু আইনস্টাইনদের কথায় তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিলেন, সেই থেকেই হরিদাস পাল এই আমিটা কেমন করে ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়েছে, তাকে যেন কিছুতেই টেনে বার করা যাচ্ছে না। অথচ এরই ফাঁকে শুনতে পাচ্ছি,—এখানে সব পাওয়া যায় মশাই, পয়সা ফেললে আবার জামিনদারের অভাব!···না, না, ধার-বাকিতে আদালত চলে না মশাই!··· আচ্ছা উনি ত এখনো এলেন না, আমার যে তাড়া আছে।······তাড়া? আদালতের কাছে কাজ, তাড়া, জন্ম-মৃত্যু কিচ্ছু নেই। ধর্মাধিকরণের স্থান সবার ওপরে।

আরদালীর কণ্ঠে সহসা দৈববাণী!···আপনারা বসে পড়ুন! চুপ! আঃ! ···উনি আসছেন। হুজুর আসছেন। উঠে দাঁড়ান।

এলেন। নায়ক, না, মহানায়ক, না,—ইনি অদ্বিতীয় পুরুষ। ব্রজে অন্য সবাই গোপিনী? মঞ্চের উপর ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন। ওঠো—ওঠো। দাঁড়াও। আদালতকে সম্মান প্রদর্শনের সেই কানুন আজও আছে। এটা আমার খুব পছন্দ। বিচারকের স্থান সবার উপরে।

আর নয়। এবার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটুনিটাকে কিভাবে সামলাই তাই নিয়ে অস্থির। এখন রবি ঠাকুর, শরৎবাবু কেউ রক্ষে করতে পারবেন না। বিলিতি অর্কেস্ট্রা কোথায় লোপাট। এখন জপ করো, পেশকার মহাপ্রভু যাতে প্রসন্ন হয়ে কিছু বন্দোবস্ত করেন। ঘুষখোরে··· ঘুষ খায়। সেটাই ভরসা। আহা ঘুষ খেলে নেমকহারাম হবার চান্স কম। সাহেব ঘুষ খায় না, তার বিবেক নিয়েই বড় ঝামেলা। আর ধরো সরকারী, বেসরকারী সব মহলেই ওটা কোন অপরাধ নয়। বড় সাহেবকে নাগালে আনতে পারলেই কাজ উদ্ধার হল না। তিনি কি করবেন? খোদ আমলাদের কথায় ফাইল তোমার আটকে আছে—তিন ফুট দূরের টেবিলে পৌঁছতে সেই ফাইলের ছ মাস থেকে দু বছর লাগাও বিচিত্র নয়। অথচ

কেরানীবাবুকে কিছু খাওয়ালে—ছি, ছি, 'ঘুষ'। ও নাম উচ্চারণ করাই হল অপরাধ। যেমন অপরাধ ঘুষ খেয়ে ধরা-পড়াটা। তাই আদরের পোশাকী সুন্দর নাম স্পিডমানি। স্পিডমানি পকেটে পোঁছলে, ফাইল পাঁচ মিনিটেই—!

ডাক শুরু হয়ে গেছে।...আপনার নাম বিকাশচন্দ্র পণ্ডিত?

প্রশ্ন করছেন যিনি তিনিই কি পেশকার? সেই পেশকার যিনি আমার এবং আমার মতো আরো বিশ-ত্রিশ কি আরও লোকের টাকা দৈনিক দালালের মারফতে পেয়ে থাকেন। কে জানে! তবে মধ্যমণি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোনো কথা বলছেন না। ভদ্রলোকের ত সুকুমার রায়ের প্যাঁচামুখো হাকিমের সঙ্গে কোনো অংশে কিছুর মিল নেই। কথা না বললেও এই ধর্মাবতার ভীতিপ্রদ দণ্ডধর মূর্তি নন। আদালতের স্টেজে না হয়ে যদি ট্রাম বাসে দেখা হত স্বচ্ছন্দে হকি ফুটবল কিংবা হালের বাজে সাহিত্য নিয়ে গল্প জমানো যেত—এমনই সহজ পোজ তাঁর।

—আপনি সত্তর-একাত্তর সালের লাইসেন্সের টাকা জমা দেন নি। দোষ স্বীকার করেন?

ছোট ছোট আদালতের দস্তুর হ'ল দোষ স্বীকারে কম জরিমানা। তুমি যত বেশি ওস্তাদী করবে জরিমানা চক্রবৃদ্ধি হারে ততই বেড়ে চলবে। অবাক কাণ্ড, এরা সবাই বুদ্ধিমান। কাঠগড়া থেকে যারা ফিরে আসছে তারা দোষ স্বীকারে যেন বেজায় অভ্যস্ত। কথাগুলো শুনে শুনে প্রায় 'হিজবিজবিজ' হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে এক পায়ে খাড়া।

কেউ কি আমার নামটা কেড়ে নিয়ে ছুটে আমার আগেই কাঠগড়ায় হাজির হবে? পড়ি কি মরি, বাপের নাম বাঁচাতে হবে। অতএব জলদি পা চালাতে হবে।

এই এখন, যখন সেদিনের এই আমিটি, ওই আদালত কক্ষে 'হাজির' প্রমাণের জন্য ছাতা সামলাতে-সামলাতে 'দোষ'-শিকার হতে দৌড়চ্ছিল তখন কিন্তু তার বুকের সংবাদ অবর্ণনীয়। আর চোখমুখ কানমাথা সর্বত্র অগ্নিকাণ্ড বেধে গিয়ে দমকল ডাকার দাখিল। সত্যি, কাঠগড়ায় কাঁপুনি থামাবার

জন্যে তোড়জোড় করারও চান্স দিল না জিজ্ঞাসক…আপনার নাম হরিদাস পাল ?

কথার আগে মাথা নড়ল, কেননা ঢোক গিলে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজোতে হ'ল—হ্যাঁ।

ছাতাটা যেন লেজের মতো পরমাত্মীয়। সেই সে-আমলে যখন মানুষের বিবর্তন নিয়ে মাথাব্যথার কেউ জন্মায়নি—তখন লেজই ত ছিল মানুষের পূর্বপুরুষদের পরমাত্মীয়। ছাতার ওপর অশক্ত পায়ের দায়িত্ব চাপাতে হ'ল —কাঁপুনি কমাতে না পারলে কথাগুলো তোৎলা হয়ে যাবে যে!

—দোষ স্বীকার করেন ?

—করি।

সন্দেহ হ'ল, প্রশ্নের আগেই জবাব দিলাম নাকি। আসলে চোখ-কান দিয়ে কিছুই অনুভব করার অবস্থা নেই যে! বিলিতি অর্কেস্ট্রার আওয়াজে গোটা দুনিয়া বন্ধ কালা হয়ে গেছে।

স্তম্ভিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে কিছু সময় কেটেছিল। এবং তারপর আমি শ্রী হরিদাস পাল মুখর হয়ে উঠলাম। না-হব কেন। অনেক কেতাব আমার লেখা, ছাপা আকারে বাজারে রয়েছে। অনেক চরিত্র সৃষ্টি করেছি এই কলমের ডগায় গুঁতো মেরে। নিজের ছবি আঁকার চেষ্টা করতে পারব না ?

গলা ঝেড়ে বললাম—হুজুরের কাছে অনুমতি চাইছি। আমার কিছু বলার আছে। অবিশ্যি অনুমতি দিলে—

মৌন সম্মতি মিলতেই শুরু করলাম—হুজুর লাইসেন্স করানোর টাকা দিতে পারিনি এটা আইনের চোখে অপরাধ। কিন্তু কেন দেওয়া সম্ভব হয়নি সেটা বলতে গেলে প্রথমেই বলবো উনিশশো সত্তর একাত্তরে আমাদের কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে বোমা, খুন, পুলিস এইসবের রাজত্ব ছিল, কাজেই বইএর কারবার অচল। এখন অবিশ্যি সেসব নেই। কাজকারবার চালু

হয়েছে। কিন্তু পুরনো ঘা শুকোয় নি। তা ছাড়া আমরা পাঠ্যবই বিক্রি করি না, গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ এই ধরনের অ-পাঠ্য বই সম্বল। আসলে আমাদের কারবারটা হ'ল গরীবের ঘরে বিধবা মেয়েকে পোষার মতো। অন্নের জন্যে অন্যত্র চাকরি নিতে হয়েছে। এদিকে এ গলগ্রহ ফেলতেও পারি না, রাখারও সামর্থ্য নেই—এই হ'ল অবস্থা, এখন ধর্মাবতার বিচার করুন।

'বিধবা মেয়ে' শুনে পেশকার মহলও হেসে উঠল। আদালতে হাসি ব্যাপারটাই অশ্লীল। আদালতে সবাই যেন রামগরুড়ের ছানা। তাই হাসি ফোটাতে পেরে নিজেকে সেলাম দিতে হ'ল। ধর্মাবতার গম্ভীর হ'তে চেষ্টা করলেন। অর্থাৎ জমা দেওয়া সমনের ওপর খস্‌খস্‌ করে লেখায় ঘাড় কাত ক'রে ব্যস্ত হলেন।

ব্যাটল ফিল্ড থেকে পুনরায় ফিরে আর চেয়ার জুটল না। পেয়াদার হুকুম 'ওই বেঞ্চিতে গিয়ে বসুন।' অপরাধী সাব্যস্ত হ'লে নিরপরাধদের সঙ্গে একাসনে বসার অধিকার থাকে না।

এরপর শুনলাম 'পঞ্চাশ টাকা'। না, জরিমানা হয়নি। কর্পোরেশনের লাইসেন্স ফী যা তা-ই আমায় দিতে হবে। বত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিখানা ফুলে ফেটে গিয়ে শেষে কি টাউন হলের ছাদে ধাক্কা খেয়ে এতকাল স্তব্ধ হয়ে থাকা সেই পুঞ্জপুঞ্জ দিশি-বিদেশী বাণীর মমীর ঘুম ভাঙাবে, আর দালাল সেই ছোকরা আমায় বলবে···হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক !···

বিচারের ঢেউ থামছে না। অপরাধীর ভিড়ে বেঞ্চি ভরে যাচ্ছে। আমার মনটা আবার চলতে শুরু করেছে। বারান্দা পেরিয়ে, চওড়া সোপানের সারি ছাড়িয়ে বিধানসভা ভবন, যেখানে আইন-শৃঙ্খলার মোড়লদের আসর জমে-ওঠে সেটি অতিক্রম ক'রে চলে যাই ইডেন উদ্যানে। হয়ত সেখানে এখন কোনো পলাতক তরুণ-তরুণী নিরিবিলি বৃক্ষছায়ে কতো রঙীন স্বপ্ন নিজেদের মুঠোয় ধরছে। ধরতে ধরতে শেষে ওরা যে ফাঁদে ধরা দেবে তারই ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলশ্রুতি এইসব আইন-টাইন।

পেয়াদা এসে রাখালের মতো আমাদের নিয়ে পুরবে ক্যাশ জমার কাউণ্টারে। সেখানে হিসেব চুকিয়ে দিতে পারলেই মুক্তি। তারপর তুমি চাই কি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে গর্বোধ করতে পার। টাউন হলের মরদেহ যেমন আজও সশরীরে টিকে রয়েছে, হাইকোর্ট, অ্যাসেম্বলি হাউস, রাজভবন, আকাশবাণী ভবন, স্টেডিয়াম—আরও কত কীই তোমার সম্পত্তি। ইচ্ছে করলেই তা ভাবতে পারো। তবে হ্যাঁ, যাই করো আইন-টাইন বাঁচিয়ে অর্থাৎ আগের দিনের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে। তার মানে, গরমিল নিয়ে মাথা মোটেই ঘামানো চলবে না—এই আপেক্ষিক তত্ত্ব আত্মস্থ করতে হবে।

পিছন দিকে 'টয়লেটের' প্রহরী হয়ে দ্বারকানাথের ভাই রমানাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিটি বেচারার মতো দুর্গন্ধের মধ্যে বসে রয়েছেন দেখে তোমার কোনো বিকার হ'ল কি? বেচারী বন্দী। এইসব ছাইছাতা মগজে ঘুরছিল। হঠাৎ একজন দেখি দোষ স্বীকার করল না। মাত্র একজন। তাক লেগে গেল। ছোকরা আচ্ছা আহাম্মক ত। ঠ্যালা বুঝবে। তার যে কি হ'ল, বলতে পারব না। 'চলুন' বলে পেয়াদা ডাক দিল।

মরুক গে যাক। খুব বেঁচে গেছি দোষী হয়ে।